প্রমথ চৌধুরী

অগ্রন্থিত রচনা ২

প্র ম থ চৌ ধু রী

অগ্রন্থিত রচনা ২

সংকলন ও সম্পাদনা। মলয়েন্দু দিন্দা

প্রথম প্রকাশ। জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক। মনফকিরা-র পক্ষে সন্দীপন ভট্টাচার্য
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত,
মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রণ। জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন (০৩৩) ২৩৫১ ৪৩৭৮

সূচি

ভূ মি কা

প্রমথ চৌধুরী (৭ অগস্ট ১৮৬৮ - ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক। গদ্য-পদ্যে সমান সাবলীল। অবশ্য পদ্য তিনি লিখেছেন কম। তার মধ্যেও মূলত সনেট লিখতেই পছন্দ করতেন বেশি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সনেটের তারিফ করেছেন। তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে প্রমথ চৌধুরীর আসল কৃতিত্ব গদ্যেই। গদ্যের মধ্যে তিনি লিখেছেন অভিভাষণ, আত্মকথা, গল্প আর প্রবন্ধ। কিন্তু প্রবন্ধই ছিল তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশের মূল মাধ্যম। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্যও দেখবার মতো। হালকা-ভারি সব বিষয়েই তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন। এ জন্য কেউ-কেউ তাঁকে পল্লবগ্রাহী ভেবেছেন। তাঁদের মতে, পল্লবগ্রাহিতাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেও তাঁর রচনার বিষয়বৈচিত্র্য দেখলে অবাক হতে হয়। বৈচিত্র্যের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যও ছিল যথেষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় যে-পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সুখ্যাতি করেছেন অনেকেই।

সাহিত্য, ভাষা, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, ভারততত্ত্ব, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি সারা জীবন লিখে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর সমস্ত লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়নি। তিনি নিজে সব লেখা বই আকারে প্রকাশ করেননি, আর তাঁর মৃত্যুর পর ৬৪ বছর পেরিয়ে গেলেও কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সে সব সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেনি। তাঁর জীবদ্দশায় যে-বইগুলি বেরিয়েছিল, তার সব এখন আর পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক যে, 'প্রমথনাথ চৌধুরী গ্রন্থাবলী' বসুমতী থেকে বেরিয়েছিল (১৯৩০)। কিন্তু নির্বাচিত কিছু কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ ছাপা হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উপরন্তু তার গুণমান নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলিকে বসুমতী সংস্করণ থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন করে শোভন সংস্করণে বের করা দরকার। এ দিক দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও গল্প-সংগ্রহের বিশ্বভারতী সংস্করণ সুসম্পাদিত হলেও সম্পূর্ণ নয়। এই সংগ্রহের বাইরে রয়ে গেছে তাঁর অসংখ্য লেখা। পরবর্তী কালে বিজিৎকুমার দত্ত-র সম্পাদনায় মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয় 'সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ'। সেখানে তাঁর অনেক লেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনটিতেই প্রমথ চৌধুরীর রচনার ব্যাপ্তি ও সমগ্রতাকে ধরা যায় না।

১৯৬০-৭০ নাগাদ খ্যাত-অখ্যাত, ছোট-বড়-মাঝারি সব ধরনের লেখকের রচনাবলি প্রকাশের ধুম পড়ে যায়, তখনও প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র রচনা প্রকাশিত হয়নি বা কোন ব্যক্তি বা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ কাজে উৎসাহ দেখায়নি। অথচ তাঁর প্রবন্ধ, টীকা-টিপ্পনি, রাজনৈতিক ভাষ্য প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নীরবতা ও নিস্পৃহতার এই আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯৬০-৭০-এ মনফকিরা প্রকাশন প্রমথ চৌধুরীর অগ্রন্থিত রচনা প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে, ২০০০-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর 'অগ্রন্থিত রচনা'র প্রথম পর্ব। তখন বলা হয়েছিল : প্রমথ চৌধুরীর অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যা এত বিপুল যে সেগুলিকে কয়েক পর্বে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বার ২০০০-য় বেরোচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর 'অগ্রন্থিত রচনা'র দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বেও রচনার বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। এ বারে যে-সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল— সাহিত্য, বাংলার কথা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধি। সাহিত্যের মধ্যে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তবে বর্তমান পর্বে মূল ঝোঁক বোধ হয় পড়েছে রাজনীতির দিকে।

হারীতকৃষ্ণ দেব আমাদেব জানিয়েছেন : প্রমথ চৌধুরী তাঁর দাদা আশুতোষ চৌধুরীর মতোই 'মডারেট' ছিলেন। তবে তাঁকে শুধু মডারেট বললে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে বোধ হয় পুরোটা বলা হয় না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করতেন। এতে মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট— দু'পক্ষই তাঁর উপর খাপ্পা হয়ে উঠত। তবে কলমের জোর থাকায় রাজনীতিকরা তাঁকে গুরুত্ব না-দিয়ে পারতেন না। একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন, পলিটিক্সে তাঁর হাত লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পলিটিসিয়ানদের উপর চাবুক চালানো'। এ সময়ে তাঁর মনে রাজনীতির টান লেগেছিল। ১৯২০-তে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তবু তিনি কোন দিন সক্রিয় রাজনীতি করেননি বা করার উৎসাহ বোধ করেননি। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা করলেও গান্ধির রাজনীতিকে তিনি সমর্থন করতেন না। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাঙালি হয়ে শুধু চরকা আর খদ্দর নিয়ে থাকতে পারবেন না। ১৯২০-২১-এ নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের সময়ে রাজনীতিতে তিনি উৎসাহ দেখালেও ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ছিলেন নিস্পৃহ। রাজনীতি থেকে তার আগেই তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

এ সময়ে রাজনীতির আলোচনা ও সাহিত্য রচনাতেও তাঁর মন ছিল না। বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে লিখতে কোন উৎসাহ বোধ করতেন না, কারণ 'লোকে এখন পিকেটিং ব্যতীত আর কোনো কথাই কানে তোলে না।' এই অবস্থায় তিনি রাজনীতি ছেড়ে চোখ রাখেন বাংলা তথা ভারতের চিরায়ত সাহিত্যের ওপর, মন দেন স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। তা সত্ত্বেও রাজনীতি নিয়ে লেখা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে তিনি কোন দিনই পারেননি।

এর পরেও দেশ-বিদেশের নানান রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই রকম বিশ্লেষণমূলক অনেক ক'টি প্রবন্ধ 'অগ্রন্থিত রচনা'র দ্বিতীয় পর্বে আছে। রাজনীতিতে তিনি যে উদারপন্থা বা লিবারেলিজম এবং বাঙালি পেট্রিয়টিজম-এ বিশ্বাস করতেন, সে কথা দু'তিনটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা এক মস্ত সমস্যা, যা তাঁকে খুবই চিন্তিত করে তুলেছিল। এই সমস্যার গভীরে গিয়ে তিনি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা ভারতের রাজনীতিবিদ ও ইতিহাস-লেখকদের অনেক নতুন ধারণার সন্ধান দেবে। আন্তর্জাতিক বিষয়েও যে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সে প্রমাণও ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অনেক প্রবন্ধে। সব মিলিয়ে বলা যায়, তাঁর রাজনীতি বিষয়ক রচনা, সাহিত্য ও ইতিহাস দুটি ক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেছে।

আরও দু-একটি কথা বলার আছে। প্রথমত, বর্তমান সংকলনে 'অগ্রন্থিত রচনা' বলতে প্রমথ চৌধুরী নিজে যে-লেখাগুলি বই আকারে প্রকাশ করেননি বা বিশ্বভারতী তাঁর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' ও 'গল্পসংগ্রহ'-এ অন্তর্ভুক্ত করেনি, সেই রচনাগুলির কথাই ভাবা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'অগ্রন্থিত রচনা'র সম্পাদনা প্রসঙ্গ। কেউ-কেউ হয়তো এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনার 'ক্রিটিকাল এডিশন' প্রত্যাশা করছেন। তাঁদের মতে, টীকায় লেখকের ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করা উচিত ছিল। কিন্তু যে-সমস্ত রচনা আদৌ পাওয়া যায় না বা যা কোন দিন বই আকারে বেরোয়নি, গ্রন্থাগারে জীর্ণ পত্রিকার পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে আছে দীর্ঘ কাল, তা সংগ্রহ করে ভালো করে পড়ার আগেই তার ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বর্তমান পাঠকের কাছে— যাঁরা প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলকে প্রায় ভুলতে বসেছেন— তাঁর অগ্রন্থিত রচনা পৌঁছে দেওযাটাই তো আগে দরকার। আগে দরকার text, তারপর তো তার ভুল-ত্রুটির বিচার। প্রমথ চৌধুরীর এই 'অগ্রন্থিত রচনা'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য তা-ই। ভবিষ্যতে এই সব রচনা নিয়ে যথাযথ চর্চার পর এর প্রামাণিক সংস্করণ বা ক্রিটিকাল এডিশনের কথা ভাবা যেতে পারে। তৃতীয়ত, টীকার ক্ষেত্রে কেউ-কেউ বলছেন, এ সব তথ্য তো mouse click করলেই পাওয়া যায়! তা, সে সুযোগ ক'জনেরই বা আছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠক বলতে আমরা কতিপয় শহুরে শিক্ষিত পাঠকের কথাই শুধু ভাবি না, তার চেয়ে আর-একটু বৃহৎ পরিসরের কথা ভাবি।

বর্তমান সংকলনে যে-ক'টি প্রবন্ধ রয়েছে, তার কোনটিই লেখকের জীবদ্দশায় কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রবন্ধগুলি নানা সময়ে লেখা। তাই বিষয় ধরে প্রকাশের সময় অনুযায়ী তা সাজানো হয়েছে। প্রবন্ধগুলি প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখেছেন। শুধু যে-প্রবন্ধগুলি ছদ্মনামে লেখা, টীকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার আস্বাদ বা flavour বরাবর অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের বানান, ছেদচিহ্ন ইত্যাদির বিশেষ পরিবর্তন করা হয়নি। নানা সময়ে লেখার ফলে লেখকের বানানেও অনেক রকমফের দেখা যায়। যে-সব পত্র-পত্রিকায় লেখাগুলি প্রথম বেরোয়, তার ছাপও পড়েছে এর ওপর। তাই এই সংকলনে বানানের সার্বিক সমতা রাখার

চেষ্টা করা হয়নি। বিশেষ করে 'য়ুরোপীয়' ও 'ইউরোপীয়', 'বাঙ্গালা', 'বাঙ্গলা', 'বাঙলা', 'বাংলা'— এ সব ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন একটি প্রবন্ধের পরিসরে বানানে সমতাবিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে অর্থের অস্পষ্টতা-জনিত কারণে দু'একটি শব্দ বা পদবিন্যাস যোগ করা হয়েছে, সে সব অবশ্য তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সম্ভাব্য পাঠ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য যতিচিহ্নের কিছু-কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের কাজে অনেকেই সাহায্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে বরাবর উৎসাহ দিয়েছেন আমার মাস্টারমশাই ড. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও সকল গবেষকের সদা-সহায় শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ও শ্রীকালীপ্রসাদ বসু। সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণবাবু, বিশেষ করে সংস্কৃত বিভিন্ন শ্লোকের ক্ষেত্রে। টীকার ক্ষেত্রেও তাঁর অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। Belloni-Filippi সম্পর্কে দরকারি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ইতালির দর্শনবিদ্ কৃষ্ণ দেল তোসো। প্রবন্ধগুলি কপি করা এবং প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রীচতুর্ভুজ দাস। এ ছাড়া সব কাজেই সর্বদা পাশে থেকেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণকলি দিন্দা। প্রমথ চৌধুরীর অগ্রন্থিত রচনার দ্বিতীয় পর্ব যে প্রকাশ করা গেল, তার জন্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি ঋণী। যেমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চন্দননগর পুস্তকাগার, সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র ভবন (বিশ্বভারতী) ও চৈতন্য লাইব্রেরি। বইটি প্রকাশের কাজে আগাগোড়া সাহায্য করেছেন মনফকিরা-র শ্রীসন্দীপন ভট্টাচার্য ও শ্রীচিত্রভানু চক্রবর্তী। সে জন্য তাঁদের ধন্যবাদ।

অগ্রন্থিত রচনা ২

স ং স্কৃ ত চ র্চা

আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সব চাইতে যা প্রয়োজন, সে হচ্ছে সংস্কৃত-চর্চা।

এ কথা শুনে অনেকে হয়তো চমকে উঠবেন, বিশেষত আমার মুখে।

আমি যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নই, তা আমার ভাষাতেই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আমি যে বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধু ভাষার বিরোধী, তা তো সর্বলোকবিদিত।

তবে সাধু ভাষার বিরোধী হওয়ার অর্থ সংস্কৃত ভাষার বিরোধী হওয়া নয়। সাধু ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা এক ভাষা নয়। সুতরাং একই লোকের মনে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অতি শ্রদ্ধা ও সাধু ভাষার প্রতি ততোধিক অশ্রদ্ধা, একসঙ্গে দিব্যি বাস করতে পারে।

আমি বহুকাল পূর্বে বলেছি যে, যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তারই যে শ্রাদ্ধ করতে হবে, ভগবানের এমন কোন নিয়ম নেই। আর সাধু ভাষায় যা নিত্য করা হয়, তার নাম হচ্ছে সংস্কৃতের শ্রাদ্ধ।

আমাদের মুখের কথা আধা-বাঙ্গলা, আধা-ইংরাজি— ফলে উক্ত ভাষা বাঙ্গলাও নয়, ইংরাজিও নয়। সাধু ভাষাও তেমনি আধা-বাঙ্গলা, আধা-সংস্কৃত— অতএব তা বাঙ্গলাও নয়, সংস্কৃতও নয়।

এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে, কথোপকথনে আমরা যত দূর যথেচ্ছাচারী হয়েছি— লেখায় তত দূর যথেচ্ছাচারী হবার অধিকার আমাদের নেই। ও-রকম অধিকারের মূল কী, জানেন? সকল ভাষায় সমান অনধিকার।

আর সবাই জানেন যে, অনধিকারচর্চা করা, 'প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং'। অতএব এ বিষয়েও 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

আমার বিশ্বাস যে, বিধিমতো সংস্কৃত চর্চা করলে— যা করা অতি সহজ, অর্থাৎ যা করা কিছু না-করারই সামিল; তা করবার প্রবৃত্তি আমাদের আপনা হতেই কমে আসবে।

সংস্কৃতশিক্ষা ক্লেশসাধ্য, অতএব সে শিক্ষার ফলে আমরা মনের সংযম ও শক্তি যুগপৎ দুই-ই লাভ করব।

সংস্কৃত পলিটিক্স নয় যে তাতে মানুষ মাত্রেরই জন্মসুলভ সমান অধিকার আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা করতে হলে যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের চর্চা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনও ভুলেও বেরবে না।

সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং অতীতের দোহাই দিয়ে বর্তমানকে প্রত্যাখ্যান, আর অতীত জীবনের দোহাই দিয়ে বর্তমান জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা একই কথা।

তার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণের সন্ধান পাব না, সে সাহিত্য আমাদের কাছে মৃত শব্দরাশি মাত্র থেকে যাবে; যেমন টোলের পণ্ডিতদের কাছে চিরকাল তা রয়ে গিয়েছে।

অপর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণে অনুপ্রাণিত না হলে, য়ুরোপীয় সাহিত্যও আমাদের কাছে মৃত শব্দরাশি মাত্র হয়ে থাকবে। ও হবে শুধু মুখস্থ করার বিদ্যা— যেমন হয়েছে এ কালের কলেজের B.A , M.A.-দের কাছে।

সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে দেশে দুটি মারাত্মক ভুল বিশ্বাস আছে। কেউ-কেউ মনে করেন যে, ও-বস্তু অমব; অতএব তা আজও পুরো বেঁচে আছে। অপর পক্ষে কেউ-কেউ আবার মনে করেন যে, ও-সাহিত্যের কস্মিন্‌কালেও জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না— অতএব পুরাকালেও ও-সাহিত্য মৃত ছিল।

ঐতিহাসিক হিসেবে ও-দুটিই সমান মিথ্যা কথা। এককালে ও-সাহিত্য সম্পূর্ণ জীবন্ত ছিল; কেননা মানবজীবনের সঙ্গে উক্ত সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আজও যে তা একেবারে মরেনি, তার কারণ মানসিক সৃষ্টি কখনওই মরে না। ও-সৃষ্টির জন্মের তারিখ আছে, কিন্তু মৃত্যুর তারিখ নেই। কেননা মন, প্রাণের অতিরিক্ত।

যদি বলেন যে, দেশে তো সংস্কৃতের চর্চা আছে, স্কুল-কলেজে তো ও-ভাষা পড়ানো হয়।

তার উত্তর— আমাদের স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শেখানো হয় শুধু একটা ভাষা হিসাবে।

আমার মতে ভাষাশিক্ষাই যে-শিক্ষার উদ্দেশ্য— সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। ভাষাশিক্ষার সার্থকতা তাকে উপায় হিসাবে গণ্য করায়।

তারপর সংস্কৃত ভাষাকে একটি মৃত ভাষা হিসাবেই শেখানো হয়। সংস্কৃত সাহিত্য জীবন্ত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা যে মৃত, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। সংস্কৃত সাহিত্যকেও যে স্থূলদর্শী লোক মৃত মনে করে, তার কারণ সংস্কৃত ভাষা মৃত।

অবশ্য, মৃত ভাষার জ্ঞানলাভ করারও সার্থকতা আছে, কিন্তু সে শুধু ভাষার অস্থিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে, যাঁদের কায হচ্ছে তার শবচ্ছেদ করে তার গঠনের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা।

কিন্তু অধিকাংশ লোকের যখন মৃতদেহ dissect করবার প্রবৃত্তিও নেই, প্রয়োজনও নেই, তখন সংস্কৃত সাহিত্যের মৃতদেহের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার সুসার কী?— এই কারণেই অধিকাংশ লোকের পক্ষে সংস্কৃত চর্চা প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়।

আমার মতে সংস্কৃত চর্চার অর্থ হচ্ছে— শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা, উক্ত শিক্ষার বলে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশলাভ করবার জন্য। আমাদের অতীতের মনের ভাণ্ডারে ঢোকবার চাবি।

বলা বাহুল্য যে, চাবি জিনিসটে আঁচলে বেঁধে বেড়াবার জন্য তৈরি হয়নি, তাতে অঞ্চলের যতই শোভাবৃদ্ধি হোক না কেন।

আর ও-চাবি দিয়ে আমরা আমাদের অতীতের বন্ধ ঘর খুলতে জানিনে অথবা চাইনে বলে, আমাদের অতীত সম্বন্ধে যে যা বলে, আমরা তাই বিশ্বাস করি। কখনও ভাবি তার ভিতর শুধু ভূত-প্রেত আছে, কখনও ভাবি আছে সেখানে ঘড়া-ঘড়া সোনার মোহর— যা একবার হাতাতে পারলে আমরা অনন্তকাল না খেটে মনোরাজ্যে নবাবি করতে পারব।

সংস্কৃত সাহিত্য যে আমাদের মোটেই পড়ানো হয় না, তা নয়। আমাদের কিছু-কিছু পরিচয় আছে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে।

কাব্য-চর্চা করারও অর্থ যে শিক্ষালাভ করা, এ জ্ঞান দেখতে পাই বহু লোক হারিয়ে বসে আছেন। আর অনেকে কাব্য-রস উপভোগ করার অর্থ বোঝেন তার কোমল-কান্ত পদাবলীতে শ্রবণ তৃপ্ত করা। আর বহু কাব্যমোদী লোকের যে 'বিলাস-কলাসু কুতূহলং' নেই, এমন কথাও বলা যায় না।

এখন আমার কথা হচ্ছে, আমাদের পক্ষে আপাতত ভাববিলাস ও কলা-বিলাসের লোভ একটু সংবরণ করতে হবে— এবং তা করবার প্রবীণ উপায় হচ্ছে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা করা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অথবা মেধাতিথির মনুভাষ্যের স্পর্শ মাত্র আমাদের তন্দ্রা-সুখ যে ভেঙে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাগরণ-জাগরণ বলে আমরা দু'বেলা চিৎকার কবি; আর আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের মতো জীবন-কাঠি আমাদের হাতে আর দ্বিতীয় নেই। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার সংস্কৃতের মতো দ্বিতীয় শাস্ত্র নেই। আর সে শাস্ত্রের ভাষ্যকাররা আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে পদে-পদে ব্যায়াম করাবেন।

বর্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা মহা দোষ হচ্ছে এই যে— সকলেই তা লেখে, এবং তার মধ্যে অনেকেই অনর্থক বেশি বকে। 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।' এ কথা বহু য়ুরোপীয় আচার্যদের সম্বন্ধে অক্ষরে-অক্ষরে খাটে। ইকনমিক্স, পলিটিক্স প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজিতে এ যুগের খুব কম বই আছে, যার

একশো পাতার ভিতর পঁচাত্তর পাতা ছেঁটে দিলে তার অঙ্গহানি হয়। আর জার্মান লেখকদের এমন পুস্তক নেই, পুস্তিকা করলে যার শ্রীবৃদ্ধি না হয়। উক্ত সাহিত্যের প্রভাবে আমরাও মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছি। ভারতবর্ষের পূর্বাচার্যরা গ্রীকদের মতো চিত্ত-বৃত্তিকে সংহত, অতএব বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করতেও জানতেন। সংস্কৃত চর্চা করলে আশা করি আমাদের বাচালতা কিঞ্চিৎ কমে আসবে।

সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্য, সে শাস্ত্রের মত গ্রাহ্য করা নয়। মানবজীবনের এক যুগে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় যে-মত সৃষ্টি হয়েছিল, আর-এক যুগে সামাজিক আর-এক অবস্থায় সে মতের কোন ব্যবহারিক সার্থকতা নেই। মনের সন্ধান না নিয়ে, মতের মাহাত্ম্য কীর্তন করায় আর মাথার সন্ধান না নিয়ে টিকির মাহাত্ম্য কীর্তন করায় একই বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়।

কিন্তু ঐ সব মতের পিছনে যে-মন আছে, তা অমর। অতএব আমি যেরূপ সংস্কৃত-চর্চার পক্ষপাতী, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মনকে ভারতের আর্য-মনের সঙ্গে সম্পর্কে আনা, সংস্কৃত মন থেকে আমাদের বাঙ্গালী মনের প্রদীপ ধরিয়ে নেওয়া। সে মনের চিরন্তন অনুশাসন হচ্ছে, 'সত্যান্নপ্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূতৈঃ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।'

বলা বাহুল্য, সকল শিক্ষার সার কথা উক্ত অনুশাসনের মধ্যে বজ্রকঠিন হয়ে রয়েছে। যুগে-যুগে অবশ্য সত্যের অর্থ, ধর্মের অর্থ, কুশলের অর্থ, বিভূতির অর্থ ও বিদ্যার অর্থ মানুষের অন্তরে নব-নব আকার ধারণ করতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ যদি প্রমাদগ্রস্ত হতে না চায়, তা হলে সে উক্ত অনুশাসন অমান্য করতে পারবে না; কেননা, ঐ হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, এবং আমার বিশ্বাস সংস্কৃত সাহিত্য এ আদর্শ কখনও বিস্মৃত হয়নি। অনেকে মনে ভাবতে পারেন যে, এ আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ, আধ্যাত্মিক জীবনের নয়; এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ যার বিশেষ সাধনা করেছিল, সে হচ্ছে জীবন নয়, মোক্ষ। এর উত্তরে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে— সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ— এ সকল উপনিষদেরই অনুশাসন।

শঙ্কর বলেন, 'অনুশাসনশ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থাৎ।' এখন আমাদের পৌরুষের যে সংস্কার আবশ্যক, সে কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

অতএব এ অনুশাসন আমাদের মনে বসা দরকার, আর আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের সম্যক্ চর্চা করলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শও আমাদের মনে বসে যাবে ও জীবনের উপর সেই সংস্কৃত মনের কিছু না কিছু প্রভাব থাকবেই থাকবে। আর কিছু না হোক, sentimentalism নামক হৃদ্‌রোগ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব। সংস্কৃত শাস্ত্রের তুল্য, ও-রোগের অপর অব্যর্থ ঔষধ আমার জানা নেহ; এ ঔষধ অবশ্য একটু কড়া।

আর আমাদের ধাত থেকে sentimentalism বহিষ্কৃত না হলে, আমরা কাব্য-কলারও মর্মগ্রহণ করতে পারব না। দুর্বল মন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা সুন্দর হচ্ছে শক্তির পূর্ণ পরিণতি। কাব্যকলা উপভোগ করা ও মিষ্টান্ন-ভোজন একই ক্রিয়া নয়।

কাব্য ও কলাসৃষ্টির অন্তরে ও-দুয়ের স্রষ্টার যে-আনন্দ আছে, সেই আনন্দের আস্বাদ পাওয়ার নামই কাব্যামৃতরসাস্বাদ করা। এ রসাস্বাদ করবার জন্যও পাঠকের কবির অনুরূপ সাধনা থাকা চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কর্মে আমাদের অধিকার আছে— কিন্তু তার ফলে আমাদের অধিকার নেই। এ অতি কঠিন মত। কিন্তু তাই বলে যদি কেউ মনে করেন যে, ওর উলটোটাই সত্য, অর্থাৎ— ফলে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্মে নেই— তা হলে তিনি সংসার-বিষবৃক্ষের অন্যতম অমৃতোপম ফল কাব্যের শুধু গাত্রলেহনই করবেন, তার অন্তরের রস কখনও আস্বাদন করতে পারবেন না। কোন জিনিসে দাঁত বসাতে পারে না শুধু শিশু ও বৃদ্ধ।

অতএব আমরা যদি আমাদের ভাববিলাস থেকে মুক্ত হতে চাই, তা হলে আমাদের পক্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিধিমতো চর্চা করা দরকার; কেননা তাতে কোন রকম মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিলাসের প্রশ্রয় দেয় না, মানুষকে শুধু সাধনা করতে শেখায়। আর সেই সঙ্গে শেখায় যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আর যে-জন্যেই আসুক, বায়স্কোপ দেখতে আসেনি।

সংস্কৃত চর্চা ২

শ্রীযুক্ত 'অলকা' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গেল মাসে 'মাসিক বসুমতী' দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তো নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্প্রতি মহা শাস্ত্রভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি দেশসুদ্ধ লোককে সংস্কৃত চর্চা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, যাঁর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করবার সহজ প্রবৃত্তি আছে সে ব্যক্তিও প্রমথ চৌধুরীর উপদেশ শুনে ভড়কে যাবে। তিনি বাঙালিকে সংস্কৃত কাব্যালোচনা থেকে বিরত করে, শাস্ত্রালোচনা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বদলে তিনি আমাদের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়তে বলেছেন। উপরন্তু তিনি উপনিষদ, মনুস্মৃতি, মায় মেধাতিথির ভাষ্য, সংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রও আমাদের ওষুধ হিসেবে গিলতে বলেছেন।

তাঁর হঠাৎ এ মতি হল কেন? প্রমথ চৌধুরীর যে শিক্ষাবাতিক আছে, তা তিনিই জানেন যিনি তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত। তিনি ইংরাজি শিক্ষার সপক্ষে বহুদিন থেকে লড়ে আসছেন। সে যুদ্ধে তাঁর পক্ষের হার হয়েছে। ইংরাজি শিক্ষাই যে ভারতবর্ষের যত অনর্থের মূল, এমনকী ম্যালেরিয়ার বীজও যে ইংরাজি পুথির মধ্যেই আছে, আজকের দিনে তা খবরের কাগজে ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সেদিন তাঁর একটি M.Sc. বন্ধু প্রমথ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বাঙালি যদি শেক্সপিয়র মিলটন পড়ে অমানুষ না হত, তা হলে কি ইংরাজ পলাশীর যুদ্ধ জিততে পারত? এ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, অর্থাৎ তাঁর বাক্‌রোধ হল। এর পর তাঁর ধারণা হয়েছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ ফেরা তার ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারবে না। যখন ইউনিভারসিটি গেল, তখন আবার 'টোল' বসানো যাক— এই হচ্ছে তাঁর মনোগত ভাব। শিক্ষা-বাতিকগ্রস্ত লোক, শিক্ষার অভাবে চোখে অন্ধকার দেখেন। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত শাস্ত্রের গুণগান করতে শুরু করেছেন। প্রমথ চৌধুরী দেশসুদ্ধ লোককে শাস্ত্রী করে তুলতে চান— কিন্তু টুলো পণ্ডিত করতে চান না। ইংরাজি শিক্ষার ফলে ও-রূপ পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে আজও তাঁর মনে, দেখতে পাচ্ছি বিলেতি

কুসংস্কার যথেষ্ট পরিমাণ আছে। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার আদর্শ তিনি নিশ্চয়ই অতীতে খুঁজেছেন আর আমার বিশ্বাস, মনুস্মৃতিতে তা পেয়েছেন। সে কালের রাজাদের কী কী বিদ্যা শিখতে হত, মনুতে তার একটি পুরো ফর্দ আছে। মনু বলেছেন যে—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।।

(মনু, ৭ম অধ্যায় ৪৩ শ্লোক)

প্রমথ চৌধুরী শিক্ষার এই আদর্শ যে গ্রহণ করেছেন, তার কারণ বোধ হয় তিনি মনে করেন যে, অতীতে যা রাজশিক্ষার আদর্শ ছিল, বর্তমানে স্ব-রাজ শিক্ষারও সেই একই আদর্শ হওয়া উচিত। উক্ত আদর্শ খুব উচ্চ হতে পারে, কিন্তু এ যুগে ও-শিক্ষার কেউ ছায়াও মাড়াবে না। আমার এ কথা যে সত্য তা উক্ত শ্লোকের বাঙলা করলে বাঙালি মাত্রেই দেখতে পারেন।

ও-শ্লোকের বাঙলা এই— 'ত্রিবেদীদের কাছ থেকে বেদ শিক্ষা করো, তারপর শাশ্বতী দণ্ডনীতি শিক্ষা করো, তার পরে তর্কশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করো আর বার্তা অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্য লোকসমাজের কাছে শিক্ষা করো।'

এখন এ শিক্ষা যে এ দেশে এ যুগে চলবে না, তা বলাই বাহুল্য।

আজকে বৈদিক যুগে কালই ফিরে যেতে আমরা সবাই প্রস্তুত। কিন্তু— 'অগ্নিং ইলে পুরঃহহিতং যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং'— এই পদ থেকে শুরু করে, আদ্যোপান্ত ঋক্, সাম, যজু কণ্ঠস্থ করা তো দূরে থাক, শুনতেও আমরা কেউ প্রস্তুত নই। আর দণ্ডনীতি মানে তো law and order-এর শাস্ত্র। ও-পাপ কে শিখতে যাবে? আর তর্কশাস্ত্র শেখবার প্রয়োজন কী? ও-শাস্ত্র না শিখেই তো আমরা দিবারাত্র জোর তর্ক করতে পারি, আর আমাদের সে তর্ক হয়তো ও-শাস্ত্র শিখলে বন্ধ হবে। তারপর অধ্যাত্মবিদ্যা? ও-বিদ্যা পেটে নিয়েই তো আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি, তা ছাড়া আমরা যা বলি, যা করি, সে সবই তো spiritual. তারপর কৃষি কি আমাদের শেষটা চাষার কাছে শিখতে হবে? আমরা চাষাদের শেখাব, তারা আমাদের শেখাবে না। আর বাণিজ্য আমরা করিনে, আর করব না, অতএব ও-জিনিস শেখবার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর ঐ উৎকট উপদেশ কেউ নেবেও না, কারও নেওয়া উচিত নয়। শিক্ষা ও ডিমো-ক্রাসি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, আর আমরা এখন পড়ছি ডিমোক্রাসি, অতএব university ও টোল, দুই আমাদের ভাঙতে হবে। শিক্ষার পাট দেশ থেকে উঠিয়ে না দিলে, আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকব। আমিও সংস্কৃত চর্চার পক্ষপাতী কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে।

বাঙালি যে গল্প পড়তে ভালোবাসে আর তা ছাড়া আর কিছু পড়তে যে

ভালোবাসে না, তার প্রমাণ যে-কোন মাসিক পত্রিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ করবেন। প্রমথ চৌধুরী কি ভুলে গেছেন যে গল্পরসের অভাবেই তাঁর এত সাধের 'সবুজ পত্র' শুকিয়ে মারা গেল?

বাঙালি গল্প পড়তে ভালোবাসে বলেই বাঙলায় এত গল্প লেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যখন ডিমোক্রাসি হবে, তখন আবার হাজার-হাজার গল্প লেখবার প্রয়োজন হবে। ডিমোক্রাসি শিক্ষাদীক্ষার কোন ধার ধারে না, কিন্তু লিখতে পড়তে শিখতে চায়, কেননা ডিমোক্রাসির ধর্মই হচ্ছে দিনে সংবাদপত্র, রাত্তিরে গল্প পড়া। ডিমোক্রাসির শিক্ষা-সমস্যা যে এত কঠিন, তার কারণ ডিমোক্রাসি চায় সেই লেখাপড়া শিখতে যার ভিতর কোনরূপ শিক্ষা নেই। শিক্ষালাভ কষ্টসাধ্য আর মানুষকে যদি ভবিষ্যতেও খাটতে হয়, আর স্বরাজ্য যদি আরামরাজ্য না হয়, তো progress-এরই বা অর্থ কী, আর ডিমোক্রাসিরই বা সার্থকতা কী? এই লোকশিক্ষার বিষম সমস্যার সমাধান ইউরোপ করেছে তিনটি R দিয়ে। সে তিনটি হচ্ছে reading, writing এবং arithmetic. ডিমোক্রাসি আর কিছু না বুঝুক, পেট বোঝে, অতএব পয়সার হিসেব বোঝা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ arithmetic তার জানা চাই। আর লিখতে জানা চাই নাম সই করবার জন্য। আর পড়তে জানা চাই খবরের কাগজ ও গল্প পড়বার জন্যে। বাস্, ঐখানেই লেখাপড়ার শেষ, তার চাইতে বেশি কিছু বাজে ও ফালতো।

ডিমোক্রাসিতে এত গল্প আমরা যোগাব কোত্থেকে? নিজে লিখে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা গল্প লিখি অথচ গল্প লিখতে পারিনে। আজকাল গল্প-সাহিত্যে আমরা যে মধুর অভাবে গুড় চালাচ্ছি আর লোকে তাই সানন্দে লেহন করছে, তার কারণ আজকাল গল্প পড়ে শুধু শিক্ষিত লোকে অর্থাৎ সেই সম্প্রদায় যাদের চিটে চিনির জ্ঞান নেই। ডিমোক্রাসি গল্প সম্বন্ধে যেমন পেটুক, তেমনি তারা খাঁটি মান চায়। অর্থাৎ যে-ধরনের গল্প তারা এত দিন মুখে শুনে এসেছে, সেই ধরনের গল্পই পড়তে চায়। জাতকের গল্প ও সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প প্রায় সবই লৌকিক কথা, ইংরাজিতে যাকে বলে folklore. আর সেই গল্পের সঙ্গে আমাদেরও লেখা গল্পের তুলনা করলেই খাঁটির সঙ্গে মেকির যে কী প্রভেদ, তা এক নজরেই ধরা পড়বে। দুটো-একটা উদাহরণ দিই। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মতো গল্প কি আমরা লিখতে পারি? আমি বলছি পারিনে, কেননা আজ পর্যন্ত ও-ধরনের গল্প তো কারও হাত থেকে বেরয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা পশুব মুখে মানুষের কথা দিতে জানতেন, আর আমরা শিখেছি মানুষের মুখে পশুর কথা দিতে। ফলে 'পঞ্চতন্ত্র' অন্তত দু'হাজার বছর টিকে আছে আর সম্ভবত আরও দু'হাজার বছর টিকে থাকবে, আর আমাদের গল্প সকালে জন্মায়, বিকালে মরে।

ভারতবর্ষের সেকালের পশুপক্ষীরা যে কথা কইতে পারত শুধু তাই নয়, তারা

খাসা মন-ভোলানো গল্পও বলতে পারত। শুকসপ্ততী যে পড়েছে সেই জানে যে উক্ত শুকের মুখ থেকে যে-সব গল্প বেরিয়েছে তার প্রত্যেকটি এক-একটি হীরের টুকরো। যে কখনও ছোটগল্প লেখবার চেষ্টা করেছে সেই জানে তা লেখা কত শক্ত। আর সে লোক ঐ সব গল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব আর তার ফুর্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ওর প্রতিটি হচ্ছে কথাসাহিত্যের বামনাবতার।

তার পরে কথাসরিৎসাগরের কথা ধরুন। ও-সব গল্প আমরা পেয়েছি second hand. মূলে যা লেখা হয়েছিল পৈশাচী ভাষায়, আমরা তা পেয়েছি সংস্কৃত আকারে। সোমদেব বলেছেন যে তিনি ওর ভিতর কাব্যরস ঢুকিয়েছেন, কিন্তু এত অতিরিক্ত মাত্রায় নয়, যাতে করে তার কথাবস্তু নষ্ট হয়। আমার বিশ্বাস গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কথাবস্তু সোমদেবের হাতে পড়ে ফেঁপে উঠেছে, কেননা তিনি তার ভিতর যে-রস ঢুকিয়েছেন তাতে তার সর্বাঙ্গে রসভার হয়েছে। তবুও ঐ কথা-সরিৎসাগরেই ডজন-ডজন গল্প আছে, যার আর তুলনা নাই। লোকের বিশ্বাস সংস্কৃত সাহিত্যে humour নেই। কথাসরিৎসাগরের আরম্ভেই বররুচির স্ত্রীর আত্ম-রক্ষার কাহিনী পড়লেই তাঁদের সে ভুল এক মিনিটে ভেঙে যাবে। তারপর এ ভাষায় কত না অবদান, কত না আখ্যান আছে যার একটিও ফেলবার মতো নয়।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের ভবিষ্যতের মনের খোরাক সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এক কথায় সংস্কৃত ভাষা থেকে বাঙলায় তা অনুবাদ করতে হবে। এখন বলা বাহুল্য যে তার জন্য চাই সংস্কৃত চর্চা। এক বর্ণ সংস্কৃত না জেনে আমরা অবশ্য দেদার হিতোপদেশ দিতে পারি কিন্তু হিতোপদেশ পড়তে পারিনে। আপনার কাগজ কাশীবাসী, অতএব সংস্কৃত চর্চার পক্ষে এ ওকালতি আশা করি আপনার নিকট গ্রাহ্য হবে।

ব ঙ্গ সা হি ত্যে খু নে র মা ম লা

গত 'শনিবারের চিঠি' খুলে দেখি যে, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা আছে। শ্রীযুক্ত বলাহক নন্দী লিখেছেন— 'আমাদের লিখিত ভাষায় যে একটা বিপ্লব চলিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষায়ও যে এর চেয়ে অনেক বড় একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বীরবল যখন এই পরিবর্ত্তনের খবর রাখেন না (তিনি কি রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন) তখন আর কাহার কাছে দাঁড়াই?'

এ প্রশ্নের উত্তর— বাঙলার গল্পসাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ নেই। সুতরাং তাঁদের কথিত ভাষাও যে কত দূর বীরবলী হয়ে পড়েছে তা আমার অবিদিত। দ্বিতীয় উত্তর— 'আমি বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।' কারণ সে মন্দিরে ইতিমধ্যে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সপ্তরথী মিলে যে বঙ্গ-সাহিত্যের অভিমন্যুকে বধ করেছেন, ভীষ্ম যে এখন শরশয্যায় শয়ান— এ সব কথা জেগে থাকলে আমি নিশ্চয় জানতে পেতুম। এ সব ঘটনা যে ঘটেছে তার সন্ধান পেলুম 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত কাজি নজর-উল ইসলামের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামক ট্রাজেডিতে। অবশ্য বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিমন্যু যে কে এবং সপ্তরথীরা যে কারা, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অভিমন্যু যিনিই হোন, তিনি যে মরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এই অপমৃত্যুর জন্য 'উত্তরা' শুনছি তারস্বরে রোদন করছেন। কিন্তু তার জন্য ভীষ্মর উপর চারধার থেকে যে কেন শরবর্ষণ হচ্ছে, তার হদিস পাচ্ছিনে। অভিমন্যু-বধের পূর্বেই তো ভীষ্মবধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে যিনি শিশুবধ করেছিলেন, তাঁর নাম অশ্বত্থামা। সে মতিচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তা জানিনে— আর যদি বা হয়েই থাকেন তো তাঁর অঙ্গে শর-নিক্ষেপ করা বৃথা কেননা সে পাপ অমর।

২

সে যাই হোক, আমি জেগে থাকলেও এ খুনোখুনির ব্যাপারে যোগ দিতুম না,

কারণ আমি জানি আমার হাতে আলপিনের চাইতে বেশি মারাত্মক অস্ত্র নেই। তবে এই সূত্রে কাজি সাহেব এমন একটি তর্ক তুলেছেন যে-তর্কে যোগদান করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি নে— কারণ সে তর্ক হচ্ছে ভাষার তর্ক, আর বৃথা ভাষার তর্ক করেই আমার জীবনটা বৃথায় গেল। কাজি সাহেব বলেছেন যে, 'কবিগুরু বলেছেন আমি কথায় কথায় রক্তকে খুন বলে অপরাধ করেছি।'

কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে কাজি সাহেবকে লক্ষ করে এ কথা বলেছেন— এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে-সভায় তিনি ও-কথা বলেন, সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যত দূর মনে পড়ে, কোন উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণস্বরূপ তিনি 'খুনে'র কথা বলেন। কোন উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।

সাহিত্যজগতে তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও-পদবাচ্য না হই, তা হলে কাজি সাহেবও তা নন। কারণ সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়েস ষোলো— আর কাজি সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা তো আর বিয়ের কনে নন যে দশে ও ষোলোয় বেশি তফাত করে। গত পরশ্ব একটি সারস্বত সমাজে আমাকে কেউ-কেউ প্রবীণ সাহিত্যিক বলে আর পাঁচ জনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। আমি যদি প্রবীণ হই, তা হলে কাজি সাহেব কী করে নবীন হন? এ ক্ষেত্রে নবীনে-প্রবীণে কি এত কম ব্যবধান? সত্য কথা এই যে, এ ক্ষেত্রে কোনই প্রভেদ নেই। যে-নবীন সাহিত্যিক প্রবীণ নন তিনিও তদ্রূপ সাহিত্যিক, যে-প্রবীণ সাহিত্যিক নবীন নন তিনি যদ্রূপ সাহিত্যিক। সাহিত্য হচ্ছে চিরনবীন ও চিরপুরাতন— সাহিত্যিকরাও তাই। সরস্বতীর নকরি গভর্নমেন্টের চাকরি নয় যে আপিসে senior, junior-এর কোন অর্থের প্রভেদ আছে। কার কত বয়েস সে খোঁজ সরস্বতী রাখেন না।

৩

বাঙলা কবিতায় যে খুন চলবে না, এমন কথা আর যে-ই বলুন, রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ কাজি সাহেব এ পৃথিবীতে আসার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা' নামক যে-কাব্য রচনা করেছিলেন সেই কাব্যের পাতা উলটে গেলে 'খুনে'র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এ সব 'খুন' এত বেমালুম 'খুন' যে হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।

তারপর কাজি সাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার অন্তরে আরবি, ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজি সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা যদি তাঁর ও-রকম কোন কুমতলব থাকত তা হলে

তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়্গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে একঘরে, এমনকী সংবাদপত্রেও আর পাঁচ জনের ভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না। বীরবলী ভাষা চলে শুধু বীরবলের সইয়ের ওপর, অর্থাৎ স্বনামে, অনামে নয়। বীরবল সাহিত্য সমাজে শুধু 'আমি' বলতে পারেন। 'আমরা' বলবার তাঁর অধিকার নেই। গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করবার অধিকারে তিনি বঞ্চিত। যাক সে সব কথা, বাঙলা সাহিত্য থেকে আরবি ও ফার্সি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন না। আর রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলা ভাষা জানেন না, এমন কথা বোধ হয় কোন অকরুণ তরুণ সাহিত্যিক বলতে চান না। আরবি-ফার্সি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে 'কলম' ছাড়তে হয়। কারণ ও-শব্দটি শুধু আরবি নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবি যে ও-শব্দ হাঁ করে কণ্ঠমূল থেকে উদ্‌গীরণ করতে হয়। ও 'ক' হিন্দু জবানে বেরয় না, এক কাশি ছাড়া— এই সূত্রে কাজি সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা যা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বেশের অনুরূপ সরস্বতীর বেশে গোঁজামিল দিলে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমরা হ্যাট-কোটও পরি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার অভিন্নহৃদয় সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যখন কবিতা লিখতে গিয়ে মিলের খাতিরে লিখে বসলেন— 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট', তখন দেশসুদ্ধ লোক হেসে উঠেছিল। সুতরাং সরস্বতী যদি এখন চুড়িদার-পায়জামা পরে, গায়ে কাবা ও মাথায় সেরওয়ান টুপি চড়িয়ে, হাতে রুমাল ঘোরাতে-ঘোরাতে রাজপথে দেখা দেন, তা হলে সকলে একবাক্যে বলে উঠবেন, 'ওঁকে বুরখা পরাও, বুরখা পরাও।' এ হচ্ছে যুক্তির কথা নয়, রুচির কথা।

৪

'কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা' যে সাহিত্যিক অপরাধ, তার কারণ কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ। অদ্যাবধি ফৌজদারী আদালতে, কোন উকিলই 'রক্তের মামলা' করেননি, কারণ অদ্যাবধি কোন বাঙালি রক্তের আসামী হয়নি। অশ্বত্থামার মতো যাঁর মাথায় খুন চড়ে যায় তাঁকেও রক্তের দায়ে কোন বিচারালয়ই ফেলতে পারে না। এর কারণও স্পষ্ট। কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।' কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে বঙ্গ-সাহিত্যে মুড়ি ও চালভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। ন্যায় সাম্যতে খুন ও রক্তের অদ্বৈতবাদ অচল। মা কালীর খুনে অরুচি নেই, তাই বলে শ্রীমান দিলীপকুমার যদি ভক্তিভরে তাঁর সুমুখে এই বলে গান ধরেন যে, 'কে দিয়েছে খুন জবা পায়'— তা হলে লট্ট-পট্ট-বেশিনী তন্মুহূর্তে অট্ট-অট্টহাসিনী হয়ে উঠবেন।

অভিধানে খুন এবং রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়। রক্তও বিশেষ্য, খুনও তাই। কিন্তু রক্ত উপরন্তু বিশেষণ, খুন তা নয়। অপর পক্ষে খুন ক্রিয়া, রক্ত তা নয়। আর আমরা যাকে 'পদ' বলি, তার দু'কুল আছে— এক অভিধানকুল, আর এক ব্যাকরণকুল। শব্দের এই দু'কুল রক্ষা করে ব্যবহার করাই সাহিত্যের ধর্ম।

সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব— যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেননি। কবিতা লিখতে হলে মিলের প্রয়োজন— অন্তত বাঙলা কবিতাতে তো তাই। এখন বাঙলা ভাষায় 'খুনে'র যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, 'রক্তে'র তার শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না। ক চ ট ত প বর্গের ভিতর ভক্ত শুধু রক্তের সঙ্গে মেলে, তারপর শক্ত। ব্যাস, ওইখানেই খতম। অপর পক্ষে খুনের মিলের আর অন্ত নেই। পঞ্চ বর্গের প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে খুনের মিল পাওয়া যায়। পুথি বেড়ে যায়, এই ভয়ে তার আর ফর্দ দিলুম না। আপনারা এই সব অক্ষরের গায়ে 'উন' চড়িয়ে দেখবেন মেলে কি না-মেলে। এমনকী বর্ণমালার শেষ অক্ষরজাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্বন্ধ অতি নিকট। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয়, তা হলে reason-এর খাতিরে rhyme-কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে, rhyme-এর খাতিরে reason-এর সাত খুন মাপ।

সা হি ত্যে র ক ল হ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ শরীরে পুণা থেকে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে বাংলা সাহিত্যের সুস্থ শরীর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত করে তুলেছেন।

তাঁর লেখনীর স্পর্শে আমাদের সাহিত্য সমাজে গুটি-তিনেক কলহের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপার দেখে আমার একটু হাসি পায়। বন্ধুবরের মতো সদালাপী ও সদানন্দ লোক আমাদের সমাজে অতি বিরল। এমন ধীর প্রকৃতির লোক যে আর পাঁচ জনকে অস্থির করে তুলেছেন, তার থেকে মনে হয় যে পৃথিবীর যত শান্ত লোকই আসলে যত অশান্তির কারণ। আর যিনি যত শান্ত, তিনি তত অশান্তির সৃষ্টি করেন।

শুনতে পাই যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গুণাগুণ নিয়ে যে মতভেদ আজকের দিনে কাগজে-পত্রে গর্জে উঠেছে, সে বাক্‌বিতণ্ডার মূলে নাকি আছে রাখালদাসের প্রতিকূল সমালোচনা।

পৃথিবীতে এমন কোন মত জন্মাতে পারে না— যার পিঠ-পিঠ তার উলটো মত না-জন্মায়। আস্তিকের পিঠ-পিঠ নাস্তিক জন্মাতে বাধ্য এবং আস্তিকতার বাড়াবাড়ির সঙ্গে নাস্তিকতারও বাড়াবাড়ি হয়। এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। শরৎবাবুর নভেলের সপক্ষ ও বিপক্ষের দলকে কাগজওয়ালারা যে সমান ঝাঁকিয়ে ও ঝাঁঝিয়ে তুলেছেন, তার প্রমাণ আমি সেদিন হাবড়া সহরে পেয়েছি। উক্ত সহরের একটি সাহিত্য-সভায় আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলুম। সে সভায় জনৈক নবীন সমালোচক শরৎবাবুর উপন্যাসের চরিত্রের বিশেষ পরিচয় আমাদের দিলেন। তাঁর মোদ্দা কথা হচ্ছে ও-সাহিত্য 'চরিত্রহীন'। শরৎ-সাহিত্যের এ রূপ নিন্দায় ক্ষুব্ধ হয়ে জনৈক নবীন প্রফেসর তার দীর্ঘ প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে নিরস্ত করি। কেন জানেন? সমালোচক মহাশয়ের প্রবন্ধের ভিতর থেকে একটি সত্য দিব্যি ফুটে বেরিয়েছিল। তিনি যে শরৎবাবুর গ্রন্থাবলী আদ্যোপান্ত তন্ন-তন্ন করে পড়েছেন, তার পরিচয় উক্ত প্রবন্ধের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে ছিল। লেখক পাঠকের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কী বড় সার্টিফিকেট পেতে পারেন? সমাজের উপর সাহিত্যের সুফল-কুফলের বিচার একেবারে নিষ্ফল। সাহিত্যও সমাজকে মারতে

পারে না, সমাজও সাহিত্যকে মারতে পারে না। এই দুই পারে কেবল পরস্পরের সঙ্গে প্রাণের আদান-প্রদান করতে। তবে মরা সমাজ অবশ্য জ্যান্ত সাহিত্যকে দূরে রাখতে চায়, পাছে তার স্পর্শে সে বেঁচে ওঠে এই ভয়ে।

সে যাই হোক, রাখালবাবু যদি সত্য সত্যই এই সাহিত্যিক বিবাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে তিনি বাঙলা সাহিত্যের মহা উপকার করেছেন। এই সব আলোচনার ফলে আমাদের নিন্দা-প্রশংসা দুই critical হয়ে উঠবে। আর critical faculty-র অভাব যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান অভাব, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

২

রাখালবাবু দ্বিতীয় বিবাদের সৃষ্টি করেছেন, রাজা গণেশ ও দনুজমর্দনের কুল-শীল নিয়ে। এ বিষয়ে যে প্রচণ্ড আলোচনা শুরু হয়েছে, সেটা ষোল আনা পণ্ডিতের বিচার। এ বিচারের পূর্বপক্ষ কি উত্তরপক্ষ কোন পক্ষই অবলম্বন করবার আমার অধিকার নেই। আমি আর যাই হই না কেন, অতীত-পণ্ডিত নই।

দাবা খেলার দর্শকদের পক্ষে উপর চাল দেবার লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব। আমি বাঙলার ঐতিহাসিক দাবা খেলার একজন অনুরক্ত দর্শক এবং সেই হিসেবেই এ বিষয়ে দুটো-একটা উপর চাল না দিয়ে থাকতে পারছি নে।

কোন নতুন লোকের প্রথম সাক্ষাৎ পেলে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়ের নাম কী? বাড়ি কোথায়? কী জাত? ঐতিহাসিকও ইতিহাসের কাছে সে কালের লোক সম্বন্ধে ঐ একই প্রশ্ন করেন। এখন ইতিহাস গণেশ ও দনুজমর্দনের নাম আমাদের বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কোথায় বাড়ি ও তাঁরা কী জাত, এ প্রশ্নর উত্তর প্রাচীন দলিল হয়ত দেয় না, নয়ত উলটোপালটা জবাব দেয়। এ অবস্থায় গণেশের ও দনুজমর্দনের কুল-শীল সম্বন্ধে যার যা পছন্দ তিনি সেই উত্তরই সত্য বলে মেনে নেবেন, আর কেউ তা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক যদি গণেশকে নিজের দলে টানতে চান, অথবা পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিকেরা যদি বলেন যে দনুজমর্দনের জন্মস্থান সপ্তগ্রাম নয়, সুবর্ণগ্রাম, তবে তাতে রাখালবাবুর কী যায় আসে, আর ইতিহাসেরই বা কী যায় আসে?

আমার ধ্রুববিশ্বাস যে, গণেশ ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। যে-লোক পাড়াগেঁয়ে জমিদার থেকে, গৌড়ের বাদসাহীতে প্রমোশন পেতে পারে তাঁর যে পাকা বিষয়-বুদ্ধি ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। আর বারেন্দ্রর আর কোন বুদ্ধি থাক আর নাই থাক, বিষয়-বুদ্ধি যে নেই এমন কথা কেউ বলে না। গণেশের পুত্র যদু ওরফে জালালুদ্দিন; তাঁকে যে-ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিল সে ব্রাহ্মণদের তিনি যে কী রূপ বিদায় দেন, সে বিবরণ ত রাখালবাবুর বাংলার ইতিহাসেই আছে। সে বিদায়ে যদু পুরো বারেন্দ্রবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নেই!

সে যাই হোক, এই সূত্রে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যে বাঙলার সমগ্র পতিত অতীতটাকে আত্মসাৎ করে নিলে, এই বলে কোন অ-বারেন্দ্রের দুঃখ করবার কোনই কারণ নেই। আমি যদি অ-বারেন্দ্র হতুম— আর বারেন্দ্ররা যদি এত নির্বোধ হত তা হলে আমি অতীতটাকে সেই মূর্খদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, এই ফাঁকে বাঙলার সমগ্র ভবিষ্যৎটা দখল করতে বসে যেতুম।

আসল কথা ও-দুই ব্যক্তির কোন জাত নেই। উভয়েই ছিলেন রাজা এবং রাজার যে কোন জাত নেই, সে কথা শাস্ত্রেও বলে; আর তাঁর কোন দেশও নেই, যে-দেশ তিনি ছলে বলে কৌশলে নিতে পারেন সেই দেশই তাঁর স্বদেশ। সে যাই হোক, এ বিষয়ে যে ঐতিহাসিকেরা দলাদলি করবেন— সে ত স্বাভাবিক। কারণ এঁরা হচ্ছেন দু'-দল। এক দল লিখবেন গণেশ— আর এক দল লড়বেন দনুজমর্দন। বন্ধুবর হচ্ছেন একাধারে ও-দুই। বোধ হয় সেই কারণে লোকে মনে করে যে এ কলহের সৃষ্টি তিনি করেছেন! কিন্তু এ অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গেই ঐতিহাসিক বিবাদের সৃষ্টি হতে বাধ্য। সৃষ্টির অর্থ যে প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ— এ সত্য সাংখ্য দর্শন পড়লেই বুঝতে পারবেন।

রাখালবাবু যে প্রথম বিবাদের সৃষ্টি করেছেন, সেটি হচ্ছে পুরো সাহিত্যিক, আর তৎকর্তৃক সৃষ্ট দ্বিতীয় বিবাদটি হচ্ছে পুরো ঐতিহাসিক। অতঃপর তিনি যে তৃতীয় বিবাদের সৃষ্টি করেছেন— সেটি হচ্ছে আধা সাহিত্যিক, আধা ঐতিহাসিক।

বন্ধুবর বলেছেন যে বাঙলার ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক নয়। এর উত্তরে অবশ্য অনেকে বলছেন যে তা ঐতিহাসিক না হোক, নাটক। এ তর্কের যে শেষ নেই, তা বলাই বাহুল্য। নাটক যে নাটক আর ইতিহাস যে ইতিহাস, এ বিষয়ে কোনই তর্ক নেই আর যে-বিষয়ে কোন তর্ক নেই, সে বিষয়ে তর্কের শেষও নেই। তবে ও-দুই একসঙ্গে মেশালেই যত গোলযোগ ঘটে। এ গোল সহজে মেটে যদি নাটককারেরা ইতিহাসকে ঐতিহাসিকের হাতে সঁপে দিয়ে নিরুপাধিক নাটক লেখেন। অন্যথা ঐতিহাসিকের হাত থেকে নাটককারের নিস্তার নেই।

'আলমগীর'-এর যে-সব ঐতিহাসিক ত্রুটি রাখালবাবু দেখিয়েছেন, তাতে করে শিশিরবাবুর অভিনয় কেউ বয়কট করবে না। 'তহব্বর খাঁ'র নাম 'দিলির খাঁ' বলায় ইতিহাসের পান থেকে চুণ খসলেও লোকে বলবে যে তাতে কিছু আসে যায় না। আর নাটক-রচয়িতা বলবেন যে, বেশ, 'আলমগীর'-এর তৃতীয় সংস্করণে 'দিলির' বদলে 'তহব্বর' করা যাবে। ও-নাটকের নাকি আর একটি কলঙ্ক এই যে কাম্‌বখ্‌স কখনই প্রেম করতে যাননি, কারণ তখন তাঁর বয়স ছিল সবে বারো। এর উত্তরে অনেকে বলবে যে কাম্‌বখ্‌স্ নিশ্চয়ই প্রেম করতে গিয়েছিল কারণ সে ছেলে ছিল

ইচড়ে পাকা, নয়ত তারা বলবে যে কাম্‌বখ্‌সের আর দশ বৎসর আগে জন্মানো উচিত ছিল। তারপর রাখালবাবু বলেছেন যে 'আলমগীর' নাটকের অনেক পাত্র-পাত্রী বর্ণিত ঘটনার আগেই যে মারা গিয়েছিলেন সে কথা 'আলমগীর'-এর লেখক জানেন না। এর সহজ উত্তর ইতিহাসকে যে ব্যক্তি শুধু একটা প্রকাণ্ড জন্ম-মৃত্যুর রেজিষ্টার মনে করেন সে ব্যক্তি নাটক রচনা করতে পারেন না। অতএব নাটককার কে কবে মারা গেল, তার খবর রাখতে বাধ্য নন।

৪

আমি যখন ঐতিহাসিকও নই নাটককারও নই, তখন আমি যে এ দলাদলির কোন দলে যোগ দিতে পারিনে, সে কথা বলাই বেশি। তবে এ সব বকাবকি শুনে আমার যা মনে হয়েছে, তা বলছি।

যদি ইতিহাসকে একেবারেই আমল না দিই তবে ঐতিহাসিক নাটক লেখবার কী প্রয়োজন? যিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখতে চান, তাঁর নাটক সৃষ্টি করবার অধিকার আছে, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করবার অধিকার নেই। ইতিহাসে নাটকেব অনেক মালমসলা আছে, পক্ষান্তরে অনেক dramatic ঘটনা আছে। সেই সব ঘটনার মৃত পাত্র-পাত্রীদের পুনর্জীবন দিতে পারলেই যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করা হয়। কাব্যের রং নাটকে যতই চড়াও না কেন, ইতিহাসের কাঠামো তাতে বজায় রাখতে হবে। সোমেন্দ্র তাঁর রচিত 'কথাসরিৎসাগর'-এর প্রথমেই বলেছেন, তিনি কথাবস্তুর স্বরূপ রক্ষা করে তার ভিতর কাব্যরস ঢুকিয়েছেন। এই ত চাই। পুরো ঐতিহাসিক সত্য বজায় রেখেও যে অপূর্ব সুন্দর নাটক গড়া যায় তার প্রমাণ শেক্সপিয়ারের 'Julius Caesar' ও 'Antony Cleopatra'. আমাদের কবি-কল্পনা যতই উদ্দাম হোক না কেন, সে কল্পনা ইতিহাস ত দূরে থাক, পুরাণকেও উলটে ফেলতে পারে না। আমরা যদি রামায়ণের কোন ঘটনা অবলম্বন করে নাটক লিখতে বসি, তা হলে আমরা রামকে লঙ্কেশ্বর ও রাবণকে লক্ষ্মণের সহোদর কিছুতেই বলতে পারি নে, যেমন আমরা কবিতায় দিনে চন্দ্র ও রাত্তিরে সূর্য উঠাতে পারি নে। কল্পনাও যে নানা রকম শৃঙ্খলাবদ্ধ, এ সত্য ভুললে সে কল্পনাকে মুক্ত করা যায় না।

বাঙলার ঐতিহাসিক নাটকগুলির ইতিহাস সব উপন্যাস কি না তা আমি বলতে পারি নে। কারণ ইতিহাসের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য। ফলে নাটক-নভেলের বর্ণিত ঘটনা ইতিহাস বলে মেনে নেওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। নাটক-নভেলের শিক্ষায় ইতিহাস সম্বন্ধে মত্তুল্য লোকের মনে নানা রকম আজগুবি ঐতিহাসিক ধারণা জন্মানো খুবই সম্ভব। বাঙলা নাটক-নভেল পড়ে প্রতাপাদিত্য, মিরকাশিম প্রভৃতির যে-ছবি আমার মানসপটে আমি অঙ্কিত করেছিলুম, তারপর

ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখি যে সে সব ছবি আর যারই হোক প্রতাপাদিত্যেরও নয়, মিরকাশিমেরও নয়। নাটক-নভেলের উদ্দেশ্য অবশ্য লোককে ইতিহাস শেখানো নয়, তবে ভুল ইতিহাস শেখানোও নয়! আর নাটক দেখে ও নভেল পড়ে আমরা যে ক্ষণিক আনন্দ পাই শুধু তাই নয; সেই পড়ার ও সেই দেখার রেশ আমাদের মনে রয়ে যায়। যার চর্চা করেছিলুম— শুধু আনন্দ লাভের জন্য, পরে দেখা যায়, তার থেকে পেয়েছি আমরা চিরস্থায়ী ভুল শিক্ষা।

এই সব কারণে আমি বলি, 'ঐতিহাসিক নাটক' লেখা যদি কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়, তা হলে সেটা সুখের বিষয়ই হয়। কারণ বস্তুত তা হলে বাঙলার বর্তমান নাটকের ভিতর ঢোকবার অবসর পাবে। আমাদের জীবনে কি ট্রাজেডি ও কমেডি নেই,— আছে শুধু প্রহসন?

ফরাসি সাহিত্য

চন্দননগরের মেয়র মহোদয় এবং সভ্যমণ্ডলী,

আপনাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা যে নিজেদের কত দূর ধন্য ও মান্য বোধ করছি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমরা কোন রূপ ওজর-আপত্তি না করে, আপনাদের ডাক শোনবা মাত্র এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যদিচ জ্যৈষ্ঠ মাসটা বিদেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার ঠিক উপযুক্ত সময় নয়। আমরা গরম দেশের লোক হলেও গ্রীষ্মকাতর। এই দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের অন্তরের সকল রস শুকিয়ে যায়, ফলে এ দেশে এ সময়ে আমাদের ভিতরে বাইরে কোন ফুলই ফোটে না—এক বিয়ের ফুল ছাড়া।

আমরা নিজেদের বিশেষ করে ধন্য মনে করছি এই কারণে যে, আমাদের এই সমিতি বাস্তবিকই একটি কচি সংসদ। এ সংসদের বয়েস এখন ছ'মাস মাত্র। মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মতো যে-সকল সভা-সমিতি ভূমিষ্ঠ হবা মাত্র যুদ্ধং দেহি বলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, আমাদের এ সমিতি সে জাতীয় নয়। সুতরাং এর নাম-ধাম সাধারণের অগোচরই থাকবার কথা। এ সমিতির উদ্দেশ্য একটা নতুন culture আত্মসাৎ করা। Latin culture জিনিসটে অবশ্য নতুন নয়, বহু পুরাতন। কিন্তু ও-বস্তু আমাদের কাছে অপরিচিত এবং সেই হিসাবেই নূতন। আমরা Latin culture বলতে সে শিক্ষাদীক্ষা বুঝিনে, যে-শিক্ষাদীক্ষা Latin ভাষার মারফৎ আয়ত্ত করতে হয়। এ Latin culture-এর অর্থ অত সঙ্কীর্ণ নয়; কিন্তু এর চাইতে ঢের উদার। য়ুরোপের যে-সকল ভাষা ল্যাটিন-বংশীয়, সেই সব ভাষার সাহিত্যচর্চা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। Culture জিনিসটে ধীরে-ধীরে অন্তরঙ্গ করতে হয়। সুতরাং আমাদের এই সদ্যপ্রসূত সমিতির যা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধন করা সময়সাপেক্ষ এবং তা-ও নির্ভর করবে ততটা পাঁচ জনের মিলিত চেষ্টার উপর নয়, যতটা ব্যক্তিগত সাধনার উপর।

এখন Indo-Latin এই সদ্যকল্পিত সমাসটির অর্থ আমরা, অন্তত আমি কী বুঝি, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমার বিশ্বাস, Indo এবং Latin এ দুই সভ্যতার ভিতর ততটা বিরোধ নেই, যতটা আছে মিল। ভারতবর্ষের উত্তরা-

পথের এবং কতক অংশ দক্ষিণাপথের লোকদের ভাষা সংস্কৃত-বংশীয়। প্রাকৃত আগে কি সংস্কৃত আগে, সে সমস্যার দিকে পিঠ ফিরিয়েই আমরা বিশ্বাস করি যে বাঙলা হিন্দি উড়ে ইত্যাদি ভাষা সব সংস্কৃতের বংশধর। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হলেও লৌকিক হিসেবে মিথ্যা নয়। ফরাসি ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা সব বনেদি ঘরের সন্তান, যেমন বাঙলা হিন্দি প্রভৃতি সব বনেদি ঘরের সন্তান। আমাদের ভাষার যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে, ফরাসি প্রভৃতিরও তেমনি ল্যাটিনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে। এই উভয় শ্রেণীর ভাষাই এক হিসেবে অতীতের বাণীর জের টেনে নিয়ে আসছে এবং এ দেশের সাহিত্যিক ভাষা যেমন সংস্কৃতের প্রভাবে গড়ে উঠেছে, ফ্রান্স ইতালির সাহিত্যিক ভাষাও তেমনি ল্যাটিন সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। মনে রাখবেন— আমি বলেছি প্রভাব, নকল বলিনি। নকল করে মানুষে সজ্ঞানে, কিন্তু প্রভাবের ফল ফলে আমাদের অজ্ঞাতসারে। আমরা যেমন আমাদের দেশের অতীত সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নই— ফরাসি প্রভৃতি জাতরাও তেমনি য়ুরোপের অতীত সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নয়। য়ুরোপের ক্লাসিক সভ্যতা ও ক্লাসিক ভাষা আর ভারতবর্ষের ক্লাসিক সভ্যতা ও ক্লাসিক ভাষা এক নয়। কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ের ভিতর মস্ত মিল আছে। উভয়ই ক্লাসিক। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ফরাসি ও ইতালির সাহিত্য ক্লাসিক মনোভাব-বঞ্চিত নয় এবং আমাদের সাহিত্যও তা হওয়া উচিত নয়।

আমার পক্ষে এ বিষয়ে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের আনুপূর্বিক বিবরণ আপনাদের কাছে সুমিষ্ট ফরাসি ভাষায় বিবৃত করবেন। তা করবার শক্তি আমার দেহে নাই।

এ স্থলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তবে কেন আমাকে এ সমিতির President করা হল। এ প্রশ্ন অবশ্য আপনাদের মনে হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, যে-ব্যক্তি ফরাসি ভাষা বলতেও পারেন না, লিখতেও পারেন না, তিনি কি হিসাবে এ সমিতির President elected হলেন। এর প্রথম উত্তর election-এর কৃপায় কে যে কোন্ পদ লাভ করবে, তা কেউ বলতে পারে না। ইংরাজরা বলে, Mysterious are the ways of providence আর election জিনিসটি providence-এর চাইতেও mysterious. সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে এ পদ লাভ করবার একটা প্রত্যক্ষ কারণ আছে। আমার বাড়িতে ফরাসি সাহিত্যের একটি লাইব্রেরি আছে, যে-লাইব্রেরিকে ঐ জাতীয় কলিকাতা নগরীর অন্যান্য লাইব্রেরির তুলনায় বড় বলা যায়। যাঁর গৃহে ফরাসি-সরস্বতী আলমারিতে চাবি বন্ধ হয়ে রয়েছেন, তিনি যে উক্ত সরস্বতীর গুণগ্রাহী, লোকের পক্ষে এ রূপ অনুমান করা তেমনি স্বাভাবিক, যাঁর ঘরে লক্ষ্মী সিন্দুকের ভিতর চাবি বন্ধ হয়ে থাকেন, তিনি

যে লক্ষ্মীব গুণগ্রাহী, এ রূপ অনুমান লোকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক। তবে অনেকে যেমন লক্ষ্মীর কেবল মাত্র রক্ষক হতে পারে, সরস্বতীরও যে তাই হতে পারে, এ কথা লোকে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি অবশ্য নিজেকে আপনাদের কাছে ফরাসি পুস্তকের ভারবাহী বলীবর্দ বলে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্র নই। ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে আমার আকৈশোর পরিচয় আছে এবং এ সাহিত্যের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ কালক্রমে পবিবর্ধিত হয়েছে। এই 'মনে'র টান বশতই আমি ফরাসি পুস্তক সংগ্রহ করেছি। এই ক্রম-বর্ধমান পুস্তকাবলীই বর্তমানে লাইব্রেরির আকার ধারণ কবেছে। এই পুস্তকাবলীর বহিরঙ্গ দেখে যদি কেউ অনুমান করেন যে, তার মর্মের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে, তা হলে সে অনুমান অসঙ্গত নয়। আমি কী সূত্রে কত দূর পর্যন্ত সে সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেছি, সে বিষয়ে দুটো ব্যক্তিগত কথা বলা, আশা করি, এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আপনারা সকলেই love at first sight বলে একটা কথা শুনেছেন এবং কারও কারও বা এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। ফরাসি সরস্বতীর সঙ্গে আমাব love at first sight হয়। কথাটা একটু খুলে বলি। আমি সেকালে যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হযে পড়ি। সে রোগের কুফলের জের অনেক দিন যাবৎ ছিল। সুতরাং বহুকালের জন্য কলেজ যাওয়া আমার বন্ধ ছিল। লেখা নেই, পড়া নেই, খেলা নেই, ধুলো নেই, একা একা দিবারাত্র ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অতি কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধে আমি, এই home intern-ment-এর অবস্থায় ফরাসি ভাষা শিক্ষা করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন আমার শিক্ষক।

তার পর হঠাৎ এক দিন একখানি ফরাসি নভেল আমার হাতে এল। সে নভেলখানি পড়বা মাত্রই আমি ফরাসি সাহিত্যের প্রতি ভালবাসায় পড়ে গেলুম।

সে নভেলের লিপিচাতুর্য, ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার যাথার্থ্য আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেললে। খালি মনে হতে লাগল, লেখকের কী চোখ, কী কান, কী নাক, কী বাক্। সে মোহ আজও কাটেনি। সে বইখানির নাম করতে ঈষৎ ইতস্তত করছি, কারণ সে নভেল কোন অষ্টাদশবর্ষ দেশীয় বাঙালি যুবকের পাঠ্য নয়। কিন্তু তার নাম গোপন করলে আমার মনের ইতিহাসের একটা বড় ঘটনার বিষয় চেপে যাওয়া হবে। তাই তার নাম করতে বাধ্য হচ্ছি। বইয়ের নাম হচ্ছে Bel-Ami আর তার লেখকের নাম Guy de Maupassant. দাদা আমাকে পড়াচ্ছিলেন Fenelon-এর Telemacque আর আমি নিজগুণে পড়ে বসলুম Bel-Ami. সে যাই হোক, উপস্থিত যুবকবৃন্দকে আমি ঐ জাতীয় নভেল থেকে ফরাসি সাহিত্যের চর্চা শুরু

করতে পরামর্শ দিইনে। ঐ লেখা কাব্যামৃত নয়— কাব্যমদিরা। Bel-Ami পড়ে যে আমি মুগ্ধ হয়েছি, সে কথা দাদাকে বলি। তাতে আমার ভ্রাতা, আমার উপর অপ্রসন্ন হননি, বরং আমার এই অকালপক্ক রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুসিই হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমি Bel-Ami-র চরিত্রের প্রতি অনুরক্ত হইনি, চমৎকৃত হয়েছিলুম Guy de Maupassant-র প্রতিভার পরিচয় পেয়ে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সাহিত্য-চর্চায় বাধা ত দেনই নি— আমার সাহিত্যপ্রীতিকে কোন একটা বিশেষ বাঁধাধরা পথে চালাতেও চেষ্টা করেননি। এটি আমি একটি মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে কবি; কেননা, আমার বয়েসের ছোকরার কোন্ বই পড়া উচিত, আর কোন্ বই পড়া উচিত নয়, সে বিষয়ে তাঁর যদি একটা দৃঢ় মত থাকত, তা হলে খুব সম্ভবত ফরাসি সহিত্যের চর্চায় আমাকে অচিরে ক্ষান্ত দিতে হত। কেননা, ও-সাহিত্যের যে সব বই আমাদের বাড়িতে ছিল, তাদের মধ্যে সম্ভবত একখানিও সুকুমারমতি বালক-বালিকার পাঠ্য নয়, একমাত্র Fenelon-এর Telemacque ছাড়া। দাদার লাইব্রেরিতে যে সব পুস্তক ছিল, তাদের নাম করলেই ফরাসি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারবেন যে, সে সব বই কত দূর যুবজন-পাঠ্য।

Daudet-এর Sapho, Loti-র Marriage de Loti, Flaubert-এর Madame Bovery, Gautier-এর Mademoiselle de Maupin প্রভৃতি গ্রন্থ আমি অবাধে গলাধঃকরণ করি, Zola-র Nana যে পাতা পঞ্চাশেকের বেশি পড়িনি, তার কারণ তাঁর লেখা আমার মোটেই মুখরোচক হয়নি। এ সব পূর্বকাহিনী আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এইটুকু আপনাদের জানানো যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি ফরাসি সাহিত্যের ভক্ত, বিশেষত সেই সাহিত্যের যা পুরো মাত্রায় ফরাসি। আর ও-সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষত উক্ত গ্রন্থগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই বুঝবেন যে, আমি ফরাসি সাহিত্যের গাছে না চড়তেই তার এক কাঁদি নামাই। এ কথা বলবার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। বই বয়কট করায় কোন লাভ নেই, কারণ বই পড়ার ফল কার পক্ষে সু হবে, কার পক্ষে কু হবে, আর কার উপর কিছুই হবে না, তা আগে থাকতে বলা অসম্ভব।

আমি ফরাসি সাহিত্য যত দূর জানি, ফরাসি ভাষা তত দূর জানি নে। কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত শোনালেও, মিথ্যা নয়। সাহিত্যজ্ঞান অবশ্য ভাষাজ্ঞানসাপেক্ষ। আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে ও-দুই জ্ঞানের ভিতর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। তৎসত্ত্বেও উক্ত দুই জ্ঞান— দুই, এক নয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করবা মাত্র যে লোকে সংস্কৃত সাহিত্যরসের রসিক হয়ে ওঠে, তা অবশ্য নয়। তা যে হয় না, সে কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গিয়েছেন। সুতরাং ব্যাকরণ অভিধানের সামান্য জ্ঞানের সাহায্যেও সাহিত্যের রস

গ্রহণ করা সম্ভব। এ সত্যের পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায় যে, অনেক সঙ্গীত-অনুরাগী লোক দিবারাত্র গানবাজনা শুনেই সঙ্গীতরসের রসিক হয়ে উঠেন, যদিও তাঁরা না পারেন গাইতে, না পারেন বাজাতে, না পারেন সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে। সঙ্গীতের এতাদৃশ গুণগ্রাহীদের গুণীরা বলেন সমজদার। আমি ফরাসি সাহিত্যের ঐ জাতীয় একটি সমজদার মাত্র। আর ফরাসি ভাষা যে আমি যথেষ্ট জানি নে, তার প্রমাণ নবীন ফরাসি লেখকদের লেখা আমি বিনা আয়াসে বুঝতে পারিনে। তাঁদের লেখা পড়তে গেলে আমাকে ক্রমান্বয়ে অভিধানের শরণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যে দুই ভাষা আমি সত্য সত্যই জানি অর্থাৎ বাঙলা ও ইংরাজি, সে দুই ভাষার কোন পুস্তকই পড়তে আমার অভিধানের শরণাপন্ন হতে হয় না, সে পুস্তকের লেখক যতই নবীন হোক না কেন। এতাদৃশ বিদ্যে নিয়ে আপনাদের কাছে ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে যে আমি এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, যে-সাহিত্য চর্চা করে আমি যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছি, সে আনন্দের ভাগ অপরকে দেবার প্রবৃত্তি আমার পক্ষে স্বাভাবিক আনন্দ। জিনিসটে ত আর টাকা নয় যে, তার ভাগ অপরকে দিতে গেলে নিজের পুঁজি কমে যাবে। তাই যে-সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ আছে, সে সাহিত্যের প্রতি পাঁচ জনেও যাতে অনুরক্ত হন, এ আমার অন্তরের বাসনা।

আমরা বাঙালিরা স্বভাবত এবং শিক্ষার গুণে সাহিত্যানুরাগী; সুতরাং যে-সাহিত্যের সঙ্গে নানা কারণে অপরের পরিচয় ঘটেনি, সে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা আপনাদের মনে জাগরুক করা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি সঙ্গত—বিশেষত এই চন্দননগরে। এ সহরে ফরাসি ভাষার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় সকলেরই আছে, সুতরাং ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করা আপনাদের পক্ষে যতটা সহজসাধ্য, বাদবাকি বাঙালির পক্ষে ততটা নয়। কলিকাতা সহরে নিত্য দেখতে পাই যে, বই-পড়া যুবকের দল Anatole France-এর গ্রন্থাবলী একমনে গলাধঃকরণ করছেন, কিন্তু তা ইংরাজি ভাষায়! আপনাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা যে কেন উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসি ভাষায় পড়বেন না, তা আমি বুঝতে পারিনে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, মূল এবং অনুবাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কোন গ্রন্থ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করলেই তার রূপ অন্তরিত হয়। কথাটা যে ঠিক, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়। 'রঘুবংশ' প্রথমে সংস্কৃত পড়ুন, তারপর তার বাংলা অনুবাদ পড়ুন, তা হলেই দেখতে পাবেন, বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে আমরা তার রূপ ও প্রাণ দুই হারিয়ে ফেলেছি, রক্ষা করেছি শুধু তার কঙ্কাল মাত্র। অনূদিত সাহিত্য প্রায়ই হাড় বার করা সাহিত্য। এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা বাঙালিরা কেবল মাত্র

সাহিত্যের ভোক্তা নই, তার কর্তাও বটে। আমরা স্বভাষায় এখন নব বঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছি। এই নব-সাহিত্য যে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠছে, তা অস্বীকার করায় কোন সুসার নেই। কারণ সকলের কাছেই তা প্রত্যক্ষ সত্য। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে কতক অংশে অনুকূল, কতক অংশে প্রতিকূল। উপরন্তু সে সাহিত্যের কোন নূতন ধাক্কা আমাদের মনকে নূতন করে নড়িয়ে দেবে না, ও-সাহিত্য আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

ইংরাজরা যাকে বলে style আর আলঙ্কারিকরা বলেন রীতি; প্রথমত সেই রীতির কথাই ধরা যাক। এ যুগ প্রধানত গদ্য-সাহিত্যের যুগ। এখন এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ইংরাজি গদ্যের রীতি বাংলায় রচনার পক্ষে অনুকূল নয়। কারণ, প্রথমত ইংরাজি গদ্যের কোন একটা স্পষ্ট মার্কা-মারা রীতি নেই। ইংলন্ডের প্রত্যেক বড় গদ্য-লেখকের একটি করে নিজস্ব রীতি আছে। উদাহরণস্বরূপ দুটি বড় ইংরাজ লেখকের কথা ধরা যাক। Thackeray এবং Ruskin. এঁদের এক জন লিখেছেন নভেল, আর একজন লিখেছেন প্রবন্ধ। দু'জনেরই style ইংরাজি সাহিত্য সমাজে অতি প্রশংসিত। এখন এ দুই রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আগে Esmond-এর এক পাতা, তার পর Modern Painters-এর এক পাতা পড়লে সকলের কাছেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইংরাজি সাহিত্যে অনেক প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু গুণীর সাক্ষাৎ বড় একটা মেলে না। প্রতিভাবান লেখকের প্রভাব সাধারণ লেখকদের উপর বড় একটা হয় না, কারণ ও হচ্ছে এক রকম ঐশী শক্তি। ও-শক্তি শিক্ষার ফলে আয়ত্ত করা যায় না। Talent হচ্ছে পুরো মাত্রায় মানবী শক্তি। সে শক্তি একে কতক পরিমাণে অপরের মনে সঞ্চারিত করতে পারে। গদ্য-সাহিত্য মুখ্যত মানুষের talent-এরই সৃষ্টি। এখন ফরাসি গদ্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। এই কারণে আমি মনে করি যে, ফরাসি গদ্যের প্রভাব বাঙালি গদ্যের স্ফূর্তির অনুকূল।

ভাষার চরিত্রের উপর সাহিত্যের চরিত্র অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এখন একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। ইংরাজি ভাষা এবং ফরাসি ভাষার মধ্যে মস্ত একটা তারতম্য আছে। ইংরাজির ভাণ্ডারে যত শব্দ আছে, ফরাসির ভাণ্ডারে তত নেই। Webster-এর ডিক্সনারির সঙ্গে Littré ডিক্সনারি তুলনা করে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, ফরাসি কোষখানি ইংরাজি কোষের তুলনায় আকারে কত ছোট। এ রূপ হবার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইংরাজি হচ্ছে য়ুরোপের উর্দু। ব্রজ ভাষার উপর ফার্সি শব্দ আরোপ করে যেমন উর্দুর সৃষ্টি করা হয়েছে, Anglo-Saxon ভাষার উপর Norman French শব্দ আরোপ করে তেমনি ইংরাজি ভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ দুয়ের সৃষ্টি হয়েছে একই ঐতিহাসিক কারণে।

ইংরাজি তারপর নানা ভাষা থেকে বেপরোয়াভাবে শব্দ সংগ্রহ করেছে। ফলে এই পাঁচমিশলি ভাষা অক্ষর-ডম্বর, ফরাসি ভাষা ততটা নয়। এ বিষয়ে বাঙলা ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার একটা আকৃতিগত মিল আছে। উভয় সরস্বতীই কৃশাঙ্গী। উক্ত কারণে ইংরাজদের ধারণা যে style-এর ঐশ্বর্য, শব্দের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, তাই আমরা যখন বাঙলা ভাষার দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ করি, তখন আমরা ইংরাজি ভাষার শব্দসম্ভারের দিকে নজর দিয়েই মাতৃভাষার দৈন্যের কথা ভেবে নিরাশ হই। এখন যে-ভাষার অসংখ্য কথা আছে, সে ভাষার সাহিত্য অমিতভাষী হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যার হাতে সে ঐশ্বর্য নেই— সে মিতভাষী হতে বাধ্য। ফরাসি গদ্যের প্রধান গুণ এই যে, সে গদ্য সংযতভাষী। মৃচ্ছকটিক নাটকে চারুদত্ত, বসন্তসেনা সম্বন্ধে বলেছেন, প্রগল্ভং।/ ন বদতি যদ্যপি ভাষতে বহুনি।।

ফরাসি লেখকদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। মিতব্যয়ী ও অমিতব্যয়ীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, একজন ব্যয় সম্বন্ধে হিসেবী, আর একজন বেহিসেবী। সাহিত্যে শব্দের খরচ সম্বন্ধে ইংরাজি সাহিত্য বেহিসেবী আর ফরাসি সাহিত্য হিসেবী। ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা এ বিষয়ে সতর্ক হব।

ফরাসি সাহিত্য শব্দাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত নয় বলে অনেকে মনে করেন, ইংরাজি সাহিত্যের তুল্য এ সাহিত্যের গৌরব নেই। গৌরবের অর্থ যদি হয় গুরু-ভারাক্রান্ত, তা হলে অবশ্য ফরাসি সাহিত্য ইংরাজি সাহিত্যের তুলনায় লঘু, অসি যেমন লগুড়ের চাইতে লঘু। আমি চাই যে বাঙলা গদ্য এই হিসেবে লঘু হয়। তাতে তার ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা বাড়বে, এ সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত উত্তরসাধক হচ্ছে ফরাসি সাহিত্য।

ফরাসি সাহিত্যের প্রধান গুণ যে প্রসাদগুণ, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। ফরাসি গদ্য শুধু জলবত্তরল নয়, জলবৎ স্বচ্ছ। এ স্বচ্ছতা, আসলে ভাষার গুণ নয়, মনের গুণ। মানুষের মনোভাব যদি পরিষ্কার হয়, তা হলে তার প্রকাশও পরিষ্কার হতে বাধ্য। মনোভাবকে সাকার করবার কৌশল ফরাসি জাত যুগ-যুগ ধরে সাধনার ফলে লাভ করেছে। আমি এ গুণকে সাহিত্যের মহাগুণ মনে করি। আমরা মনোভাবকে কখনই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারিনে, যদি না সে ভাব আগে আমাদের মনে স্পষ্ট হয়। আমাদের মনোভাব যদি নিরাকার হয়, ত তাকে কথায় সাকার করা অসম্ভব। মনের ভিতর ভাবগুলো সব এলোমেলো ভাবে আসে, সেই এলোমেলো ভাবগুলোকে মনে-মনে গুছিয়ে না নিতে পারলে, তাদের আমরা অপরের কাছে ধরে দিতে পারিনে। মনোভাবকে প্রকাশ করবার কৌশল হচ্ছে, আসলে সে ভাবকে মনে মূর্ত করবার কৌশল, তাকে ভাষার কাপড় পরাবার ওস্তাদি নয়; মনের কথা গুছিয়ে বলবার আর্ট ফরাসি লেখকদের তুল্য আর কোন

দেশের লেখকের আয়ত্ত নয়। একে এক হিসেবে লেখার logical গুণ বলা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ গুণকে aesthetical গুণ বলতে কুণ্ঠিত নই। ফরাসি সাহিত্যের এই প্রসাদগুণ পাঠকের মনকে বিশেষ করে আনন্দ দেয়। অনেকের মতে এই গুণই ফরাসি সাহিত্যের দোষ। তাঁরা বলেন, ফরাসি সাহিত্যে আছে শুধু আলোক, আর নেই তাতে ছায়া। ও একটা কৃত্রিম সৃষ্টি, কেননা যা প্রকৃত তা আলোছায়ায় মিশ্রিত। ফরাসি সাহিত্যে যে সবই ব্যক্ত, তার অন্তরে যে অব্যক্ত বলে কোন পদার্থ নেই— এ কথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। কারণ এই ভগবানের সৃষ্টি কতক ব্যক্ত, আর অনেকখানি অব্যক্ত। ফরাসি সাহিত্যিকরা যে ভগবানের চাইতেও বড় গুণী, ও-মত আমি গ্রাহ্য করতে পারিনে। সে যাই হোক, মনোরাজ্যে শুধু ছায়ার চাইতে, শুধু আলোক ঢের বেশি কাম্য। কাব্য বাদ দিয়ে সাহিত্যের অপরাপর প্রদেশে এই প্রসাদগুণ যে মহাগুণ, তা কোন মানসিক ছায়াপ্রিয় লোকও অস্বীকার করতে পারবেন না। ইতিহাস বলো, আইন বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান বলো, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রই ফরাসি প্রতিভা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

এ সভায় আমার বিশ্বাস এমন অনেকে উপস্থিত আছেন, যাঁদের ইংরাজি আইনের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় আছে। ইংরাজি আইন ভাল কি ফরাসি আইন ভাল, সে বিচার এ ক্ষেত্রে আমি করতে যাচ্ছি নে। আমার বিশ্বাস, ইংরাজি আইন য়ুরোপের অপর সকল আইনের চাইতে প্রবৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরাজি আইনের বই পড়া অতি কষ্টকর, লেখবার দোষে। অপর পক্ষে ফরাসি ভাষার আইনের সবই অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি সুখপাঠ্য, লেখবার গুণে। এ জাতীয় পুস্তকের অন্তরেও ফরাসি গদ্য-লেখকের হাত স্পষ্টই দেখা যায়।

আর দর্শন? যিনি কখনও ও-শাস্ত্রের চর্চা করেছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে, Bergson-এর লেখায় যাদু আছে। এ দর্শনকে কাব্য বলতে আমি দ্বিধা করি নে। এমন প্রসন্ন, এমন উজ্জ্বল, এমন মনোমুগ্ধকর রচনা কাব্যজগতেও বিরল। Bergson-এর লেখার ভিতর জড়তার লেশ মাত্র নাই। এমন মুক্ত স্বচ্ছন্দসলিল ভাষায় আর কেউ কখনও দর্শন লিখেছেন বলে আমি জানি নে। Plato-র দর্শন আমি গ্রীক ভাষায় পড়িনি। আর শঙ্করের রচনার লেখাগুলি যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরিচ্ছন্ন আর তেমনি সুশ্লিষ্ট। ও এক রকম সাহিত্যিক ইউক্লিড। ওতে বিন্দু মাত্র রঙ নেই। আমরা যাকে সত্ত্ব গুণ বলি, এই ফরাসি দার্শনিকের রচনায় তার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। যে-গুণ ফরাসি গদ্যের নিজস্ব গুণ, সেই গুণেরই চরম বিকাশ Bergson-এর রচনায় পাওয়া যায়। সুতরাং Bergson-এর মোহ ফরাসি গদ্য-সাহিত্যের মোহ। আমরা লেখকই হই, আর পাঠকই হই— ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনকে অনেকটা জড়তামুক্ত করবে। এই বিশ্বাসবশতই আমি স্বজাতিকে ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করতে অনুরোধ করি। ফরাসি সাহিত্যের আর

এক মহাগুণ এই যে, তা সর্বজনীন বাণী, ইংরাজিতে যাকে বলে universal. এ সাহিত্য দোষে-গুণে বিশ্বমানবের মনের জিনিস। আমি কল্পনা করতে পারি নে যে, পৃথিবীতে এমন কোন জাত থাকতে পারে, যাদের কাছে Molière, কিম্বা Voltaire-এর লেখা বিদেশি মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। তাঁদের ভাষাও যেমন সহজবোধ্য, তাঁদের মনোভাবও তেমনি সর্বমানবগ্রাহ্য। শুনতে পাই যে, ফরাসি দেশেও এমন লেখক আছেন, যাঁদের লেখার রস শুধু ফরাসিরাই উপভোগ করতে পারে, আর কেহই পারে না। এ জাতীয় সাহিত্যিক যদি ফরাসি দেশে থাকে, তা হলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। ও-দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যই সকলের সমান উপভোগ্য। আমরা ভারতবর্ষীয় লোকরা নানা জাতের ও নানা দেশের লোক। সুতরাং সেই মনোভাবের চর্চা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, যে-মনোভাব কোনরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয় কিংবা স্থানীয় সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃতে যাকে বলে 'সামান্য' মনোভাব, তার প্রতি স্বভাবতই আমাদের মন অনুকূল। জর্মানি প্রভৃতি দেশের সাহিত্য 'বিশেষ' মনোভাবের চর্চা করাটাই তাদের সাহিত্যিক বিশেষত্ব মনে করে। এই কারণে ফবাসি সাহিত্যের এই সার্বজনিক ভাবটা আমাদের ভারতবর্ষীয় মনের কুটুম্ব।

আমাদের এই ভারত-রোমক সমিতি যদি উভয় জাতির এই মানসিক কুটুম্বিতা-চর্চার সহায় হয়, তা হলেই তার জন্ম সার্থক।

ভা র ত রো ম ক স মি তি

১

আমাদের এই Indo-Latin সমিতি আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলে। এ সমিতিকে যে আমরা এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, এ আমাদের কম কৃতিত্বের কথা নয়। কারণ, এ জাতীয় সমিতি এ দেশে বড় বেশি দিন টেঁকে না পাঁচ জনের সহানুভূতির অভাবে। দেশের লোক যে-সব বিষয়ের চর্চা আমাদের নিত্য কর্তব্য মনে করে, এ সমিতিতে সে সব বিষয়ের কোন রূপ আলোচনা হয় না, আর যে-সব প্রচেষ্টার হাত-হাত কোন সুফল অথবা কুফল দেখাতে পারা যায় না, কেজো লোকে সে সব প্রচেষ্টাকে বাজে সখ হিসেবেই গণ্য করে।

তবে আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এ সমিতি স্থাপনের কোন সার্থকতা আছে, তা হলে অপরের এ সমিতি নিরর্থক মনে করায় কিছু যায় আসে না। সুতরাং আমরা পাঁচ জনে কী উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছি এবং কী উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব, সে বিষয়ে আমাদের মনে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তা যে থাকা উচিত সে বিষয়ে আশা কবি আমরা সকলেই একমত। আমরা যখন ফরাসি সাহিত্যের ভক্ত তখন যে আমরা clear এবং definite idea-র পক্ষপাতী, তা বলাই বাহুল্য।

এখন আমরা হচ্ছি কারা? সে বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক। আমাদের সকলেরই ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। উপরন্তু আমাদের অনেকেরই ফরাসি দেশের সঙ্গেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-পরিচয় আছে। এবং সে পরিচয়ের ফলে আমরা ফরাসি ভাষা ও ফরাসি জাতির প্রতি অনুরক্ত হয়েছি বই বিরক্ত হইনি; কারণ ফরাসি জাতির সঙ্গে আমাদের সাংসারিক হিসেবে কোন দেনাপাওনা নেই, ও-জাতি আমাদের জমিদারও নয়, মহাজনও নয়। অতএব আমাদের পক্ষে মনোজগতে ফরাসি মনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা স্বাভাবিক ও সহজ। এই অনুরাগবশতই আমরা প্রসন্ন মনে ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করতে পারি। এর থেকে কি এই অনুমান করতে হবে যে আমাদের সমিতি হচ্ছে জন-কতক ফরাসি সাহিত্যের রসপিপাসু যুবকের আপান মণ্ডল মাত্র? আমার বিশ্বাস তা নয়,

কেননা ও-claret একা ঘরে বসেও পান করা যায়, এবং সম্ভবত অসামাজিক অর্থাৎ অপরিমিত মাত্রায়।

২

প্রথমত, এ সমিতির নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। Indo-Latin সমাসটির বাঙলা হচ্ছে ভারত-রোমক সমিতি। এ সমাসের অর্থ মস্ত ফলাও। কিন্তু আমরা এর একটি সঙ্কীর্ণ অর্থেরই উপর আমাদের এ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছি। বাঙালি মনকে ফরাসি মনের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর ভারত বলতে যে আমরা ছেরেফ বাঙলা বুঝি, তার চাক্ষুষ পরিচয় একবার আমাদের দিকে যিনি তাকিয়ে দেখবেন তিনিই পাবেন।

তারপর ইউরোপে যে-সকল ভাষা ল্যাটিনের অপভ্রংশ বলে গণ্য সে সকল ভাষার চর্চা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয; একমাত্র ফরাসি সাহিত্য চর্চা কববার দিকেই আমাদের ঝোঁক। এর প্রথম কারণ, ইতালীয, স্প্যানিস, পর্তুগিজ, রুমে-নিয়ান প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই জানাশুনো নেই, আর যদি কারও এদের দু'একটির সঙ্গে থাকে ত সে উপর-উপর মাত্র।

আমি ইতালীয় ভাষা অল্পস্বল্প জানি। ও-ভাষা আমি কত দূর আয়ত্ত করেছি, তার পরিচয় এই থেকেই পাবেন যে, যে-ক'পাতা বাঙলা পড়তে আমার এক ঘণ্টা লাগে সে ক'পাতা ইংরেজি পড়তে লাগে দু'ঘণ্টা, ফবাসি চাব ঘণ্টা, আর ইতালীয় আট ঘণ্টা। এর কারণ, এর চাইতে বেশি ইতালীয় ভাষা শিখতে আমার কখনও লোভ হয়নি, হবার কোন কারণও ছিল না।

ইতালীয়, স্প্যানিস প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্য আছে কিন্তু সে সবই সেকালের, এ কালের নয়। দান্তে পড়া সংস্কৃত পড়ারই তুল্য, কারণ Inferno-র কাছে পৌঁছতে হলে তার পূর্বে ইতালীয় ভাষামার্গে অনেক ক্লেশ করতে হয়। সে ক্লেশ করতে আমরা অনেকেই প্রস্তুত নই, কারণ আধুনিক ইতালির সাহিত্য তাদৃশ উজ্জ্বল ও মনোহারী নয়, যার রূপ আমাদের সহজে আকৃষ্ট করতে পারে। আর সে সাহিত্যের ভিতর যা চিত্ত-প্রমাথী তা ফরাসি ছাঁচে ঢালা, যথা d'Annunzior-র নাটক-নভেল। ল্যাটিন জাতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র ফরাসি সাহিত্যই বর্তমানে যথার্থ ঐশ্বর্যবান। সুতরাং ফরাসি ভাষার জ্ঞানলাভ করা শিক্ষিত লোক মাত্রেই কর্তব্য এবং আমার বিশ্বাস Romance ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষাই বিদেশিদের পক্ষে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, অন্তত সেই সব বিদেশিদের পক্ষে, ইংরাজি ভাষা যাঁদের কণ্ঠস্থ। সুতরাং ফরাসি ভাষা শেখা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য এবং তা শেখা যে কষ্টকর নয়, এ ধারণা পাঁচ জনের মনে জন্মে দেওয়াটাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য; অন্তত আমি তাই মনে করি।

৩

সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন বিদ্যার যাঁরা চর্চা করেন, যথা দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি, তাঁরা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ও-সকল শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের সকলেরই জার্মান ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। অর্থাৎ একমাত্র ইংরাজি ভাষার মারফৎ ও-সব শাস্ত্রের সম্যক্ চর্চা করা যায় না। একটি কারণ, ও-সব শাস্ত্রের ফরাসি ও জার্মান সকল পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ নেই। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে— মূল ও অনুবাদ এক জিনিস নয়।

বিজ্ঞান আমার অধিকার-বহির্ভূত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে মূল গ্রন্থের কী প্রভেদ আছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারি নে। তবে যেহেতু দর্শনও এক রকম সাহিত্য, সুতরাং হেগেল অথবা Bergson-এর মূল গ্রন্থ যে এক এবং তার অনুবাদ যে আর [এক], সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

আমি পূর্বেই বলেছি যে জার্মান ভাষা আমার নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত, তবুও জার্মান হেগেল ও ইংরাজি হেগেল যে যমজ ভ্রাতা নয়, এ কথা সাহস করে বলতে পারি।

জনৈক ফরাসি দার্শনিক বলেছেন যে, তিনি কখনও হেগেলের মতের বিচার করেননি, তার কারণ তিনি হেগেলের মূল গ্রন্থ সব অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। তার থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, হেগেলের লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে তার শুধু অস্থি রক্ষা করা যায়, কারণ অনুবাদকের লেখনী-স্পর্শে হেগেলের রক্ত-মাংস ঝরে পড়ে। আর হেগেল-দর্শনের হাড়ের মূল্য বেশি নয়— তার গভীর প্রাণের পরিচয় ঐ রক্তমাংসেই পাওয়া যায়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি। Bergson-এর ফরাসি লেখার সঙ্গে তার ইংরাজি অনুবাদের প্রচুর প্রভেদ আছে। Bergson মূলে কাব্য ও অনুবাদে বিজ্ঞান।

সে যাই হোক, অনূদিত সাহিত্য যে রূপলাবণ্যহীন সাহিত্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শুনতে পাই, এ যুগের একটি মাত্র বড় লেখক আছেন যাঁর রচনা একমাত্র অনুবাদেই রূপ লাভ করে এবং তাঁর নাম Romain Rolland. কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল ফরাসি লেখক Romain Rolland-এর সহোদর নন, সুতরাং তাঁদের রচিত সাহিত্য অনুবাদে পড়লে আমরা শুধু দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হব।

৪

আমার জ্ঞান হয়ে অবধি য়ুরোপীয় মনোভাবের সঙ্গে স্বদেশি মনোভাবের মৌলিক প্রভেদের কথা শুনে আসছি, যদিচ স্বদেশি মনোভাবটা যে ঠিক কী, তা এ যুগে কেউ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেননি। অপর পক্ষে বহু য়ুরোপীয়ের ধারণা যে আমরা যে-সব মনোভাব প্রকাশ করি তা য়ুরোপীয়ও নয়, ভারতবর্ষীয়ও নয়,

পুরোপুরি ইংরাজি। এ ধারণা য়ুরোপীয়দের মনে এতটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মন Anglo-Saxon কি না তা নিয়ে সে দেশে মহা তর্ক ওঠে। Belloni নামক জনৈক ইতালি দেশের সংস্কৃতের অধ্যাপক য়ুরোপীয়দের মন থেকে এই অদ্ভুত সন্দেহ দূর করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পর্যন্ত সবই একই জাতীয় মন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নচেৎ রবীন্দ্রনাথ যদি Anglo-Saxon মনের পরিচয় দিতেন, তা হলে য়ুরোপীয়দের সে সাহিত্য চর্চা করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ Anglo-Saxon আত্মার রূপ য়ুরোপীয়দের কাছে সুপরিচিত। Anglo-Saxon মন নাকি একটি বিশেষ জাতীয় মন, সামান্য মানবমন নয়। সে মন যতটা সুস্থ ততটা সুন্দর নয়, যতটা সবল ততটা সচল নয়, এবং অপর মনের উপর তার যতটা প্রভুত্ব আছে, ততটা সখ্য নেই। এ মন অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ।

এ কথা শুনে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, য়ুরোপের এক জাতের সাহিত্যের সঙ্গে অপর আর এক জাতের সাহিত্যের কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ও-সবই কি এক ছাঁচে ঢালা নয়? তা হলে বলি, য়ুরোপীয় সাহিত্য মাত্রই সেই হিসেবে এক ছাঁচে ঢালা যে-হিসেবে স্ত্রীলোক মাত্রই এক ছাঁচে ঢালা; অর্থাৎ তাদের সবারই নাক আছে চোখ আছে কান আছে ঠোঁট আছে, আর এই সব উপাঙ্গের মাপ-জোখের হেরফেরে তাদের মোহিনী শক্তির প্রচুর প্রভেদ হয়।

আমি এ কথাটি উল্লেখ করলুম এই জন্য যে ইংরাজি মনোভাব যে একমাত্র পাশ্চাত্য মনোভাব তা মোটেই নয়, সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভাবের ভিতর আমরা না ভেবেচিন্তে যে দাঁড়ি টানি সেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আর এ কথাটাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের বর্তমান মনের উপর ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব এত বেশি যে, সে প্রভাবের ফলে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমরা যখন ইংরাজি সভ্যতার নিন্দা করি তখন সত্য-সত্য যা করি তা হচ্ছে সে সভ্যতার অতি-প্রশংসা। কারণ সে নিন্দার মূলে থাকে ইংরাজদের কাছে ষোল আনা ধার-করা বিলেতি মন। Imitation is the sincerest form of flattery— এ হচ্ছে ইংরাজদেরই কথা।

ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ও ভক্তি দুই-ই আছে, আর আমি মনে করি যে কোন-কোন বিষয়ে ইংরাজি সাহিত্য য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তা সত্ত্বেও আমি ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করি, কারণ সে চর্চার প্রসাদে আমাদের ইংরাজি সভ্যতার মোহ কতকটা কেটে যাবে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাতেও তা হবে না, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য পুরা-কালের। হার্বার্ট স্পেন্সর-এর প্রভাব থেকে শঙ্কর আমাদের মুক্ত করতে পারবেন না,

কারণ শঙ্করকে আমরা নিজের অজ্ঞাতসারে দ্বিতীয় স্পেন্সর বানিয়ে নেব। যেমন আমরা আজকাল গীতা ও Bertrand Russell-এর প্রতি সমান ভক্তিমান। অপর পক্ষে স্পেন্সর-এর দাসত্ব হতে আমাদের মনকে মুক্ত করতে পারবেন Bergson. একটা ওষুধের সঙ্গে আর একটা ওষুধ আমরা মেশাই পরস্পরকে নির্বিষ রাখবার জন্য।

৫

বছর দশ-পনেরো আগে 'Pioneer' পত্র একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তোলে। Clive-এর পরিবর্তে Duplex যদি জয়লাভ করত, আর ভারতবর্ষ যদি ইংলন্ডের অধীন না হয়ে ফ্রান্সের অধীন হত, আর আমরা সকলে ইংরাজির পরিবর্তে ফরাসি ভাষা মুখস্থ করতুম, তা হলে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য কী রূপ ধারণ করত?

এক হিসাবে এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না, কারণ যা হয়নি তা হলে কী হত— এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিবর্থক। কারণ যা হয়নি তা হতে পারত না বলেই হয়নি, এই হচ্ছে ন্যায়ের কথা।

কিন্তু এই বিষয় নিয়ে দেদার কল্পনা খেলানো যায়। শূন্যে মন্দির গড়াও এক রকম আর্ট। এবং এ মন্দির নির্মাণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এ ক্ষেত্রে ভিত-পত্তনের বালাই নেই। ইংরেজি 'Pioneer' পত্রের সম্পাদক যখন বঙ্গসরস্বতীর এ হেন মন্দির গড়েছেন, তখন বাঙলা 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদকও ওর জুড়ি মন্দির নিশ্চয়ই গড়তে পারেন, কারণ আমার বিশ্বাস উভয় সম্পাদকেরই ফরাসি বিদ্যা সমান, শুধু বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি তাঁর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল। উক্ত বাজে প্রশ্নের একটা মন-গড়া উত্তর দেবার আমারও লোভ আছে। কিন্তু আজকে সে সব খেয়ালি কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। কারণ শূন্যে মন্দির গড়াও কতকটা পরিশ্রমসাপেক্ষ, কেননা সে মন্দিরের নেই শুধু ভিত, বাদবাকি অংশ ত সবই আছে। এবং তার জন্যও ত মাল-মশলা সব সংগ্রহ করতে হয়। সমস্ত ফরাসি সাহিত্য ঘেঁটে সে উপাদান সংগ্রহ করবার সময় আমার হাতে আজ নেই।

এ কথাটা উল্লেখ করলুম এই জন্য যে ফরাসি সাহিত্য যে আমাদের মনের উপর একাধিপত্য করবে তা আমি চাই নে। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনের উপর যে-পরিমাণ হয়েছে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব যদি সে পরিমাণ হত, তা হলে আমি হয় একটি Indo-German সমিতির মেম্বর হতুম, আর না হয়ত কোন Anglo-Indian Society-র। আমি চাই য়ুরোপীয় সাহিত্য আমাদের মনকে উসকে দেবে, চেপে নিবিয়ে দেবে না।

৬

আমি যে এ কালে ফরাসি সাহিত্যের চর্চার পক্ষপাতী, তার কারণ আমার বিশ্বাস সে চর্চায় আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নেই। আমাদের মন সে সাহিত্যের একান্ত বশীভূত কখনই হবে না,— কেননা আমরা ইংরাজি-শিক্ষিত মন নিয়ে তা পড়ব অর্থাৎ কতকটা শিক্ষিত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে সে সাহিত্যের চর্চা কবব। আমরা ফরাসি সাহিত্যের যতই ভক্ত হই নে কেন, এ কথায় কখনও সায় দিতে পারব না যে Racine. Shakespeare-এর চাইতে বড় কবি। তা ছাড়া যে-সকল লেখকের চরণে ফরাসিরা দিবারাত্র পুষ্পাঞ্জলি দান করছেন, যথা Stendhal প্রভৃতি, তাঁদের পাদোদক পান করতেও আমরা ইতস্তত করব। এবং তাঁদের গুণগ্রাহী হলে এই পর্যন্ত বলব যে ফরাসিদের কাছে এঁরা খুব বড় লেখক, কিন্তু সর্বমানবের কাছে নয়। আর কবি হিসেবে Baudelaire-এর Keats-এর সঙ্গে কোন তুলনা হতে পাবে, এ কথা শুনলে আমরা হেসে উঠব।

অপর পক্ষে গদ্য যে কাকে বলে তা আমরা Montaigne, Pascal, Voltaire ও Rousseau পড়লেই বুঝতে পারব। ইংরাজি গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে ফরাসি গদ্য-সাহিত্যেব প্রভেদ যে ধোঁয়াটে তেলের বাতির সঙ্গে বিজলি বাতিব প্রভেদ, তা উক্ত সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করলেই সকলের চোখে পড়বে।

আমাদের সাহিত্যের উপরে উক্ত সাহিত্যের কী সুপ্রভাব হতে পারে তা গত বৎসর এক রকম মোটামুটি ভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি। আর লেখক বাদ দিয়ে যদি পাঠকের কথাই ধরা যায়, তা হলেও বলি পাঠক মাত্রেই আবিষ্কার করবেন যে উক্ত সাহিত্যের চর্চা করা হচ্ছে বিচার-বুদ্ধিকে সানে চড়ানো। ফরাসি সাহিত্যের আলোয় আমরা অনেক বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী হব, এ আমি মহা লাভেব কথা মনে কবি। কারণ ইংরাজি সাহিত্যের শতগুণের মধ্যে একটি মহাদোষ এই যে তার একান্ত চর্চায় বুদ্ধি মোটা হয়, ফলে আমাদের মুখের ভাষাও ফুলে ওঠে। ফরাসি সাহিত্য আমাদের মনে অন্তত মাত্রাজ্ঞানের জন্ম দেবে। ও-সাহিত্যের প্রভাবে লজিকের মাত্রা অতিক্রম করা আমরা মহাপ্রাণতার লক্ষণ মনে করব না।

৭

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। ইংরাজের তুলনায় ফরাসিদের মন ঢের বেশি লজিকাল। মাথা-গরম লোক পৃথিবীর সর্বত্রই আছে আর সম্ভবত ইংলন্ডের চাইতে ফ্রান্সে ও-শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশি। তবে আমার বিশ্বাস ইংরাজের যত মাথা চড়ে যায় তত সে illogical হয়, অপর পক্ষে ফরাসির মাথা যত চড়ে যায় সে তত logical হয়, অর্থাৎ যে-অবস্থায় ইংরাজের মন দিশেহারা হয় ঠিক সেই অবস্থায় ফরাসির মন একদিকে সোজা ভাবে তেড়ে চলে, যদিচ সে

চলার ফলে শেষে গিয়ে খানায় পড়ে। কারও মন সরল রেখায় সমান পা ফেলে চলছে দেখলে কার না ভাল লাগে। বিশেষত যখন সে কোথায় যাচ্ছে তার খবর আমরা রাখি নে। লজিকের শেষে সত্য না থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে সৌন্দর্য আছে। ফরাসি মনের এই লজিকাল সরলতা ফরাসি সাহিত্যে দিব্যি ফুটে উঠেছে। ফরাসি সাহিত্যের এ গুণ যার চোখে পড়েছে সে আর মোটা বুদ্ধিকে হৃদয় বলে ভুল করবে না, এবং হৃদয়-চর্চা করছি ভেবে নিজের বুদ্ধিকে ভোঁতা করতেও চেষ্টা করবে না। ইংরাজি সাহিত্যের sentimentalism-এর প্রসাদে উক্ত রূপ ভ্রান্তির বশবর্তী হওয়া আমাদের মতো দুর্বল মনের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরাজ জাতি অবশ্য জীবনে sentimental নয়, শুধু মনে। ফরাসি সাহিত্যের লজিক ইংরাজি সাহিত্যের sentimentalism-এর এক রকম antidote. সুতরাং ইংরাজি সাহিত্যের আশৈশব চর্চা যখন আমাদের করতেই হবে তখন আমাদের আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য ফরাসি সাহিত্যও চর্চা করা আবশ্যক। জীবনে সম্ভবত ফরাসি জাত sentimental কিন্তু মনে তারা পুরো লজিকাল, এমনকী passion-এর লজিকেও তারা বিশ্বাস করে। মানুষের জীবন অতিশয় জটিল কিন্তু তার মন সরল হওয়া উচিত—এই হচ্ছে উক্ত মনের ধারণা।

এ দেশে লোকে গম্ভীর ভাবে কিছু বলতে উদ্যত হলেই 'সত্য শিব সুন্দরে'র দোহাই দেয়। এখন এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ফরাসি সাহিত্য মুখ্যত সত্যের পক্ষপাতী এবং ইংরাজি সাহিত্য শিবের। আর ফরাসিরা যাকে বলে সত্য, ইংরাজরা অনেক সময়ে তাকে বলে অশিব, আর ইংরাজরা যাকে বলে শিব ফরাসিরা অনেক সময়ে তাকে বলে অসত্য; আর সম্ভবত ফরাসিরা সত্যকেই সুন্দর মনে করে ও ইংরাজরা শিবকেই সুন্দর বলে।

এখন এই দুই-ই বিভিন্ন মনের সংস্পর্শে এসে আমরা হয়ত সত্য শিব সুন্দরের একটি তৃতীয় ধারণা করতে পারব, যার ফলে আমাদের কাছে আত্মার এই ত্রি-মূর্তির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আর এ ওর পেটে ঢুকে যাবে না। একাধিক ভাষা শিক্ষাও আমাদের মনের এক রকম রক্ষাকবজ।

৮

ইংরাজরা বহুকাল ধরে ফরাসি সাহিত্যের একটি দোষ দেখিয়ে আসছেন। তাঁদের মতে ফরাসি সাহিত্যের মুখে কিছু বাধে না। কোন বিষয়ে নীরবতা যদি বাণীর একটি গুণ হয়, তা হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ফরাসি সাহিত্য এ গুণে বঞ্চিত। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে ইংরাজরা ছাড়া য়ুরোপের অন্য কোন জাতি এ জন্য ফরাসি সাহিত্যের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করেননি, এমনকী জার্মানরাও নয়। যদি এই স্পষ্টভাষিতা ফরাসি সাহিত্যের দোষ হয়, তা হলে সে

দোষ ফরাসি সাহিত্যের প্রধান গুণেরই বিকার। আর আমাদের পক্ষেও ইংরাজদের মতো শুচিবাতিকগ্রস্ত হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই— কেননা সংস্কৃত সাহিত্যও মুখচোরা নয়, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যও তা নয়। 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। লোকের বিভিন্ন রুচির কারণ শুধু দেশের ভেদ নয়, কালের ভেদও। আজকের দিনের ইংরাজি সাহিত্যের রুচি যে ফরাসি সাহিত্যের রুচির চাইতে সুকুমার, তা ত মনে হয় না, বরং অনেক ইংরাজি নভেল বাঙালি পাঠকের মনে যে-রকম জুগুপ্সা ও লজ্জার উদ্রেক করে, সম্ভবত এ কালের ফরাসি সাহিত্য তাদৃশ করে না। একজন ফরাসি সাহিত্যিক হেসে বলেছেন যে, 'Freud আর কারও কোন উপকার না করুন, ইংলন্ডের নভেলিস্টদের মহা উপকার করেছেন। Freud-এর দোহাই দিয়ে এখন তারা খারাপ কথা বলে বাঁচছে, এত দিন যে সব কথা তাদের পেটের ভিতর গজগজ করছিল এখন সে সব তারা মন খুলে বলছে, নইলে বেচারারা মনের সব চাপা-কথার অম্লশূলে পেট ফুলে মারা যেত।' তবে আসল কথা এই যে, আমরা দেশের লোককে যা চর্চা করতে পরামর্শ দেই সে হচ্ছে ফরাসি সাহিত্য অর্থাৎ সে দেশের বড় লেখকদের কাব্য। এ সাহিত্য নোংরা নয়। অবশ্য সে দেশের একজন বড় লেখক আছেন— যাঁর লেখা নোংরামিতে ভরা। কিন্তু Rabelais-এর বই কেউ পড়বে না কেননা তাঁর ভাষা তাঁর দেশের লোকের পক্ষেই সুবোধ্য নয়, আর বিদেশিদের পক্ষে একেবারে অবোধ্য। দু'জাতের পাঠক আছেন, এক যাঁরা ষট্পদের মতো মধুমিচ্ছন্তি আর যাঁরা মক্ষিকার মতো ব্রণমিচ্ছন্তি। মক্ষিকার মতো যাঁরা ব্রণ-মিচ্ছন্তি তাঁরা তাঁদের লোভনীয় ব্রণ সব ভাষাতেই পাবেন। কিন্তু আমরা ষট্পদ জাতীয় পাঠকদের সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, চতুষ্পদ জাতীয়দের সঙ্গে নয়। ভাল কথা, মাছির ক'টা পা? চারটে নয়?

৯

আমি এ প্রবন্ধে সাহিত্য শব্দ কোন সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিনি। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য অর্থে কাব্যও বুঝতে হবে, দর্শনও বুঝতে হবে; আর বলা বাহুল্য যে প্রবন্ধও বুঝতে হবে, কেননা প্রবন্ধ হচ্ছে আধা-কাব্য আধা-দর্শন। যথার্থ essay যে উক্ত রূপ বর্ণ-সঙ্কর রচনা, তা Montaigne-এর essays-এর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন। গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুটি ফরাসি সাহিত্যিকের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। Renan ও Taine অবশ্য উভয়েই ইতিহাস লিখেছিলেন— কিন্তু তাঁদের রচিত সে ইতিহাস প্রবন্ধমালা মাত্র, আর St. Beuve-এর সমালোচনা অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঐশ্বর্যে ফরাসি ভাষা অতুলনীয় এবং উক্ত জাতীয় সাহিত্যই পাঠকের মনের উপর বিশেষ করে তার ফরাসি ছাপ রেখে যায়।

ফরাসি দেশের আদি দার্শনিক Descartes বলেছিলেন 'Cogito Ergo Sum' এবং তদবধি ফরাসি জাতি ধরে নিয়েছে যে মানুষের অস্তিত্ব তার চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যে চিন্তা করে না তার অহং বলে কোন পদার্থ নেই। অর্থাৎ তার Ergo Sum বলবার কোন অধিকার নেই। সম্ভবত এই বিশ্বাসবশতই সে দেশের সাহিত্যিকরা জাতীয় চিন্তার ধারা কখনও মরাগাঙে পরিণত হতে দেয়নি। আমারও বিশ্বাস, ফরাসি মন যে-মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হবে সেই মুহূর্তেই তা নাস্তির কোঠায় পড়ে যাবে। তাই ফরাসি সাহিত্যের স্পর্শে আমাদের মনের ঘুম ভাঙবে এবং তখন আমরা স্বপ্ন ও সত্যের প্রভেদ বুঝতে পারব। এ ভেদজ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার; কাজের জন্যও, কাব্যের জন্যও।

এই দেকার্তের শিষ্যরা তাঁদের আদিগুরুর আর একটি মতেও আস্থাবান। উক্ত দার্শনিকের মতে সেই আইডিয়াই সত্য যে-আইডিয়া পরিস্ফুট পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার। এই মতের বশবর্তী হয়ে ফরাসি সাহিত্যিকেরা যুগ-যুগ ধরে তাদের আইডিয়া সাকার ও স্বচ্ছ করতে চেষ্টা করে এসেছে। সস্তা ইংরাজি সাহিত্যের beer পান করে-করে আমাদের মন এ যুগে ঘুলিয়ে গিয়েছে; তা যে গিয়েছে তার প্রমাণ দেশের বক্তৃতায় আর লেখায় আমরা নিত্য পাই। ফলে যাঁর মন যত ঘোলা তাঁর আত্মাকে আমরা তত মহৎ মনে করি। সে যাই হোক, মনের এ ঘোলাটে চেহারাটা সুদৃশ্য নয়। সুতরাং ফরাসি সাহিত্যের wine-এর সাহায্যে আমাদের মনের বিলেতি ময়লা কাটে কি না তা-ও পরীক্ষা করে দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

১০

ইংরাজি অনুবাদের পর্দার ভিতর দিয়ে Guy de Maupassant, Anatole France প্রভৃতির সরস্বতীর আবছায়া মূর্তি অনেকে দেখেছেন এবং তাই দেখেই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু Anatole France-এর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ফরাসি সরস্বতী যে তাঁর সহমরণে গিয়েছেন তা মোটেই নয়। সে দেশে আজও অনেক ছোট-বড় লেখক আছেন যাঁরা এ সাহিত্যের নব কলেবর দান করছেন। এঁদের ভিতর অন্তত তিন জন সমগ্র য়ুরোপে সুপ্রসিদ্ধ— Gide, Proust ও Valery. এ সভায় বোধ হয় অনেকে উপস্থিত আছেন যাঁদের Valery-র সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। Proust-এর লেখার ইংরাজি অনুবাদ আছে, অপর দু'জনের তা নেই। এ সব লেখকের সঙ্গেও আমাদের পাঠকসমাজের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা দরকার, অন্তত এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করবার জন্য যে ফরাসি সরস্বতী চিরায়ুষ্মতী।

ফরাসি সাহিত্যের আর একটি গুণের কথা উল্লেখ করতে চাই। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যকেই ছোট বড় মাঝারি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখন ছোট ও বড় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি মাঝারি সাহিত্যের কথা ধরা যায় ত এ

কথা জোর করে বলা যায় যে অপর দেশের মাঝারি সাহিত্য সব, ফরাসি সাহিত্যের তুলনায় নগণ্য। ফরাসি জাতির বুদ্ধি এতটা পরিষ্কৃত ও রসজ্ঞান এতটা প্রবুদ্ধ যে সে দেশের লেখকদের অরসিকে রস নিবেদন করতে হয় না। ফলে সে দেশে সুলেখক মাত্রই সুরসিক। ফরাসি ভাষার esprit কথার প্রতিবাক্য বাঙলাতেও নেই, ইংরাজিতেও নেই। ও হচ্ছে এক রকম কথার জলুস, যাতে করে ফরাসি মাঝারি সাহিত্যকেও উজ্জ্বল করেছে। লজিকের গায়ে এ রঙ অপর কোন সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না। ও-সাহিত্য পড়ে মনে হয় ফরাসি জাতটা সেয়ানা হয়েছে। ফরাসি সাহিত্যকে এক হিসেবে সামাজিক সাহিত্য বলা যেতে পারে অর্থাৎ যে-সাহিত্যে সামাজিক লোক মাত্রেরই অধিকার আছে, সে সাহিত্য কেবলমাত্র দু'চার জন বড় গুণী ও পাকা সমজদারের একচেটে সাহিত্য নয়। ফলে এ সাহিত্য সকল সমাজের সুহৃদ ও শিক্ষক এবং এই কারণেই এর বাণী হচ্ছে সুহৃদ-সম্মত বাণী, প্রভু-সম্মত বাণী নয়। এই আটপৌরে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে, ফরাসি ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। এবং এই সাহিত্যের civilising প্রভাব সমগ্র য়ুরোপে স্বীকৃত।

১১

ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে আমার উক্তিসকল আশা করি আপনাদের কাছে অত্যুক্তি বলে গণ্য হবে না, কেননা আপনারা সকলেই উক্ত ভাষা এবং উক্ত সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তা ছাড়া বক্তা ও লেখক হিসেবে আমার দোষই এই যে, আমি কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে পারি নে। তারা সুরে আমি কখনই গলা সাধিনি।

বাঙলার পাঠকসমাজের সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের পরিচয় থাকা যদি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তা হলে সে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমাদের নিজের ঘাড়ে কতক পরিমাণে নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের সমিতি স্বদেশি সমাজে ফরাসি সাহিত্য প্রচারকার্যে অদ্যাবধি হাত দেননি। অদ্যাবধি আমাদের এ সমিতি এক রকম ফরাসি সরস্বতীর গুপ্ত সাধনার চক্র মাত্র হয়েই রয়েছে। ফরাসি ভাষা যাতে আমরা ভুলে না যাই সেই বিষয়েই আমরা সযত্ন হয়েছি, অপরকে তা শিক্ষা দিতে নয়। এই রূপ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ফরাসি ভাষা চর্চা করার আমি বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা কোন কিছু প্রচার করবার আগে তার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হওয়া কর্তব্য। এ সমিতির প্রসাদে আমার নিজেরও একটি মহালাভ হয়েছে। পূর্বে ও-ভাষার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র ছিল— Indo-Latin Society-র প্রসাদে এখন আমার এ বিষয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়েছে। ফরাসি ভাষা যে শুধু বইয়ে লেখা হয় না, মুখেও বলা হয়, আপনাদের দৌলতে

তার সাপ্তাহিক প্রমাণ আমি পেয়েছি। এটি আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কেননা যে-ভাষার সাক্ষাৎ আমরা শুধু পুস্তকে পাই, আমাদের কাছে সে এক রকম মৃত ভাষা।

আমার নিজের কথা ছেড়ে দিলেও— এই সমিতির কাছ থেকে দেশের লোকে ফরাসি সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করবার ন্যায্য দাবি করতে পারে। কারণ এ সমিতির সভ্যগণ নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং এঁদের মধ্যে অনেকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই জীবনের ব্রত করেছেন। সুতরাং এ সমিতি যে দেশে ফরাসি সাহিত্য প্রচারের ভার নেবেন, এ রূপ আশা দেশের অন্তত ছাত্রসমাজ করতে পারে।

১২

আমার বিশ্বাস আমরা এ কাজ করতে পারি শুধু বাঙলা ভাষার মারফৎ। ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু বলবার আছে সে সবই আর পাঁচ জনকে বাঙলায় শোনাতে হবে। দেশে ইংরাজি-শিক্ষিত লোক অসংখ্য আছে কিন্তু তাঁদের কাছে বাঙলা সাহিত্য বড় বেশি ঋণী নয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে বেশির ভাগ লোকেরই বাক্ রোধ হয়। ফলে যে-শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন তার ভাগ তাঁরা দেশের লোককে দিতে পারেন না। এক কালে এঁরা বলতেন যে এঁরা বাঙলা লিখতে পারেন না, কারণ যে-একমাত্র ভাষা তাঁরা লিখতে পারেন, তার নাম ইংরাজি। আর ভাল করে ইংরাজি শিখতে হলেও নাকি বাঙলা ভুলতে হয়। এ কথায় অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি নে, কারণ নিত্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাঁরা আমাদের নব সভ্য মনের দৈনিক খোরাক যোগান, তাঁরা যে-ভাষায় লেখেন তা ইংরাজিও নয়, বাঙলাও নয়— ও-দুয়ের অবৈধ মিলনের একটা অপূর্ব ফল মাত্র, আর সে খিচুড়ি যে আমরা দৈনিক গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করি সে শুধু তার অন্তরের প্রচুর পেঁয়াজ-লঙ্কার গুণে।

আপনারা যখন ফরাসি ভাষায় সুশিক্ষিত তখন অবশ্য ও-রকম অজুহাতে স-দর্পে স্বভাষা বর্জন করবেন না, কারণ ফরাসি সাহিত্য অপর কোন সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রশ্রয় দেয় না। তা ছাড়া আপনাদের অনেকের হাতেই যে বাঙলা কলম আছে তা-ও সর্বলোকবিদিত।

যদি মনে করেন ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তৃতায় কেউ কান দেবে না, তা হলে বলি পলিটিক্স সম্বন্ধে ফরাসি জাতির মতামত পাঁচ জনকে শোনানো যাক। এ যুগের পলিটিক্সের বীজমন্ত্রগুলি অর্থাৎ liberty, equality and fraternity প্রভৃতি শব্দের অর্থ যে ফরাসিরা বোঝে, তা কোন ইংরাজি শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও অস্বীকার করতে পারবেন না, কারণ ও-তিনটি মন্ত্র ফরাসিরাই বিশ্ব-মানবের কানে দিয়েছে। আর অপর যার কাছেই ও-তিনটি হ্রিং ক্রীং শ্রীং জাতীয়

অর্থহীন শব্দ হোক ফরাসিদের কাছে আজও তা নিরর্থক হয়ে যায়নি। ও-তিন কথার টীকাভাষ্যের সে দেশে আর অন্ত নেহ; ও-তিন সূত্রের পূর্বমীমাংসা পূর্বে হয়ে গিয়েছে। এখন শুরু হয়েছে তার উত্তর-মীমাংসা; আর সত্য কথা এই যে ঐ ত্রিমন্ত্রই ফরাসি সাহিত্যের প্রাণ। ঐ তিন বীজ থেকে যে পুষ্পপল্লব সমন্বিত মহা-বৃক্ষ জন্মলাভ করেছে তার ফল সর্বমানবের উপভোগ্য, কেননা অমৃতোপম।

প শ্চি মে র আ ত্ম র ক্ষা

গত ২৫ জানুয়ারির 'স্টেটসম্যান' কাগজে একটা কথা পড়ে অবাক হয়ে গেলুম। Reforms নিয়ে এ দেশে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে, তাতে নাকি জর্মানবা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দু'জন জর্মান দার্শনিক Oswald Spengler এবং Count Keyserling নাকি এর ফলে হিন্দু ধর্মের মায়া ও অহিংসার সঙ্গে Kant এবং তাঁর পরবর্তী জর্মান দার্শনিকদের মত এক করে এক নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গড়তে চাচ্ছেন।

জর্মান-দর্শনের সঙ্গে হিন্দু-দর্শন মেলানো যায় কি না, এবং এ একীকরণে মানুষের মনোজগতে একটি নূতন বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হবে কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু Spengler এবং Keyserling-এর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের হবু Reforms-এর কী যোগাযোগ আছে, বুঝা গেল না। কেননা, Spengler এবং Keyserling-এর দু'খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থই লেখা হয়েছিল গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের আগে, শুধু— ছাপা হয়েছে পরে।

'স্টেটসম্যানে'র লেখক মহাশয়ের সে সব বইয়ের সঙ্গে যদি চাক্ষুষ পরিচয় থাকত, তা হলে তিনি এ রকম আজগুবি কথা বলতেন না, আমাদের Reform-এর গণ্ডগোলের ফলে জর্মানিতে নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। গত যুদ্ধের পূর্বে Reform-এর বালাই ছিল না। কে না জানে যে, ঐ যুদ্ধের ধাক্কাতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলন্ডের angle of vision বদলে গেছে। এই দুই জর্মান দার্শনিকের নাম লেখক মহাশয় কার মুখে শুনেছেন, তা পরে বলব। জর্মানির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন ফ্রান্সের কথায় আসা যাক। লেখক বলেছেন যে, Miss Mayo-র বই য়ুরোপের মনকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সজাগ করে তুলেছে, তেমনই ঐ শ্রেণীর বই ফ্রান্সে বেরিয়েছে— যাতে ফ্রান্সের লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছে, সে বইয়ের ইংরাজি নাম Defence of the West এবং তার লেখক হচ্ছেন Massis. Miss Mayo-র বইয়ের সঙ্গে Massis-এর বইয়ের এইটুকু মিল আছে যে, উভয় লেখকেরই নামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে M, এ ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনই মিল তো আমরা চর্মচক্ষুতে দেখতে পাইনি। কারণ উক্ত গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় আছে, তার প্রমাণ গত আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আমি Massis-এর

মতামত সম্বন্ধে 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামক একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখি এবং তার পর আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী উক্ত বিষয়ে 'সবুজ পত্র'-এ একটি বিস্তৃত আলোচনা করেন। Defence of the West ইংরাজিতে অনূদিত হবার পূর্বেই তার মতামত আমরা বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে প্রচার করি। সুতরাং যাঁরা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন তাঁরা Massis-এর ভয়-ভরসার কথা আগেই শুনেছেন। এ বইয়ের আর যাই দোষ থাক, এ বই Miss Mayo-র মতো ইতর বই নয়। কারণ, এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে Metaphysics. বুদ্ধ ও শঙ্করের দর্শন ঠিক, না Aristotle ও St. Thomas-এর দর্শন ঠিক, এই নিয়েই Massis বিচার করেছেন। Massis হচ্ছেন মারমুখো রোমান ক্যাথলিক, সুতরাং তিনি অবশ্য St. Thomas-এর মতাবলম্বী। কিন্তু শঙ্কর ঠিক [না] St Thomas ঠিক, তাতে Miss Mayo-র কী যায় আসে!

Massis-এর গ্রন্থ নিয়ে পূর্বে যে-আলোচনা করেছি, তার পুনরাবৃত্তি করবার কোন আবশ্যকতা নেই। বিশেষত সে আলোচনার বিষয় যখন পরাবিদ্যা। প্রসিদ্ধ ইংরাজ নভেলিস্ট Chesterton শুনছি এ গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন— 'পশ্চিম এখন পূর্বের দেহের উপর প্রভুত্ব করছে, এর পরে পূর্ব পশ্চিমের আত্মার উপর প্রভুত্ব করবে।' আসলে Massis-এর ভয় ওতেই। Chesterton যে Massis-এর বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন, তার কারণ তিনিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক হিসাবে Massis-এর নিকট-কুটুম্ব।

Massis-এর বইয়ের নাম 'পশ্চিমের আত্মরক্ষা' আর এ আত্মরক্ষার মানে আত্মার রক্ষা। Massis-এর বই পড়ে ফরাসি দেশের সাহিত্যিকের দল ভয় পাননি— হেসে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন, 'মা ভৈঃ, য়ুরোপের আত্মাকে কেউ মারতে পারবে না, কারণ য়ুরোপের আত্মা আর এখন নেই, তা ইতঃপূর্বেই পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের চাপে মারা গিয়েছে।'

আসলে, Massis জর্মানি ও রুসিয়াকেই আক্রমণ করেছেন, শুধু এসিয়ার বেনামীতে। Spengler ও Keyserling-এর নাম Massis পাতায়-পাতায় উল্লেখ করেছেন। ব্যাপার হচ্ছে, Massis-এর আক্রমণ হচ্ছে Protestantism-এর উপর Catholicism-এর আক্রমণ। তিনি Reform-এর পক্ষে-বিপক্ষে এক কথাও বলেননি, কিন্তু তাঁর চোট Reformation-এর উপর। আর তাঁর মতে Kant থেকে Herbert Spencer তক সব নাস্তিকের দল Protestantism-এরই সন্তান। আর সেই সব মন-ঘোলানো মত, জর্মানরা নাকি এখন বুদ্ধ ও শঙ্করের নামে বেনামী করে চালাচ্ছে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। Statesman-এর সংবাদদাতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের উপরে Massis-এর অবজ্ঞা অবাধ। Massis তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে-

মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার নাম অবজ্ঞা নয়, আশঙ্কা। বলা বাহুল্য, মানুষ যাকে অবজ্ঞা করে, তাকে ভয় করে না। এ আশঙ্কার কারণ, ফ্রান্সের একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক Paul Valéry-র কথায় বিবৃত করছি। Valéry বলেছেন যে, 'ঝড় থেমে গিয়েছে, কিন্তু য়ুরোপেব মন নিশ্চিন্ত হয়নি। সে মন কখন আবার ঝড় আসে, এই ভয়ে থেকে-থেকেই চমকে উঠে।' এ বার ঝড় নাকি পৃথিবীর ঈশান কোণ থেকে আসবে। Ossendowski নামক জনৈক পোলিস বৈজ্ঞানিক য়ুরোপকে এসিয়া নামক জুজুর ভয় দেখিয়েছেন। Ossendowski-কে তাঁর পলিটিক্যাল মতামতের জন্য রুসিয়ার Czar জেলে পোরেন। Czar-এর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তিনি Kol প্রতিষ্ঠিত রুস গভর্নমেন্টের জনৈক মন্ত্রী হন। তারপর এল Lenin-এর শাসন। রুসিয়ার এ নূতন শাসক তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তিনি 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতির অনুসরণ করেন। পদব্রজে রুসিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া যান, সেখান থেকে চীনদেশে এবং চীন থেকে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় যান। তাঁর এই অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি 'Beasts, Men and Gods' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কথা এতই অদ্ভুত যে, রূপকথা তাঁর কথার তুলনায় সত্য কথা বলে মনে হয়। এই বই-এ তিনি য়ুরোপকে এসিয়ার ভয় দেখিয়েছেন যে, চীন-তাতার এ বার য়ুরোপের ঘাড়ে চড়ে বসবে, যেমন পুরাকালে জেঙ্গিস খাঁর দলবল আর এক বার করেছিল এবং য়ুরোপের অনেক শিক্ষিত লোক তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে Ossendowski যখন ফ্রান্সে উপস্থিত হন, তখন বহু সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এক দিন Frederic Lefevre নামক ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ লেখক আর চার জন সাহিত্যিককে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সে দিন এঁদের ভিতর যে কথাবার্তা হয়, তা Lefevre নিয়ে ছাপিয়েছেন। তার কতক অংশ নীচে অনুবাদ করে দিচ্ছি, তা থেকেই দেখতে পাবেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য ফরাসি সাহিত্যিকের মন বহুকাল থেকে উত্তেজিত করছে। Frederic Lefevre বর্তমান ফরাসি সাহিতিকদের মধ্যে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে একজন অগ্রগণ্য লেখক, তিনি অবশ্য কোন রূপ জুজুর ভয় করেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর সহচরদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ এঁদের কথোপকথনের মর্ম ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন Rene Guenon. ইনি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড বই লিখেছেন— যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম, বাদবাকি সব অজ্ঞানের ধর্ম। Lefevre-এর অন্যতম সঙ্গী হয়েছিলেন Rene Grousset. ইনি 'এসিয়ার ইতিহাস' নামক একখানি বিপুল এবং অতি চমৎকার ইতিহাস লিখেছেন। আর ছিলেন Jacques Maritain. এই শেষোক্ত লেখক হচ্ছেন Massis-এর জুড়িদার। উভয়েই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর যত প্রকার অ-ক্যাথলিক দার্শনিক মতবাদ আছে, তার

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। এক কথায় এঁরা য়ুরোপের নানা জাতীয় দার্শনিকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই নব-ক্যাথলিক সাহিত্যিকদের নিকটই একটি হেঁয়ালি। এঁরা রবীন্দ্র-মতকে ডরান, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রভাব যে য়ুরোপের মনকে পেয়ে বসছে, সে কথা এঁরা অস্বীকার কবেন না। এখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এঁদের কথোপকথন শুনলেই সকলে বুঝতে পারবেন যে, Defence of the West-এর লেখক তাঁর স্বজাতিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। Miss Mayo-ব 'Mother India'-র মতো গ্রন্থকে এঁরা সকলেই একবাক্যে যে অস্পৃশ্য বলবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন এঁদের কথোপকথন হতে আন্দাজ-অনুবাদ নিম্নে বিবৃত করছি।

Lefevre— আপনার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আছে? তিনি কি য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেননি?

তাঁর বাণীর ফরাসি ভাষায় 'Nationalism' নামক যে-অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখতে পাই যে, তিনি বলেছেন যে 'পূর্বের জন্য পশ্চিমের সভ্যতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিম সত্যের এক অংশের সাক্ষাৎ পেয়েছে, পূর্ব আর এক অংশের। সেই কারণেই যদিচ পশ্চিমেব সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে ঝড়ের মতো এসে পড়েছে, তবুও তা[তে] আমাদের দেশে এমন দু'চারটি জীবনের বীজ ছড়িয়ে যাবে যার আর মৃত্যু নেই এবং যখন আমরা ভারতবাসীরা য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে-অংশ চিরন্তন সে অংশ আত্মসাৎ করতে সমর্থ হব, তখনই পূর্ব-পশ্চিমের সভ্যতার সমন্বয় হবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন পৃথিবীর সর্বপ্রকার জ্ঞানে পরিপুষ্ট। তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আমি পূর্ব-পশ্চিমের সত্যকার মিলনে আস্থাবান। মানবজাতির পক্ষে যা যথার্থ গৌরবের সামগ্রী, তাতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। পৃথিবীর কোন জাতিই অপর সকল জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে নিজেব চরম উন্নতি-সাধন করতে পারে না।' এই জন্যই তিনি গান্ধীর চেলাদের ভয় করেন— যদিচ স্বয়ং গান্ধীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ আছে।

Ossendowski— লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঠাকুর এসিয়ার লোক। তাঁর কালো চোখের ভিতর দিয়ে তাঁর মনের কথা পড়া যায় না। আমি যখনই তাঁর চোখের দিকে তাকাই, তখনই মনে হয় তাঁর চোখের পর্দা তুলে ফেলা আবশ্যক।

Rene Guenon— রবীন্দ্রনাথ এসিয়ার লোক হলেও মনে য়ুরোপীয় হয়ে গিয়েছেন।

Ossendowski— ভুলেও তা মনে কোরো না।

Maritain— নিজের বল দিয়ে অপরের বল পরাভূত করাই যথেষ্ট নয়, আত্মা দিয়ে আত্মাকে পরাভূত করতে হবে।

Rene Guenon— তুমি বিগ্রহের কথা কেন বলছ? উঃ, এসিয়ার সঙ্গে যুরোপের আত্মার সন্ধি করতে হবে।

Maritain— সত্যের সঙ্গে অসত্যের কখনও সন্ধি হয় না।

Guenon— আমারই তাই মত। যে সত্যের সন্ধান Aristotle পেয়েছিলেন এবং যার উপর রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, এসিয়াও আজ সেই সত্য আমাদের কাছে ধরে দিচ্ছে। এ সত্যের ধারণা এসিয়াতে কখনও লুপ্ত হয়নি।

Maritain— আমার তা বিশ্বাস নয়। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রস্থান, হিন্দু ধর্মের প্রস্থান— সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর ক্যাথলিক মন নিয়েই য়ুরোপ বাঁচতে পারে— হিন্দু মন নিয়ে নয়।

Lefevre— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বইয়ের য়ুরোপের নানা ভাষায় অনুবাদ কেউ বন্ধ করতে পারবে না এবং পৃথিবীময় শিক্ষিত সম্প্রদায় তা পড়বে— ফলে পূর্বের আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের মনে অনুপ্রবিষ্ট হতে বাধ্য।

Rene Grousset— তুমি যা বলছ তা ঠিক, আর ইংরাজ জাতি ইতঃপূর্বেই তা বুঝেছে।

উপরিউক্ত কথোপকথন শুনে সকলেই বুঝতে পারছেন যে, ফ্রান্সের সাহিত্য সমাজ এখন Simon কমিশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যা নিয়ে তারা মাথা বকাচ্ছে, তা পলিটিক্সের বহির্ভূত বিষয়। যে-চারটি ফরাসি সাহিত্যিকের জল্পনা-কল্পনা শোনা গেল, তাঁরা একজনও পলিটিসিয়ান নন এবং তাঁরা প্রায় সকলেই পলিটিক্সের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। এর কারণ— এঁরা সকলেই গত যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঘরে ফিরেছেন। এ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মতে পলিটি-সিয়ানরাই এই সর্বনেশে যুদ্ধের জন্য দায়ী। এঁরা নিজেও পলিটিসিয়ান নন এবং পলিটিসিয়ানদেরও কোন রূপ খাতির করেন না। বরং ফ্রান্সের পলিটিসিয়ানরাই এঁদের ভয়ে ভীত, কারণ এঁদের প্রত্যেকেই এক-একজন যোদ্ধা। এঁরা তরবারি-হস্তে যুদ্ধ করতেও যেমন পটু, লেখনী-হস্তে যুদ্ধ করতেও তাদৃশ পটু এবং উৎসুক। যুদ্ধ কী ব্যাপার, সে বিষয়ে এঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিমের ভাবী যুদ্ধের কথা শুনে এঁদের মন নৃত্য করে ওঠে না।

এঁদের ভাবনা মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে। উপরে যে-চার জনের কথা শোনা গেল, তাঁদের মধ্যে তিন জনের বিশ্বাস, পূর্ব-পশ্চিমের সভ্যতার পরস্পর আদানপ্রদানের উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি নির্ভর করছে। আর 'পশ্চিমের আত্মরক্ষা' নামক গ্রন্থের লেখকের সমধর্মী সাহিত্যিকদের মতে য়ুরোপ তার স্বধর্ম রক্ষা করেই আত্মরক্ষা করতে পারবে। ভারতবর্ষের ধর্ম তাঁর কাছে ভয়াবহ, কেননা

তা য়ুরোপের পক্ষে পরধর্ম। রবীন্দ্রনাথকে এ শ্রেণীর লোক ভয়াবহ মনে করেন, কেননা তিনি য়ুরোপে পরধর্ম প্রচার করছেন। উপরন্তু তাঁদের মনে এ সন্দেহের উদয় হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্বের আত্মার সঙ্গে পশ্চিমের আত্মার মিলন চাইতে পারেন কি তার পূর্বে তিনি চান— এসিয়ার দেহের সঙ্গে য়ুরোপের দেহের বিচ্ছেদ। এই হচ্ছে Massis-এর রবীন্দ্র-ভীতির মূল কারণ।

সাহিত্য ও পলিটিক্স

১

ইংরাজিতে যাকে public এবং private বলে তাদের বাঙলা নাম আমি জানি নে। প্রকাশ্য ও গোপন যে ও-দুটি শব্দের তরজমা নয়, যাঁর ইংরাজি ও বাঙলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন। সদর ও মফঃস্বল শব্দ-দুটি বোধ হয় ও-দুটি ইংবাজি শব্দের স্থানাভিষিক্ত হতে পারে।

২

মানুষ মাত্রেরই সদর মতামত ও মফঃস্বল মনোভাব এক নয়। আমাদের পাঁচ জনের সদর মতামতের ভিতর অনেকটা মিল আছে। কিন্তু ব্যক্তি মাত্রেরই মফঃস্বল মনোভাব বিভিন্ন। আর সে সব ব্যক্তিগত মনোভাবকে ঠিকা দিয়ে সদর মতামত পাওয়া যায় না। একশ জন লোকের একশ রকম ব্যক্তিগত মনোভাব বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই আমরা বলি সাধারণ মত, অর্থাৎ সেই মত— যা বিশেষ কারও নয়।

৩

এ ক্ষেত্রে আর এক গোল আছে। আমাদের প্রত্যেকের মনোভাব স্বতন্ত্র কিন্তু আমরা সকলেই একই ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য। ধরুন আমি যদি কবি হই ত আমি 'প্রেম' শব্দ বার বার ব্যবহার করতে বাধ্য। কারণ 'প্রেম' বাদ দিয়ে কবিতা হয় না। অপর পক্ষে আমি যদি পলিটিসিয়ান হই ত আমি উঠতে-বসতে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য, কারণ যে-মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নেই সে মনে পলিটিক্স নেই। অথচ এই দুই শব্দ আমরা হাজারো বিভিন্ন অর্থে বুঝি। মানুষ মাত্রেরই মনে প্রেম তার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে মূর্তি ধারণ করে। আর স্বাধীনতা শব্দও মানুষে নিজের মনে নিজের ভাবে কল্পনা করে। আমরা যে যে-ভাবে তা বুঝিনে কেন, আমরা সকলেই ঐ একই শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য। ফলে, liberty এবং love-এর মূল্য নেহাৎ বাজারে, অপর কোন কথাও

এ যুগের কোন ভাষাতেই নেই। অথচ ওর চাইতে বড় কথাও কোন ভাষাতেই নেই।

৪

মোটা হিসেবে দেখতে গেলে, মানুষের মন যে এক, তার প্রমাণ বিশ্বসাহিত্যে পাওয়া যায়, আর এক জাতের সঙ্গে আর জাতের ভাষা আলাদা বলে জাতিতে জাতিতে যে গণ্ডগোল হয় তার প্রমাণ বিশ্ব-পলিটিক্সে পাওয়া যায়। যদি বলা যায় যে জাতিতে জাতিতে ঝগড়াটা আসলে ভাষার সঙ্গে ভাষার ঝগড়া তা হলে আমার বিশ্বাস নেহাৎ আজগুবি কথা বলা হয় না।

৫

কিন্তু সূক্ষ্ম হিসেবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, যে-সব লোকের ভাষা এক এবং মন আলাদা, তারাও পরস্পরের কাছে অপরিচিত। এই জড় জগতের মতো আমাদের মনোজগতেও একটা centripetal শক্তি আছে যা আমাদের পাঁচ জনকে নিয়ে তাল পাকায়। অপর পক্ষে সেই সঙ্গে centrifugal শক্তিও আছে, যা প্রত্যেককে আর পাঁচ জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। যে-শক্তির ঠেলায় পাঁচ জন একমত হয় সেই শক্তিই সদর মতামতের স্রষ্টা। আর যে-শক্তির টানে প্রত্যেকে আলাদা হয় সেই শক্তিই মফঃস্বল মনোভাবের স্রষ্টা। এই দুই শক্তির বিরোধ ও সমন্বয়ের ফলেই যখন মানব-মন গড়ে উঠেছে তখন প্রতি জাতির প্রতি মানবের মনে এই দুই জিনিসের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

৬

বাঙালি জাতির যে কতকগুলো সদর মতামত আছে, তা যে-কোন দিনের যে-কোন সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায়। অপর পক্ষে প্রতি বাঙালির যে মফঃস্বল মতামত আছে তার পরিচয় পাঁচ জনের সঙ্গে কথাবার্তা কইলেই পাওয়া যায়। অবশ্য সে সকল বাঙালির সঙ্গে নয়, যাঁরা সদর মতকে প্রচার করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁরা অবশ্য সদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত তাঁদের মতের পিছনে নিজস্ব মন বলে কোন জিনিস নেই।

৭

সম্প্রতি বাঙালির এই মফঃস্বল মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি। পাঁচ-ছ'দিন আগে একটি ভদ্রলোক আমার কাছে দুঃখ করে বললেন যে, পলিটিক্সে বাঙলার দিন-দিন অবনতি হচ্ছে। কথাটা শুনে আমি কান খাড়া করলুম। কেননা উক্ত ভদ্র-

লোকের মুখে এ কথা যে শুনব, তা কখনও ভাবিনি। কারণ তাঁর কোন পলিটিকাল দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি শিক্ষিত অর্থাৎ M.A. পাশ, অতএব দৈনিক খবরেব কাগজ নিত্য পড়েন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-অবনতির বিষয়ে উদাসীন নন। এর বেশি পলিটিক্সের সঙ্গে তার আর কোন দরকার নেই।

৮

এর পরেই অপর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি মহা আনন্দ সহকারে আমাকে বললেন যে, বাঙলা সাহিত্যের দিন-দিন খুব উন্নতি হচ্ছে। এ কথা শুনেও আমি কান খাড়া করলুম। কেননা উক্ত ভদ্রলোকের মুখে এ কথা শুনব বলে মনে ভাবিনি। ভদ্রলোক শিক্ষিত অর্থাৎ M.Sc. পাশ এবং প্রতি মাসে মাসিক পত্র নিয়মিত পড়েন, এবং স্বদেশ এবং স্বজাতির উন্নতি-অবনতির বিষয়ে উদাসীন নন। এর বেশি বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অপর কোন দরকার নেই।

৯

আমি অবশ্য একজনের কথা শুনে দমে যাইনি, এবং অপরের কথা শুনে উৎফুল্ল হইনি। কারণ উন্নতি-অবনতির যে কোন রূপ দৈনিক হিসাব কেউ করতে পারে এমন কথায় আমি বিশ্বাস করি নে। ও-দুই যদি আসে, ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। আর কাকে উন্নতি আর কাকে অবনতি বলে সে বিষয়েও লোকের মতভেদ আছে। তবে কথা-দুটো আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়নি, কারণ এই ধরনের কথা কিছুকাল ধরে বহু বাঙালির মুখে শুনেছি। ও থেকে এই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে বাঙলার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়েব অন্তরে পলিটিক্সের প্রতি ঈষৎ বিতৃষ্ণা ও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা জন্মলাভ করেছে। এ মনোভাবের অন্তরে কোন স্পষ্ট thought নেই, আছে শুধু একটা অস্পষ্ট feeling, কারণ কীসে অবনতি হচ্ছে আর কীসে সাহিত্যের উন্নতি হয় সে বিষয়ে তাঁরা কোন রূপ যুক্তি দেখাতে পারবেন না।

১০

আমার মনে হয় এই আশা-নৈরাশ্যের ভিতরকার কারণ এই যে, বর্তমান বাঙলার পলিটিক্সের সঙ্গে বাঙলার সাহিত্যের অনেকটা ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ দৈনিক পত্রের সঙ্গে মাসিক পত্রের তুলনা করলেই পাওয়া যায়। বাঙলার বর্তমান পলিটিকাল লেখা ও বক্তৃতার ভিতর এমন কিছু নেই যা সাহিত্যিক মনের খোরাক যোগাতে পারে, অপর পক্ষে বর্তমান বাঙলা গল্প-কবিতার মধ্যেও এমন কিছুই থাকে না, যা পলিটিকাল মনের খোরাক।

১১

সাহিত্যের সঙ্গে পলিটিক্সের সম্বন্ধ কী, পলিটিক্সের প্রভাব সাহিত্যের উপর কতটা, সে সব ঐতিহাসিক আলোচনা আজ তুলতে চাই নে কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে একটি অপরটির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যথার্থ প্রাণবন্ত সাহিত্য কখনও বা হয় সমসাময়িক পলিটিক্সের সহায়, কখনও বা যায় তার বিরুদ্ধে, কিন্তু একেবারে উদাসীন হওয়া তার ধর্ম নয়।

১২

দেশের কর্মকাণ্ডের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য উন্নতি করতে পারবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমরা শুধু সাহিত্যিক নই— উপরন্তু আমরা মানুষ অর্থাৎ মনোজগৎ ও কর্মজগৎ একসঙ্গে উভয় জগতের সঙ্গেই আমাদের মনের কারবার আছে। এবং এই উভয় জগৎ থেকেই তা মনের খোরাক যোগাড় করে। সেই যুগে সাহিত্যে আর পলিটিক্সে বিচ্ছেদ, যে-যুগে মানুষের জ্ঞানে আর কর্মে বিচ্ছেদ ঘটে। আমাদের যুগ সে যুগ কি না জানি নে। তবে বহু বাঙালি যে আমাদের সাহিত্যের উন্নতিতে আস্থাবান, তার কারণ হয়ত এই সাহিত্যের স্বরাজ্য লাভ করবার জন্য আমাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না, অপর পক্ষে পলিটিকাল স্বরাজ্য লাভের জন্য আমাদের পক্ষে পরমুখাপেক্ষী হওয়া অনিবার্য। বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নিখিল ভারতের অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, বাঙলাতেও কোন দল বাঁধবার দরকার নেই। কোন দেশেই সাহিত্য অসাহিত্যিকের হুকুম মানে না। সাহিত্যিক মন মুক্ত বলেই তার স্বরাজ্যে আমরা বিশ্বাস করি।

সা হি ত্যে সৌ জ ন্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ আমাদের ছাত্রাবস্থায় Matthew Arnold-এর খুব রেওয়াজ ছিল। Matthew Arnold অবশ্য একাধারে কবি ও ক্রিটিক। কবি Arnold-এর সঙ্গে আমাদের কারও বিশেষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু ক্রিটিক Arnold আমাদের মনের উপর সেকালে বিশেষ প্রভুত্ব করতেন। যে-সব critic-এর বই আমরা কলেজে পড়তে বাধ্য হতুম, Essays in Criticism-এর সঙ্গে তাদের যে কোন তুলনা হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রথমত, Arnold-এর গদ্য আমাদেব মুগ্ধ করত। ইংরাজি গদ্য যে ও-রকম হালকা ও তীক্ষ্ণ হতে পারে, সে ধারণা আমাদের ছিল না, কারণ সেকালে Carlyle এবং Ruskin-ই সর্বপ্রধান গদ্যলেখক বলে গণ্য ছিলেন। দ্বিতীয়ত, Arnold যে অপরের criticism করেছেন শুধু তাই না— criticism জিনিসটে কী এবং যথার্থ criticism-এর ধর্ম কী হওয়া উচিত— তা-ও তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Arnold-এর মতে ফরাসি গদ্য হচ্ছে আদর্শ গদ্য, এবং কোন্ গুণে উক্ত গদ্য তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, সে সব গুণের প্রতি তিনি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা যারা ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের মারফৎ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছি, ইউরোপে যে আর একটি জাতেরও সভ্যতা আছে— আর সে সভ্যতার প্রতি যে আমাদের মনের সহজ আনুকূল্য আছে— এ সত্য আবিষ্কার করে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। সেকালেও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, এবং আমি সেই গদ্য-সাহিত্যের ভক্ত হয়ে উঠেছিলুম। সুতরাং এ বিষয়ে Arnold-এর মত প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করবার পক্ষে আমার অন্তরে কোন বাধা ছিল না।

Arnold ফরাসি গদ্যের একটি বিশেষ গুণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে গুণের ইংরাজি নাম urbanity. উক্ত শব্দের ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ কী তা ভেবে পাচ্ছি নে। সংস্কৃত 'নাগরিকতা' অবশ্য ওর কথায়-কথায় অনুবাদ। কিন্তু urbanity অর্থে 'নাগরিকতা' বলবার বাধা এই যে urbanity শব্দ প্রশংসাবাচক, 'নাগরিকতা' তা নয়। আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে 'সৌজন্য' কথাটা ব্যবহার করা চলে।

সৌজন্য যে শুধু একটা সামাজিক গুণ নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা মহা গুণ— Arnold ফরাসি গদ্যের গুণ-কীর্তন করে তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ফরাসি জাতির মনের সহজ প্রবণতা হচ্ছে, 'towards the things of the mind, towards culture, towards clearness, correctness and propriety of thinking;' এবং ফরাসি সাহিত্য— 'sets standards in a number of directions, and creates, in all these directions a force of educated opinion, checking and rebuking those who fall below these standards, or who set them at nought.'

এবং এই কারণেই ফরাসি সাহিত্যে urbanity গুণের সদ্ভাব সর্বত্র পাওয়া যায়। Correctness and propriety of thinking and speaking ফরাসি সমাজের এত প্রিয় বলে, লেখকেরাও গোঁয়ার হবার সুযোগ পান না; কারণ ভাষা ও ভাবের সকল প্রকার গোঁয়ার্তুমি সে দেশের পাঠক সমাজের পক্ষে অসহ্য।

অপর পক্ষে ইংরাজি সাহিত্যের অনেক অসামান্য গুণ আছে, কিন্তু urbanity গুণে তা বঞ্চিত, ও-সাহিত্যের সুর provincial, অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বলে গ্রাম্য, আর বাঙলায় পাড়াগেঁয়ে। এখন এই পাড়াগেঁয়ে মনোভাব কাকে বলে, তা Arnold-এর মুখেই শোনা যাক— 'The provincial spirit again exaggerates the value of its ideas for want of a high standard at hand, by which to try them. Or rather, for such a standard, it gives one idea too much prominence at the expense of others, it orders its ideas amiss, it is hurried away by fancies, it likes and dislikes too passionately, too exclusively. Its admiration weeps historical tears and its disapprobation foams at the mouth. So we get the eruptive and aggressive manners in literature.'

কি লোকসমাজে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, অপরের মত নিজের অনুমত হলেই যে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে হবে, আর তা না হলেই যে রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে হবে, সভ্য সমাজের এ নিয়ম নয়।

বিরুদ্ধ মতকে বিনাশ করবার আর এক উপায় আছে, ইংরাজিতে যাকে বলে banter, আর বাঙলায় ঠাট্টা। কিন্তু ভদ্র সাহিত্যিক never disjoins banter itself from politeness, from felicity, কারণ সাহিত্যে একজনকে বিদ্রূপ করে, আর পাঁচ জনের মন পাওয়া চাই।

আমরা ইংরাজের শিষ্য এবং ইংরাজি সাহিত্যই আমাদের আদর্শ। ফলে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে হয় eruptive, নয় aggressive হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? Arnold দুঃখ করে বলেছিলেন— 'How prevalent all round us, is the want of balance of mind and urbanity of style.'

আমাদের চলতি সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙলাদেশে নিত্য যা লেখা হয়, তার ভিতর ভাষা ও ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা অসংযমই সব চেয়ে নজরে পড়ে। আমরা যে-বিষয়েই লিখি না কেন, সব লেখাই 'যুদ্ধং দেহি' বলে আরম্ভ করি। পলিটিক্সে হয়ত 'মার মার, হান হান' এই তান্ত্রিক মন্ত্রের কোন সার্থকতা থাকতে পারে— কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তার কোনই সার্থকতা নেই, কারণ এ ক্ষেত্রে সুরুচির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেকালের আলঙ্কারিক-দের মতে সাহিত্যের বাণী হচ্ছে সুহৃৎ-সম্মিত বাণী— এ ক্ষেত্রে সকলেই যদি একমাত্র প্রভু-সম্মিত বাণীর চর্চা করেন, তা হলে একটি নিতান্ত দুঃখের কারণ হয়। এমনকী সঙ্গীত নিয়েও আমরা এতাদৃশ হট্টগোলের সৃষ্টি করতে পারি যে, সে আলোচনার ভিতর বীণা-বেণুর ধ্বনি শোনা যায় না— শোনা যায় শুধু ঢাকের আওয়াজ, আর ঢাকের বাদ্যি যে থামলেই মিষ্টি লাগে তা কে না জানে?

আমি urbanity of style-এর পক্ষপাতী— তার কারণ এ নয় যে তা ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম; কিন্তু তার প্রধান কারণ এই যে, তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেরও ধর্ম। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য পড়ে দেখবেন— তর্কের পদ্ধতি এবং ভাষাও কত দূর urban হতে পারে।

মাতৃভাষায় স্বরাজ্য

আমাকে যখনই কোন সম্পাদক বা সম্পাদিকা তাঁর পত্রের জন্য লিখতে অনুরোধ করেন, তখনই সে অনুরোধ পারতপক্ষে রক্ষা করি। সব সময়ে পেরে উঠি নে, তার কারণ শরীর সব সময়ে সক্রিয় থাকে না। এ অবশ্য আমার দুর্ভাগ্য, দোষ নয়। সে যাই হোক— এখন লেখার প্রবৃত্তি আমার কমে এসেছে, বিশেষত সেদিন এক বন্ধুর মুখে একটি কথা শুনে।

সকলেই জানেন যে, গত পয়লা এপ্রিল আমাদের মাতৃভূমির স্বরাজ্য লাভ হয়েছে। কিন্তু বদলটা যে কী হল, সে বিষয়ে বিষম মতভেদ আছে।

এক দল বলছেন যে, যা হয়েছে তারই নাম স্বরাজ্য; অপর পক্ষে বেশির ভাগ লোক বলছেন যে, আমরা যে-তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেলুম।

যে-বিষয়ে মতভেদ আছে, সেই বিষয়েই নিজের মত প্রকাশ করতে লোভ হয়। আমরা যারা লেখক বলে পরিচিত, আমরা সকলেই মনে আশা করি যে, আমাদের লেখা লোকে পড়বে; আর তার ফলে আমাদের লেখার সুফল অথবা কুফল পাঠকের মনে ফলবে। আমাদের কথা যে লোকের এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, এ কথা শুনলে আমরা কেউ খুসি হই নে। একে যদি দুর্বলতা বলেন, তা হলে সে দুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে, অন্তত থাকা উচিত।

আমার জনৈক পলিটিক্যাল বন্ধুর মুখে সেদিন শুনলুম যে বাঙলা লেখা নাকি public opinion (public opinion-এর বাঙলা লোকমত) গড়ে না— যা গড়ে ইংরাজি লেখা। কথাটা মিথ্যা নয়। Public অর্থে যদি সেই দলকে বোঝায় যাঁরা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়তে পারেন, তা হলে তাঁদের কাছে সেই সব মতামতেরই মূল্য আছে, যা ইংরাজিতে প্রকাশ করা হয়। যদিও সে ইংরাজি আমরা যে-দরের বাঙলা লিখি, তার চাইতে ঢের খেলো। বন্ধুবরের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল যে, আমাদের বাঙলা লেখার কোন মূল্য নেই। আমরা যে মনে করি, 'কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া' আছে, সেটিই আমাদের ভ্রান্তি।

বাঙলা বই যে সমাজের কাছে নগণ্য— তা ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু

বাঙলা খবরের কাগজও যে তাই— সে জ্ঞান আমার ছিল না। আমরা এ যুগে সকলেই democrat হয়ে উঠেছি। Democracy-র অর্থ সেই দলের মতামত, যারা দলে পুরু। অর্থাৎ মাথা-গুনতিতে যারা majority, রাজ্য তাদেরই। এ অবস্থায় democracy-র কাছেও যে বাঙলা ভাষার কোন কদর নেই,— এ কথা শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলুম।

এখন বুঝতে পারছি যে, মাতৃভূমির স্বরাজ্য লাভ করার চাইতে মাতৃভাষার স্বরাজ্য লাভ করা আরও কঠিন। আমাদের মাতৃভাষা যে স্বরাজ্য লাভ করেনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লেখা মাত্রকেই সাহিত্য বলি এবং লেখক মাত্রকেই সাহিত্যিক। শুধু তাই নয়, বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা নিয়ে আমরা বাঙালিরা গর্ব্ব করি। আমাদের মধ্যে অবশ্য বড় বড় সাহিত্যিক জন্মেছেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে জগৎপূজ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বলে তুমি আমি গর্ব করি কীসের জন্য? বিশেষত আমরা যখন ছোট কবিও নই?

কালকে একটি সাপ্তাহিক পত্রে পড়লুম যে আমরা যা লিখি দেশে তা চলে না। প্রথমত, ধরুন ছোট গল্প। ছোট গল্প না প্রকাশিত হলে নাকি মাসিক পত্র চলে না,— অথচ ছোট গল্পের বই বাজারে কাটে না। তারপর উপন্যাস। উপন্যাসের বইয়ের নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে বাজারে চাহিদা ছিল, অন্তত মেয়ে-মহলে। এখন নাকি সে চাহিদা নেই। এর কারণ সম্পাদক মহাশয় বলেন উপন্যাস সকল 'রাবিশ'। যদি তাই হয় ত মানতে হবে যে বাঙালি পাঠকের রুচির উন্নতি হয়েছে। কেননা তাঁরা rubbish কিনতে শিখেছেন।

আজকাল নাকি শুধু শিশু-সাহিত্যেরই চাহিদা আছে। আমি শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নই। সুতরাং সে সাহিত্য 'রাবিশ' পদবাচ্য কি না বলতে পারি না। তা ছাড়া এমন কথা কারও মুখে শুনিনি যে, বাঙলা ভাষায় নব Don Quixote অথবা Robinson Crusoe বা Gulliver's Travels-এর আবির্ভাব হয়েছে।

এখন দেখা গেল যে, বাঙলা লেখার পলিটিক্সে কোন মূল্য নেই, আর সাহিত্যেও নেই। কারণ আমাদের রচিত ছোট গল্প ও উপন্যাস সব 'রাবিশ'। শিশু-সাহিত্যের চাহিদা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা তা লিখতে পারি নে। আমরা নূতন আরব্য উপন্যাসও লিখতে পারি নে— Grimm's Fairy Tales-ও লিখতে পারি নে। এর কারণ, তাই হচ্ছে যথার্থ শিশু-সাহিত্য, যা বড়দের জন্য লেখা হয়, আর যা পড়ে ছেলেরাও যথেষ্ট আনন্দ পায়। এর প্রমাণ পূর্ব্বে যে তিনখানি পুস্তকের নাম করেছি তার একখানিও ছোট ছেলেদের জন্য লেখা হয়নি, হয়েছিল বড়দের জন্য, অথচ এই তিনখানিই শিশু-সাহিত্যের অমর গ্রন্থ।

যাক, ও সব কথা। বাঙলা ভাষা আজও তার স্বরাজ্য লাভ করেনি। আর

ভবিষ্যতে যে করবে তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কী? আমি লেখকদের বলি যে দেদার লিখে যাও। যে-ক্ষেত্রে quality-র অভাব, সে ক্ষেত্রে quantity দিয়ে সে অভাব হয়ত পূর্ণ করা যেতে পারে। লোক-মতের যদি কোন মূল্য থাকে ত quantity-র জন্যে, quality-র জন্য নয়। যাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্যের একটু খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁরাই জানেন যে, সে দেশে যা লেখা হয় তা বেশির ভাগই 'রাবিশ'। এই 'রাবিশে'র পঙ্ক থেকেই সাহিত্যের পঙ্কজ কখনও কখনও ফুটে ওঠে। আর আশা করি যাঁরা পঙ্ক চিনতে শিখেছেন, তাঁরা পঙ্কজও চিনতে পারবেন।

আ জ কে র মা রা ত্ম ক স ম স্যা

আমরা দু'চার জনে আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, যেন সাহিত্যের উন্নতি কি অবনতিই দেশের সব চাইতে বড় কাজের কথা।

সাহিত্যের উন্নতি কিম্বা অবনতি সম্বন্ধে আমি মোটেই উদাসীন নই— এবং সাহিত্য যে মানব-সমাজের একটা খুব বড় জিনিস, এ কথা আমি কস্মিন্‌কালেও অস্বীকার করিনি।

ভারতবর্ষের অতীতকে আমরা যে এতটা শ্রদ্ধা করি, তার একমাত্র কারণ কি এই নয় যে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় খান-কতক বই আছে যা সর্বলোকপূজ্য? সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য আছে বলেই আমরা অতীত যুগকে গৌরবের যুগ মনে করি।

সাহিত্য অর্থে আমি শুধু রসসাহিত্য বুঝি নে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্যকেও আমি সাহিত্য বলেই গ্রাহ্য করি— যদিচ আমি জানি যে, রসসাহিত্য একটি বিশেষ রকম সাহিত্য এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য; কারণ একমাত্র শুষ্ক জ্ঞানচর্চা করাই মানুষের পরম পুরুষার্থ নয়।

আমরা যখন বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির কথা আলোচনা করি, তখন আমরা শুধু এই রসসাহিত্যের কথাই ভাবি।

এ ভাবনা নিষ্ফল। কারণ রসসাহিত্যকে নূতন পথে নিয়ে যেতে পারেন ও সমৃদ্ধ করতে পারেন শুধু দু'একজন সাহিত্যজগতের মহাপুরুষ। এখন এই মহা-পুরুষ যে কবে জন্মগ্রহণ করবেন, তা কেউ বলতে পারে না। তাঁরা 'আচম্বিতে' জন্মলাভ করেন। কেউ তাঁদের ফরমায়েস দিয়ে বানাতে পারে না।

অপর পক্ষে বাঙ্গলা ভাষায় যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্য রচনা করা যায়, এ জ্ঞান আজকে বহু লেখকের হয়েছে। এটি আমি একটি সুলক্ষণ মনে করি। এই নূতন লেখকরাই আশা করি স্বজাতির মন, ইংরাজি ভাষার অধীনতা থেকে মুক্ত করবেন; text book লিখে নয়, মাতৃভাষায় তাঁদের শিক্ষিত মনের পরিচয় দিয়ে।

আমাদের মহাসমস্যা হচ্ছে বর্তমান ইকনমিক দুর্গতি। এ বিপদ থেকে বাঙ্গালী জাতি আর যে-উপায়েই উদ্ধার পাক, দেশের বর্তমান ইকনমিক অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে পাবে না। আজকের দিনে বাঙ্গালী জাতি যে কত দূর আর্থিক দুরবস্থায়

পড়েছে, তা সকলেই জানেন, কারণ না জেনে উপায় নেই। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতিকে নিত্য এ দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য। সুতরাং মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এ বিষয়ে আপনাদের কাগজে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছেন, তার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, 'জমিদার শ্রেণী উৎসন্নপ্রায়, কৃষক শ্রেণীও যাইতে বসিয়াছে, মহাজন শ্রেণীও তথৈবচ। চাকরীর বাজার বড়ই মন্দা, মোকদ্দমার অল্পতায় উকীলদল অধিকাংশ অনাহারে দিন কাটাইতেছে।'

উক্ত কথা ক'টি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে-ইকনমিক রোগে আমরা আক্রান্ত হয়েছি সে রোগের প্রতিকার অসাধ্য না হলেও যে দুঃসাধ্য, তা অস্বীকার করবার যো নেই।

প্রথমত, এ দুর্গতি ব্যক্তিবিশেষের নয়, সম্প্রদায়বিশেষেরও নয়, জাতি-বিশেষেরও নয়— সমগ্র মানবজাতিরই। পৃথিবীর ইকনমিক জগতে অকাল প্রলয় ঘটেছে। এ অবস্থায় য়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু লোক— কী উপায়ে এ প্রলয়ের গতিরোধ করা যেতে পারে, তার সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস— সব দেশের রাজপুরুষেরা নিজ নিজ জাতির আত্মরক্ষার সদুপায় আজও আবিষ্কার কবতে পারেননি, আর তাঁদের ইকনমিক মন্ত্রীরাও কোন সদুপদেশ দিতে পারছেন না। এর থেকে এ অনুমান করা যায় যে, এ রোগের চিকিৎসা, পলিটিসিয়ানরাও করতে পারবেন না, ইকনমিস্টরাও না; ফলে, এ বিপদের যারা ভুক্তভোগী তাদেরই এ বিষয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। রাজশক্তি খুব বড় শক্তি, কিন্তু প্রজাশক্তির সহায়তায়।

এখন বাঙ্গলার জনসাধারণের হাতে নিজেদের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের কী উপায় আছে, সে সম্বন্ধে দু'কথা বলতে চাই। ইংলণ্ড থেকে একটি ফাঁকি কথা আমরা বছর-পঞ্চাশ আগে এ দেশে আমদানী করেছি। সে কথাটা হচ্ছে যে, মানুষে যত তার standard of living বাড়ায়, সে তত সভ্য হয়। ঐ কথা যে বাজে কথা, তার প্রমাণ, অতীতেও বড় বড় সভ্য জাতি ছিল, কিন্তু তাদের standard of living ছিল না।

এই standard of living কথাটার অর্থ আমি প্রথম যৌবনে বুঝতে পারিনি, আর আমার বিশ্বাস, বহু পূর্বে এ কথার বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে প্রতিবাদ করি। কিন্তু সে কথার কেউ মূল্য দেননি, রসিকতা হিসেবেই কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সে যাই হোক, এই standard of living ক্রমে ক্রমে আমাদের যে কত দূর বেড়ে গিয়েছে, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কথাতেই দিই। তিনি লিখেছেন যে— 'আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন,

এখনকার তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সে জন্য আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না; তার কারণ তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশী উঁচুনীচু ছিল না, তার কারণ তখনকার সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল। তখন আমাদের আহার-বিহার ও সকল প্রকার উপকরণ যা ছিল, তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।' (রাশিয়ার চিঠি)

গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী সমাজের standard of living, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিলিতী বাবুগিরির চলন' যে কী পর্যন্ত বেড়ে গেছে, তার সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে জন্মলাভ করেননি, করেছিলেন বড় মানুষের ঘরে, সুতরাং তাঁর সাক্ষ্য আমরা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারি নে।

এখন এই বিলিতী বাবুগিরি-চাল ত্যাগ করা যে নিতান্ত আবশ্যক ও সম্ভব সে বিষয়ে আমার দার্শনিক গুরু Bergson সম্প্রতি য়ুরোপের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। সে কথা বারান্তরে বলব।

দু টি স ম স্যা

হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব অথবা অসদ্ভাবের সমস্যাটা আজকাল দেশের সব চাইতে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। এ সমস্যার জন্ম অবশ্য কাল হয়নি। যে-দিন কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে সেই দিন থেকেই ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরোধ আজ যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এত প্রাধান্য লাভ করেছে, তার কারণ গত তিন বৎসর ধরে এ সমস্যার গোঁজামিল দিয়ে মীমাংসা করবার বিধিমতো চেষ্টা বিফল হয়েছে। আমার নিজের ধারণা এই যে, এ বিরোধটি আসলে কৃত্রিম, কারণ এ বিরোধ ধর্মগতও নয়, জাতিগতও নয়, সম্পূর্ণ পলিটিকাল, এবং কংগ্রেসি পলিটিকাল।

এই ধারণাবশত আমি প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাঙলায় এ দুই সম্প্রদায়ের ভিতর কী রূপ সম্বন্ধ ছিল, পরস্পরের ধর্মের প্রতি পরস্পর কী রূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তার সন্ধান নিতে চেষ্টা করেছি। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তারই পরিচয় নিতে আমি শূন্যপুরাণ, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি আমার পূর্বপরিচিত গ্রন্থের জ্ঞান সম্প্রতি আবার ঝালিয়ে নিয়েছি। এ সকল গ্রন্থ থেকে আমি কী সত্যের যে আবিষ্কার করেছি, তার বিশেষ পরিচয় আমি 'মাসিক বসুমতী'তে ইতি-পূর্বে ধারাবাহিক রূপে দিয়েছি।

বলা বাহুল্য যে উক্ত গ্রন্থসকল আমি পূর্বে পড়েছিলুম কাব্য হিসেবে, সম্প্রতি পড়েছি দলিল হিসেবে। তার ফলে আমার এই জ্ঞান লাভ হয়েছে যে আর পাঁচ জনেও যদি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য দলিল হিসেবে পড়েন, তা হলে তাঁরা উক্ত সাহিত্য থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাংসারিক অবস্থা, মনোভাব ও কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। আর তখন প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে লেখকেরা উপন্যাস না লিখে ইতিহাস লিখতে পারবেন। সে ইতিহাস অবশ্য পলিটিকাল ইতিহাস হবে না। কারণ বাঙলার মুসলমান যুগের পলিটিকাল ইতিহাস লিখতে হলে ফার্সি ভালো জানা চাই। উক্ত ভাষার এক বর্ণ না জেনেও ও-যুগের পলিটিকাল ইতিহাস লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ও-রূপ অবস্থায় একমাত্র

ইংরাজি বই পড়ে আমাদের সে ইতিহাস লিখতে হবে, অথচ পাতায়-পাতায় ইংরাজি কেতাব যে অবিশ্বাস্য সে কথা বলতে হবে। ফার্সি ভাষার আমি এক অক্ষরও জানি নে, তাই আমি বাঙলার তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন ঈষৎ কষ্ট করে ও-ভাষা আয়ত্ত করেন। তাতে শুধু বাঙলা সাহিত্যের নয়, বাঙলার পলিটিক্সেরও লাভ আছে। আমরা যদি ফার্সি সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ পরিচিত হই, তা হলে সেই সঙ্গে আমরা মুসলমানদের সঙ্গেও যথার্থ পরিচিত হব। সকল মিলনের গোড়াকার কথা যে মনের মিলন, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চা থেকে আমার যে-জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার মোটামুটি সূত্রগুলি এ প্রবন্ধে ধরিয়ে দিতে চাই।

মুসলমান যুগে বাঙলার লোকের কিছুমাত্র political consciousness ছিল না। দেশের রাজা কে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বাঙলার প্রজা সেকালে কোন রূপ রাজ-অত্যাচারের বিষম ফল ভোগ করলেই তাঁদের মনে পড়ে যেত যে দেশে একজন রাজা আছেন। আর যতক্ষণ নিজ ধর্মের উপর কোন রূপ দৌরাত্ম্য না হত, ততক্ষণ তাঁরা রাজার ধর্ম সম্বন্ধেও কোন কথা বলতেন না। সকলেই নিজের নিজের ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সমগ্র প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এক হুসেন সা ব্যতীত অপর কোন পাঠান বাদশার নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই। একমাত্র ভারতচন্দ্র দুটি-একটি মোগল নবাবের নাম উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে একটা কথা বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। তাঁরা নাকি এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে কোরাণ নিয়ে দিগ্বিজয় করতে বেরুতেন। এ কথা মুসলমান ধর্মের আদি যুগের আরবদের সম্বন্ধে সত্য হতে পারে, কিন্তু পাঠানেরা বাঙলা জয় করেছিলেন ধর্ম প্রচার করার জন্য নয়, ধনরত্ন আত্মসাৎ করবার লোভে। পৃথিবীর অধিকাংশ দিগ্বিজয়ী জাত যে-কারণে পরদেশ জয় আবহমান কাল করে আসছেন পাঠানেরাও সেই একই কারণে ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। প্রায় সকল যুদ্ধেরই মূলে আছে অর্থ— নেই শুধু ধর্ম।

মুসলমান যুগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সে যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এক রকম নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মতো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যুদ্ধ হত রাজায়-প্রজায় নয়, রাজায়-রাজায়। আর বাঙলা দেশে অন্তত যুদ্ধ হিন্দু রাজার সঙ্গে মুসলমান রাজার হত না, হত মুসলমান রাজার সঙ্গে মুসলমান রাজার। তার ফলে অবশ্য কষ্ট ভোগ করতে হত প্রধানত প্রজাকে। কথায় বলে—

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়
উলুখড়ের প্রাণ যায়।'

এবং আমার বিশ্বাস যে, সেকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সকল জাতির উলু-

খড়ের সমান প্রাণ যেত। যুদ্ধের দুটি অনিবার্য ফল হচ্ছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। আর মানুষের এ দুই মারাত্মক শত্রু কারও ধর্ম কি জাত বিচার করে না।

তারপর সেকালে হিন্দু প্রজার সঙ্গে যে মুসলমান প্রজার দিবারাত্র সংঘর্ষ হত, তার কোন প্রমাণ সেকালের বঙ্গ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রজায়-প্রজায় মারামারিটে democratic যুগের ধর্ম; কেননা democratic যুগে প্রতিটি প্রজা নিজেকে রাজার অংশ-অবতার বলে মনে করেন। ইউরোপেও সেকালে যত যুদ্ধ হত, সে সবই রাজায়-রাজায় যুদ্ধ। এখন অবশ্য প্রজায়-প্রজায়ও যুদ্ধ হয়। তাই সেকালের যুদ্ধ সব ছিল dynastic, আর এ কালের হয়েছে national. ইউরোপের গত যুদ্ধ যদি শুধু dynastic হত তা হলে তা অত মারাত্মক ব্যাপার হত না, national হওয়াতেই সে দেশের সব nation মরতে বসেছে অথবা বসেছিল।

হিন্দু ও মুসলমান, এ দুটির একটি কথাতেও একটি কোন বিশেষ জাতি বোঝায় না। হিন্দু জাতির অর্থ যে ছত্রিশ জাত সে মত ত সর্বজনবিদিত। মুসলমান বলতেও সেকালে বাঙলায় নানা জাত বোঝাত, এবং সে সব জাতের মধ্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। সেকালে কোন মোগল পাঠান কি সৈয়দ কখনও নিজেকে কোন জোলার সঙ্গে এক জাত মনে করতেন না। রাজার ধর্ম নিলেই রাজার জাত হওয়া যায় না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, হিন্দু খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করলেই ইংরাজ হয়ে ওঠে না।

ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটি সেকালে পৃথিবীর সকল দেশেই হত, ভারতবর্ষেও হয়েছে, বাঙলা দেশেও হয়েছে। এ দেশের কোন কোন পাঠান বাদশা ও মোগল নবাব হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেছেন। কিন্তু সেকালের ইতিহাস মন দিয়ে পড়লেই দেখা যায় যে এ সব দৌরাত্ম্যের মূলে ছিল রাজার স্বার্থ-- রাজার ধর্ম নয়। কারণ এ সব অত্যাচারের ভিতর হিন্দুরও মন্ত্রণা ছিল, হিন্দুরও হাত ছিল।

এ সাহিত্যে যা খুব স্পষ্ট, তা হচ্ছে অপর জাতির হিন্দুর উপর ব্রাহ্মণের অত্যাচার। সেকালের বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব লেখকদের গ্রন্থে ব্রাহ্মণের কড়া ধর্মশাসনের বিরুদ্ধে দেদার অভিযোগ আছে। শূন্যপুরাণের লেখক রমাই পণ্ডিত, মুসলমানদের ত্রাণকর্তা, দেবতার অবতার বলে বর্ণনা করেছেন, আর 'চৈতন্যভাগবত'-এর লেখক বৃন্দাবন দাসের মুসলমানের চাইতে ব্রাহ্মণের উপর বেশি আক্রোশ ছিল, যদিচ বৃন্দাবন দাস নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ।

হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সদ্ভাব স্থাপনের মতো আর একটা বড় রাজনৈতিক সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে অস্পৃশ্যতা দূর করা। এ চেষ্টাও যে নিষ্ফল হয়েছে, তার প্রমাণ আজকের দিনে কোচিনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবেন। যে-মালাবার প্রদেশে মোপলা-বিদ্রোহের সময় কংগ্রেসের এক resolution-এর সার্থকতা দেখা গিয়েছে, সেই মালাবারেই কংগ্রেসের আর এক resolution-এর

সার্থকতা দেখা যাচ্ছে। এ জাতীয় resolution তখনই সার্থক resolution হবে, যখন সে আসবে মানুষের অন্তর থেকে, কোন বাহিরের সভা-সমিতি থেকে নয়। ইতিহাস যদি মানুষকে কোন শিক্ষা দেয় ত এই শিক্ষাই দেয়। যত দিন ভেদ-বুদ্ধিকেই আমরা ধর্মবুদ্ধি জ্ঞান করব, তত দিন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের অতীতই থেকে যাবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ১

১

হিন্দু-মুসলমানের ভাব ও আড়ির সমস্যাটি আজকাল এত বিষম হয়ে উঠেছে যে, তার হাত-হাত মীমাংসা করাটা নাকি আমাদের পক্ষে আশু কর্তব্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ মীমাংসা করতে হবে— এ মামলার বিচার না করে। পলিটিসিয়ানদের মতে এ সমস্যার বিচার অকর্তব্য। কেননা, এ সমস্যা বড় delicate, সুতরাং সকলে এ বিচার করতে পারে না; শুধু সেই ব্যক্তিই পারে, যে ঠুনকো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে— যার কোমল করস্পর্শে কোন জিনিসই ভাঙে না। অতি হিসেব করে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, আট আনা সত্য গোপন করে, বাকি আট আনা অতি কৌশলে ঢেকে-ঢুকে প্রকাশ করবার, অতি প্রিয় করে মিথ্যা কথা বলবার ক্ষমতা যার আছে, সে-ই কেবল delicate question-এর আলোচনা করতে পারে। এ হেন হাতসাফাই লেখক অ-পলিটিকাল লেখকদের মধ্যেও লাখে এক-আধ জনের মধ্যে পাওয়া যায়। আর সাহিত্যিকদের মধ্যে তা মোটেই পাওয়া যায় না। সাহিত্য মানে যে বেফাঁস কথা— তা কে না জানে? সুতরাং আমরা এ সমস্যার আলোচনা করতে বসলে লোক ভয় পায় যে, আমরা হিতে বিপরীত করে বসব। অতএব চার ধার থেকে বিজ্ঞ লোক বলছে— 'চুপ', 'চুপ', 'চুপ'।

আমি কলম ধরে অবধি বিজ্ঞ লোকের তাড়া খেয়ে-খেয়ে এই জ্ঞানলাভ করেছি যে, বিজ্ঞতার শাসন মানতে গেলে কোন কথাই বলা হয় না। সেই সঙ্গে এ সত্যও আবিষ্কার করেছি যে, বিজ্ঞ লোকের শাসন মানবার কোন কারণ নেই। কেননা, বিজ্ঞতা জিনিসটে হচ্ছে আসলে ভয়কুণ্ঠা। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে কোন সমস্যাই delicate নয়, আসলে একমাত্র delicate জিনিস হচ্ছে মানুষের মন। এমন সুকুমারমতি লোক অনেক আছেন, যাঁদের মন সত্যের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, যাঁরা সত্য কথা শুনলে কানে হাত দেওয়ার চাইতে আগেভাগে অপরের মুখে হাত দেওয়াটা ঢের বেশি শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সত্য জিনিসটেকে একেবারে চাপা দেওয়া যায় না। আজ

তাকে চেপে দিলে কাল সে আমাদের গলা চেপে ধরে। হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম সদ্ভাব গড়বার চেষ্টায় যে শুধু অসদ্ভাব গড়া হয়েছে, এ সত্য ত আজ প্রত্যক্ষ।

২

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা যে অতি delicate, এ কথা না মানলেও এ বিষয়ে বিচার করবার আর এক বাধা আছে। বিনা বিচারে যাঁরা এ বিষয়ে একটা ঘরাও মীমাংসা করে বসে আছেন, তাঁরা বলছেন যে আমাদের সে মীমাংসা সম্বন্ধে কোন রূপ কথা কইবার অধিকার নেই। আজ তিন-চার দিন হল, Forward পত্রিকার মারফৎ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু আদেশ করেছেন যে, তাঁদের দলের প্যাক্টের চাইতে যারা ভালো প্যাক্ট পকেট থেকে বার করতে না পারে, তাদের উক্ত প্যাক্ট সম্বন্ধে মুখ খোলবার এক্তিয়ার নেই। প্রথমত এ রূপ সমালোচনা হচ্ছে শুধু destructive criticism, বিজয়বাবু চান— constructive জিনিস; দ্বিতীয়ত ও-রূপ criticism-এ তাঁর life intolerable হয়ে ওঠে। Destructive criticism যে অসহ্য, এ কথা ব্যুরোক্রেসির মুখে জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি, ফলে ও-রূপ ব্যুরোক্রেটিক ধমক শুনে আমবা কাতর হয়ে পড়ি নে। তবে তাতে যে বিজয়বাবুর life intolerable হয়, এটা অবশ্য অতিশয় দুঃখের কথা। বিজয়বাবু যদি উক্ত প্যাক্টের নীচে এই মর্মে একটি নোট লিখে দিতেন যে, 'এ প্যাক্টের কেউ যেন সমালোচনা না করে, তাতে প্যাক্ট-কর্তাদের কোমল হৃদয়ে অতি ব্যথা লাগবে,' তা হলে হয়ত আমরা নিরস্ত হতুম। তবে একটা কথা বিজয়বাবুর কাছে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি। ধরুন, যদি তিনি 'স্বরাজ্য-বিজয়কাব্য' নামক একখানি মহাকাব্য কাল লিখে বসেন, আর তার যদি বানান, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ আগাগোড়া ভুল হয়, আর সমগ্র কাব্যখানি একটি ভীষণ হ-য-ব-র-ল হয়, তা হলে সে কথা বলবার অধিকার কি কোন লোকের থাকবে না? আর আমাদের কি তার পিঠ-পিঠ একখানি উক্ত নমুনার 'স্বরাজ্য-বিজয়কাব্য' লিখতে হবে? ধরুন, যদি বিজয়বাবুর হুকুমে তাই আমরা করে বসি— তা হলে সেই সব মহাকাব্যের ঠেলায় দেশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে কি না? আর বহু লোকের জীবন যাতে অতিষ্ঠ না হয়, তার জন্য একের life intolerable করতে আমরা বাধ্য। বিজয়বাবু আমাকে মাপ করবেন। দেশের লোককে এই সব ব্যুরোক্রেটিক ধমক দেবার অধিকার তাঁর আজও জন্মায়নি। আজও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তিনি ও তাঁর দলবল আজও আমাদের দেহ-মনের শাসনকর্তা হয়ে উঠেননি। আর একটি কথা, স্বরাজ্য দলের দলপতি স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ত বলেছেন যে, ও-প্যাক্টের প্রকাশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওর criticism শোনা।

৩

যে-সমস্যার কোন আশু মীমাংসাকে লোক আশু গ্রাহ্য না করলে মীমাংসকদের দল পালায়— পুরুষালি রাগ ও মেয়েলি অভিমানের কমিক অভিনয় করেন, সেটি যে অতি ট্রাজিক ব্যাপার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের গোল যারা চুক্তি করে চুকিয়ে দিতে পারে না, তাদের পক্ষে গোলটার কারণ কী বুঝে দেখবার চেষ্টা করা কর্তব্য। মীমাংসা শিকায় তোলা থাক, আপাতত সমস্যাটা কী, তাই দেখা যাক। যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মেটাবার কথাটাই আমাদের পলিটিক্সের সব চাইতে বড় কথা হয়ে উঠেছে, তখন এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ যে ঘটেছে, সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু এই বিরোধ জন্মাল কোথা থেকে?

এখন আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা উভয়েই ত আজকের দিনে সমাবস্থ। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা সুখে থাকি, দুঃখে থাকি— হিন্দু-মুসলমান সকলেই আছি সমান সুখে, নয় সমান দুঃখে। ইংরাজ-রাজের ত ভারতবর্ষের সর্বভূতে সমদৃষ্টি। দুটো-চারটে fact-এর সাহায্যে দেখা যাক, কথাটা ঠিক কি না।

৪

ইংরাজের আইন ত হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করে না। আমিও চুরি করলে জেলে যাব, আমার বন্ধু মহম্মদ আলিও চুরি করলে জেলে যাবেন। অবশ্য, যদি আমাদের চুরি আদালতে প্রমাণ হয়। আর আদালতে যদি প্রমাণ না হয় ত আমরা দু'জনেই বে-কসুর খালাস পাব, তা আমরা পরের যত দ্রব্য না বলে নিই না কেন। Penal Code, Evidence Act ও Criminal Procedure Code ধর্ম মানে না। আমরা আপোষে যা খুশি তাই contract করি না কেন— ও-তিনের হাত থেকে contract out করতে পারব না— এ রাজেও নয়, স্বরাজ্যেও নয়। এখন ফৌজদারি আদালত ছেড়ে দেওয়ানি আদালতে যাওয়া যাক। আমি যদি শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকি, তা হলে সে টাকা মায় সুদ তাঁকে ফিরে দিতে দেওয়ানি আদালত হুকুম দেবে; আর বন্ধুবর যদি আমার কাছে টাকা ধার নিয়ে থাকেন ত তাঁর নামে নালিশ করলে আমিও তাঁর বিরুদ্ধে মায় সুদ সে টাকার ডিক্রি পাব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান বলে তিনি সুদের দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না। মুসলমানের ধর্মে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ, এ আপত্তি সে আদালতে টিকবে না। জজ বলবেন যে, মুসলমানের পক্ষে সুদ নেওয়া না নেওয়া তার এক্তিয়ার, কিন্তু তাকে তা দিতে হবে। আর সে সুদ তাকে পেয়াদায় দেওয়াবে।

অর্থাৎ কি ফৌজদারি কি দেওয়ানি আদালতে হিন্দু-মুসলমান খালি মানুষ বলেই গ্রাহ্য হয়। আইনের চোখে টিকি-দাড়ির কোন প্রভেদ নেই।

৫

তারপর টেক্স আমরা সকলেই দিই এবং এক হারে দিই। নুনের উপর টেক্স বসলে হিন্দুর নুনও আক্রা হয়, মুসলমানের নুনও আক্রা হয়। পোস্টকার্ডের দাম দ্বিগুণ হলে, হিন্দুকেও এক পয়সার পোস্টকার্ড দু'পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, মুসলমানকেও ঠিক সেই দামে। নেশাও আমাদের মধ্যে কেউ কারও চাইতে সস্তায় করতে পারে না। গভর্নমেন্টের একচেটে মাল, আফিম মদ গাঁজা প্রভৃতি সবই আমাদের এক দরে কিনতে হয়। তারপর জমিদারের খাজনাও রায়তকে এক হারে দিতে হয়। হিন্দু জমিদারও হিন্দু প্রজাকে কম নিরিখে জমি পত্তন করেন না, আর মুসলমান জমিদারও মুসলমান প্রজাকে জমি কম খাজনায় দেন না। প্রজা হচ্ছে জমিদারের সন্তান— আর প্রজার প্রতি জমিদার মাত্রেরই স্নেহ সমান। তাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে হাতের পাঁচটি আঙুলই সমান। প্রজা যদি খাজনা না দিতে পারে ত জমিদার হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে তার নামে বাকি পড়ার নালিশ করে— তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। যথা জমিদার, তথা মহাজন। হিন্দু-মুসলমান খাতকের কাছ থেকে তাঁরা সমান হারে সুদ আদায় করেন।

৬

তার পর ইকনমিক্স-ক্ষেত্রে আসা যাক। এ ক্ষেত্রেও ত হিন্দুর এমন কোন অধিকার নেই, যাতে মুসলমান বঞ্চিত; আর মুসলমানেরও এমন কোন অধিকার নেই, যাতে হিন্দু বঞ্চিত। ধান ও পাট হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বাজার দরে বেচতে হয় আর কাপড় উভয়কেই বাজার দরে কিনতে হয়। ম্যাঞ্চেস্টার ধুতি বেচে দেশের টাকা লুটে নিলে, এ কথা যদি সত্য হয় ত, সে টাকা হিন্দুর পকেট থেকেও যায়, মুসলমানের পকেট থেকেও যায়। ম্যাঞ্চেস্টার ত খদ্দেরের ধর্মের খোঁজ নেয় না। যাকে বলে বাণিজ্য ওরফে Commerce, তার সকল পথ— সকলের পক্ষে সমান খোলা। বড়বাজারে শুধু মাড়োয়ারি পয়সা কামায় না, কচ্ছি-সুরতি অনেক জাতের মুসলমানও কামায়। আর এ উভয় জাতই ক্ষণে লাখপতি ক্ষণে দেউলে হয় এবং তা একই কারণে। বিলেত থেকে মাল আমদানি দু'জনেই করে আর ভারতবর্ষ থেকে মাল রপ্তানি দু'জনেই করে। কলের ও রেলের কুলী-গিরি করলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমান মাইনে পায়। আর মাইনে বাড়াতে হিন্দুরও যে-স্বার্থ, মুসলমানেরও সেই স্বার্থ। হিন্দু-মুসলমানের এ ক্ষেত্রে commu-

nal interest এক, যেমন হিন্দু-মুসলমান সকল রায়তের communal interest এক। কেননা, না খেতে পেলে হিন্দুও মরে, মুসলমানও মরে, আর সম্ভবত মরে দু'জনেই এক জায়গায় যায়— অর্থাৎ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় যে; ইকনমিক্সের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের বাঁচবার ও মরবার অধিকার সমান।

৭

তারপর একেলে গবর্নমেন্টের হাতে কতকগুলি জিনিস এসে পড়েছে যা পৃথিবীর কোন দেশেই সেকালে ছিল না, যথা— education ও sanitation, বাঙলা ভাষায় যাকে বলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এখন অন্তত বাঙলায় অধিকাংশ লোকের শিক্ষাও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে জনগণ সমান নিরক্ষর। আর লোক-শিক্ষার দেশে যে-অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা আছে, তা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই জন্য এক। প্রাইমারি স্কুলের দ্বার অবারিত; যে খুশি সে সেখানে ঢুকতে পারে আর যখন খুশি তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তারপর আসে কলেজ। যে ম্যাট্রিক পাস করে, সে-ই সেখানে পড়তে পারে। যে ম্যাট্রিক পাস করতে পারে না, সে সেখানে ঢুকতে পারে না। হিন্দুর ছেলেও ফেল হয়, মুসলমানের ছেলেও ফেল হয়। হিন্দুর ছেলে যদি দু'য়ের সঙ্গে দুই যোগ দিয়ে পাঁচ করে ও মুসলমানের ছেলে যদি তিন করে, তা হলে তারা দু'জনেই সমান নম্বর পায়— একশর ভিতর শূন্য। এই পাস-ফেলের কথাটা communal interest-এর একটা বড় কথা হয়েছে; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এটা সাম্প্রদায়িক হিসাবের মধ্যে আসেই না। এ প্রস্তাব অদ্যাবধি কোন পলিটিসিয়ান করেননি যে লোকসংখ্যার হিসেব থেকে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় শতকরা ৫৫ জন মুসলমানকে পাস করতে হবে ও শতকরা ৫৫ জন হিন্দুকে ফেল করতে হবে। স্বরাজ্যেও এ নিয়ম চলবে না; কেননা, স্বরাজ্য আর যাই হোক, আশা করি, পাগলা-গারদ হবে না। তারপর sanitation-এর কথা ধরা যাক। ম্যালেরিয়া কারও ধর্ম মানে না। আর কালাজ্বর হলে হিন্দুর ও মুসলমানের পিলে মাপে সমান বড় হয়। আর যদি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কেউ যায়, তা হলে হিন্দুকেও দিন আট আনা জরিমানা দিতে হত, মুসলমানকেও তাই। আর জেলে গেলে হিন্দুকেও লাপ্সি খেতে হয়, মুসলমানকেও লাপ্সি খেতে হয়। আর পুলিস দু'জনকেই সমান পেটে।

৮

মানুষের সঙ্গে গভর্নমেন্টের সম্পর্ক— আইন নিয়ে, টেক্স নিয়ে, কারবার নিয়ে, রোজগার নিয়ে, জেল নিয়ে, পুলিস নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে। আর এ সকল বিষয়েই তো হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। সুতরাং এ স্থলে ত বিরোধের

কোনই কারণ নেই। আমরা পলিটিকালি সবাই ত এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি, সুতরাং পলিটিক্সের ক্ষেত্রে যদি আমাদের বিরোধ ঘটে, তা হলে সেটা প্রকৃত নয়, সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

আর যদি কেউ বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ— হিন্দুর ধর্ম এক, আর মুসলমানের ধর্ম আলাদা, অর্থাৎ এ বিরোধের কারণ দৈহিক নয়, মানসিক; ঐহিক নয়, পারত্রিক। তা হলে এ বিরোধের কখনই ত মীমাংসা হবে না, কেননা, হতে পারে না। ভারতবর্ষের মুসলমানও সব কখনও হিন্দু হয়ে যাবে না ও হিন্দুও সব কখনও মুসলমান হয়ে যাবে না। এ কথা হিন্দুও জানে, মুসলমানও জানে এবং আশা করি, যাঁরা সর্বধর্মসমন্বয় করতে চান, তাঁরাও জানেন। স্বরাজ্যের লোভে মানুষ তার স্বধর্ম ছাড়বে না।

আমাদের সকলের ধর্ম এক নয় বলে আমাদের সকলের পলিটিক্স এক হবার কি কোন বাধা আছে? ইংরাজ-রাজ ত ভারতবর্ষের সকল ধর্মের প্রতি সমান উদাসীন। গবর্নমেন্ট মন্দির গড়বার জন্যও এক পয়সা দেয় না, মসজেদ গড়বার জন্যও নয়। অপর পক্ষে, রাস্তার জন্য কিংবা রেলের জন্য দরকার হলে মন্দির ভাঙতে সদাই প্রস্তুত এবং মসজেদ ভাঙতে কখনও কখনও। তার পর গবর্নমেন্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও মাসহারা দেয় না, মৌলবীকেও নয়; উভয়কেই দেন শুধু টাইটেল,— ব্রাহ্মণকে মহামহোপাধ্যায়, মুসলমানকে শ্যাম-শূল-উলেমা। দরগায় বাতি ও মন্দিরে ধূপ প্রজাকে নিজের খরচায় দিতে হয়। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে আমরা গবর্নমেন্টের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

দেখতে পাই, ধর্মের দুটি-একটি ক্রিয়াকলাপ নিয়েই হিন্দু-মুসলমানে কাজিয়া বাধে। হিন্দু তার পূজাপার্বণে সজোরে ঘণ্টা নাড়ে, ঢাক পেটে ও ভেপু বাজায়। এ ব্যাপারকে হিন্দুরা বলে সঙ্গীত ও মুসলমানরা বলে গোলমাল। এ বিষয়ে আমি মুসলমানদের সঙ্গে একমত। মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছেন যে, হিন্দুরা যদি মসজেদের সুমুখে বাজনা একটু আস্তে বাজায়, তা হলে ত সব গোল চুকে যায়। এ প্রস্তাবে আশা করি, কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান আপত্তি করবেন না। চৈতন্যদেবের শিষ্যরা যখন নবদ্বীপে সংকীর্তনের ধুম চালান, তখন খোল-করতালের চোটে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অস্থির হয়ে উঠে বৈষ্ণবদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, গান এত চেঁচিয়ে গাইবার, বাজনা এত জোরে বাজাবার প্রয়োজন কী? ভগবান কি কালা? সুতরাং এ প্রশ্ন আজ যদি মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করে, হিন্দুর পক্ষ থেকে তার কোন জবাব নেই। তারপর আসে গো-বধের কথা। এইটিই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোড়ার কথা ও শেষ কথা এবং এইটিই হচ্ছে এ সমস্যার একমাত্র delicate question এবং এ সমস্যার একটা আপোষ মীমাংসা যত সত্বর হয়, ততই ভালো। যদি প্যাক্ট করে এ গোল চুকিয়ে দিতে পারা যায়, তা হলে

সে প্যাক্টকে আমি ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করতে প্রস্তুত। তবে একটি কথা বলি, আমাদের জাতীয় সকল নির্বুদ্ধিতা গরুর ঘাড়ে চাপালে সে বেচারার প্রতি একটু অন্যায় করা হয়। আর গরু নিয়ে মারামারি করাটা হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে যে অতি বুদ্ধির কায, আশা করি, কি হিন্দু কি মুসলমান কোন পলিটিসিয়ানই তা বলবেন না। আজ তক কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের ভিতর কোন বকরিদ riot ঘটেনি। এই থেকে বুঝা যায়, এ হাঙ্গামা দূর করবার উপায় হচ্ছে— পলিটিকাল প্যাক্ট নয়,— শিক্ষা।

৯

উপরিউক্ত কারণে বুঝা যায়, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আসলে কোন পলিটিকাল কারণ নেই। ধর্মের প্রভেদ অনুসারে এ দেশে ব্রিটিশ যুগে কোন পলিটিকাল প্রভেদ জন্মায়নি। য়ুরোপে ধর্মের পার্থক্যের উপর বহুকাল যাবৎ পলিটিকাল অধিকারের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট সমান অধিকার সে দেশে সে দিন মাত্র পেয়েছে, তা-ও আবার অনেক মারামারি অনেক কাটাকাটির পর। আর এ দেশে ব্রিটিশরাজ যে প্রথম থেকেই আমাদের অনেক বিষয়ে সমান অধিকার দিয়েছেন আর অনেক অধিকার সম্বন্ধে সমান বঞ্চিত করে রেখেছেন, তার কারণ হিন্দুও ইংরাজের স্বজাতি নয়, মুসলমানও নয়। তার পর ইংরাজের ধর্ম বেদের ধর্মও নয়, কোরাণের ধর্মও নয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান অসদ্ভাবের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান ছেড়ে এর মূল ভূত ও ভবিষ্যৎ খুঁজতে হবে।

মৌলানা মহম্মদ আলি সে দিন কোকনদ কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বর্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্মকথা ও ইতিহাস সকলকে শুনিয়ে দিয়েছেন। সে ইতিহাস মোটামুটি সত্য, কিন্তু তার ভিতর তিনি অনেক কথা উহ্য রেখে গেছেন। আমি তাঁর লিখিত ইতিহাস অবলম্বন করে ও তার ফাঁকগুলো পুরিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব তার পুনরাবৃত্তি করছি। কেননা, এই ইতিহাসের আলোকে সমস্যাটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসবে।

সার সৈয়দ আহম্মদ যে এ বিরোধের সৃষ্টিকর্তা, এ কথা মৌলানা মহম্মদ আলি স্বীকার করেছেন। সুতরাং কী উদ্দেশ্যে তিনি এ বিরোধের সূত্রপাত করতে ও তার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার সন্ধান নেওয়া যাক। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর বড়জোর শতকরা দশ জন মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশিদের বংশধর, বাকি নব্বই জন পুরো ভারতবর্ষীয়। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমান 'রইশ'দের অধিকাংশের বাসস্থান হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ-রাজ ও-প্রদেশের লোককে যে ভীষণ শাস্তি দেন, তার বেশির ভাগ শাস্তি মুসল-

মান সম্প্রদায়কেই ভোগ করতে হয়, ফলে ও-প্রদেশের মুসলমান aristocracy নিতান্ত দুর্দশাপন্ন হয়ে পড়েছিল। সার সৈয়দ আহম্মদ উক্ত সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পেই আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, ইংরাজি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হলে, তাঁর সম্প্রদায় আর ভারতবর্ষে মাথা তুলতে পারবে না। স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতির তিনি মূল মন্ত্র ধরেছিলেন শিক্ষা, এবং তিনি বহু পরিশ্রমে বহু বাধা অতিক্রম করে মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার ব্যবস্থা করতে কৃতকার্য হন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান প্রতিবাদী ছিল— তাঁর স্ব-সম্প্রদায়। ইংরাজি শিক্ষা লাভ করলে তাঁদের ছেলেরা ধর্মভ্রষ্ট হবে, এই ছিল orthodox মুসলমানদের বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস তাঁদের মনে এতটা বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁরা সার সৈয়দকে ধর্মদ্রোহী নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিলেন— যেমন রাজা রামমোহন রায়কে একশ বৎসর আগে বাঙলায় হিন্দু orthodox সম্প্রদায় দিয়েছিল। জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন যে, সার সৈয়দ আহম্মদের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল তিনটি জিনিস এবং সে তিনটি হচ্ছে education, loyalty এবং opposition to the Hindus. তিনি যে-শিক্ষা স্ব-সম্প্রদায়কে দিতে চেয়েছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানকে ইংরাজের প্রতি loyal করা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের Lt. Governor Sir John Strachey-কে তিনি যে-address দেন, তাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন যে, মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য হচ্ছে— তাদের প্রধানত loyal করা এবং সেই সঙ্গে to advance our proper national interest, তার পর Sir Wilfrid Blunt-এর সংবর্ধনায় তিনি বলেন যে : 'আমরা ও ইংরাজরা এই দুই দল একখানি কাঁচির দুখানি blade-এর মতো পরস্পর সংযুক্ত। আমাদের আন্তরিক বাসনা এই যে, ব্রিটিশ রাজত্ব শুধু বহুকালের জন্য নয়, চিরকালের জন্য এ দেশে অক্ষুণ্ণ থাক।'

এই সব কথাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সার সৈয়দ আহম্মদ, আজকের দিনে যাকে আমরা বলি মুসলমান communal interest, তাকে মুসলমান national interest বলতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরাজের আসন এখানে অটল হলেই মুসলমানদের national interest বজায় থাকবে। মহম্মদ আলি বলছেন যে, সার সৈয়দ আহম্মদের এ মত কালোপযোগী ছিল। এ কথা আমিও স্বীকার করি। সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে সাম্প্রদায়িক আত্মরক্ষার জন্য loyal হওয়া শুধু স্বাভাবিক নয়, অতি সুবিবেচনার কায হয়েছিল। তিনি এ পথ অবলম্বন না করলে মুসলমান education-এর কথাটাও চাপা পড়ে যেত। এইটুকু মাত্র তাঁর ভুল হয়েছিল যে, ইংরাজের স্বার্থ ও মুসলমানের স্বার্থ এক। ইংরাজ ও মুসলমান যে একই কাঁচির দুটি ফলক, এই ধারণাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের গোড়ার কথা। হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়কে একটি

কাঁচির দুটি ফলক স্বীকার করলে আমাদের পলিটিকাল বাঁধন দড়ি কাটবার হয়ত একটু সুবিধা হত।

মুসলমানের মনে ইংরাজের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যের ধারণা জন্মাবা মাত্র হিন্দুর সঙ্গে অনৈক্যের ধারণাও তাঁদের মনে জন্মলাভ করলে। আর যখন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যুরোক্রেসীর মনান্তর ঘটল, তখন থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সৃষ্টি হল। অর্থাৎ National Congress-এর জন্মের পিঠে-পিঠে সার সৈয়দ আহম্মদ তার ধ্বংসকল্পে এক [United] Patriotic Association গড়ে বসলেন। এ Association-এ অবশ্য হিন্দুও ছিলেন। সার সৈয়দ আহম্মদ ও কাশীনরেশের ভিতব একটা পেট্রিয়টিক প্যাক্ট হল। কিন্তু এ Association বহুদিন টিকল না, কেননা, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অনতিবিলম্বে আবিষ্কার করলেন যে, আলিগড়ের কলেজের প্রিন্সিপল Theodore Beck তাঁদের উভয়কেই নাচাচ্ছেন, তাঁরা কেবল ইংরাজের হাতের পুতুল মাত্র। মৌলানা মহম্মদ আলি সার সৈয়দ আহম্মদের এ কালের দুটি বক্তৃতার নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সে বক্তৃতায় কী বলা হয়েছিল, তার উল্লেখ করেননি— এই ভয়ে যে, সে সব পুরনো কথায় হিন্দুর মনে ব্যথা লাগবে। কিন্তু এ ভয় পাবার কোন কারণ নেই। হিন্দুর মনে কিছুতেই ব্যথা লাগে না। ভাষায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয; কিন্তু হিন্দুর পেটে না খেলেও পিঠে সয়। তবে সে বক্তৃতার কথা না তুলে মহম্মদ আলি ভালোই করেছেন। কেননা খুব সম্ভবত সে বক্তৃতা তাঁর লেখা নয়, ইংরাজের লেখা। সার সৈয়দ আহম্মদ ইংরাজি অতি কম জানতেন, কিন্তু লিখতেন ঠিক ইংরাজের মতো। আর সেকালের কংগ্রেস-বিরোধী অনেক রাজা-মহারাজরা ইংরাজি এক বর্ণও জানতেন না, অথচ 'Nineteenth Century'-তে অতি চমৎকার ইংরাজিতে অতি বড় বড় প্রবন্ধ লিখতেন। এই থেকেই এ সব বক্তৃতা ও লেখার বক্তা ও লেখকদের চেনা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করেন, ব্যুরোক্রেসির এতে কী স্বার্থ? তার উত্তর স্বয়ং Sir John Strachey-ই দিয়েছেন। ভারতবর্ষের উপর তিনি যে-বই লিখেছেন, তাতে তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। তাঁর কথা এই— 'মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোন পলিটিকাল বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নাই। কারণ, মুসলমানরা খ্রিস্টানদের অপেক্ষা পৌত্তলিক হিন্দুদের শতগুণ বেশি ঘৃণা করে। পাশাপশি এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় থাকাটা ভারতবর্ষে আমাদের রাজত্বের প্রধান ভিত্তি।' সেকালের মুসলমানের communal interest ছিল একমাত্র গভর্নমেন্টের চাকরি পাওয়া, তারপর হয়েছে communal representation এবং এ দুই interest-এর উদ্ভাবন করেছে ব্যুরোক্রেসি। এ দুই সম্প্রদায়কে এ ভাবে পৃথক করে দিলে Indian Nationalism-কে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করা যায়, এই হচ্ছে এর গোড়ার ও শেষ কথা। যারা রাজশক্তির dyarchy নষ্ট করতে উদ্যত, তারা প্রজাশক্তির এই dyarchy-র বনেদ পাকা করতে এত ব্যস্ত কেন বোঝা অসম্ভব।

হি ন্দু - মু স ল মা ন স ম স্যা ২

আপনি আমাকে পূজা সংখ্যার 'বসুমতী'র জন্য একটি গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমি জানি, পূজার সাহিত্য প্রধানত গল্প-সাহিত্যই হয়ে থাকে— কারণ, ছুটির দিনে পাঠকদের প্রবন্ধ পড়বার অবসরও থাকে না, রুচিও থাকে না। আমি জাতিতে প্রবন্ধকার হলেও ইতিপূর্বে গল্পরচনারূপ অনধিকারচর্চা করেছি— প্রথমত আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য। দ্বিতীয়ত এই বিশ্বাসে যে, পূজার বাজারে আমার হাতের গল্পও চলে যাবে।

কিন্তু এ বৎসর কোন বিশেষ কারণে গল্প লেখবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বর্তমানে আমার মন এতটা উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যে, আজ যদি আমি কোন গল্প লিখতে বসি, তা হলে তাতে খালি দুটি মাত্র রস থাকবে— তিতো ও ঝাল।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এ দেশে এ যুগে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর বিরোধটা আমার মনের উপর বারো মাস একটা পাপের বোঝার মতো চেপে থাকে। তার পর সম্প্রতি গুলবার্গা, সাজাহানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমার ধর্মজ্ঞান ও পেট্রিয়টিজম উভয়ই যুগপৎ ঘোর পীড়িত হয়েছে। আর সে দিন কোহাটে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর দারুণ নির্যাতনের কথা পড়ে আমার অন্তর্নিহিত পূর্বপুরুষরা শুধু ব্যথিত নয়— ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনেকের মতে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা সুবুদ্ধির কায নয়— কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্য কথা সব সময়ই বলা ভালো। আমরা কেবল মাত্র বুদ্ধিমান জীব নই— আমরা সবাই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করি— অতএব আমরা সকলেই অল্পবিস্তর রাগদ্বেষের বশীভূত এবং মানবজাতি আবহমান কাল তাই থাকবে। যে-দিন মানুষ সম্পূর্ণ রাগদ্বেষের বহির্ভূত হবে— সে দিন তারা দেবতা হবে এবং তখন তাদের এই মাটির পৃথিবীতে আর স্থান হবে না। তখন তারা সব অন্তরীক্ষে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কথা যে অতি সতর্ক হয়ে বলা প্রয়োজন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। কথাতে মানুষের ঢের উপকার করেছে, কিন্তু কথাতেই আবার মানুষের প্রভূত অপকার করেছে। সুতরাং আজকের দিনে এমন কোন কথাই আমাদের মুখ দিয়ে বার হওয়া

উচিত নয়, যে-কথা এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের যে-আগুন জ্বলেছে, তার ইন্ধন হয়। সেই সঙ্গে এ সত্যও আমার কাছে অবিদিত নয়— মিষ্টি করে মিছে কথা বলাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আজ যে ভীষণ আকার ধারণ করেছে, চার বৎসর আগে তা স্বল্পমাত্রায় ছিল, অথচ গত চার বৎসর ধরে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের যত কথা এ দেশে যত চেঁচিয়ে বলা হয়েছে, তার পঞ্চাংশের একাংশও তার পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। সেই সব প্রীতির কথা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল কেন? এর একটি কারণ, পলিটিসিয়ানদের মুখের কথা তাঁদের যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করেনি। এই সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টায় একটা অসদ্ভাবের সৃষ্টি হত না, যদি না এই বলা-কওয়া একটা মহা পলিটিকাল চাল মাত্র হত।

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর অনৈক্য বৃদ্ধি পেলে ভারতবর্ষের যে ঐক্য থাকবে না, এই সোজা কথাটা এমন ভাবে বলা হত, যেন পৃথিবীতে এ মহাসত্যের সন্ধান পূর্বে কেউ কস্মিন্‌কালে পায়নি। এ কী রকমের সত্য জানেন? দু'য়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হয়, আর দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে শূন্য হয়, এই জাতীয় সত্য। কথাটা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই— কিন্তু এ রূপ সত্য আবিষ্কার করবার জন্য অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন নেই। আসল জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে— এই দুইয়ে দুইয়ে যোগ হয় না কেন? আর দুই আজকে একত্র করবার জন্য আমরা যত রকম পলিটিকাল সেলাই করি— সেলাইয়ের যোগসূত্র ছিঁড়ে যায় কেন? যায় এই জন্য যে, সে সূত্র হচ্ছে লূতাতন্তু।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল কোথায়, তা আমি খুঁজে বার করবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা আবিষ্কার করতে কৃতকার্য হইনি। প্রথমত পলিটিকালি হিন্দু-মুসলমান আমরা সকলেই সমাবস্থ, এই হচ্ছে আমার ধারণা। এ ধারণা যদি আমার ভুল হয়, তা হলে বিশেষজ্ঞরা আমাকে যদি দেখিয়ে দেন যে, আমার ভুল কোথায়, তা হলে আমি তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব। যেহেতু, পলিটিক্সের ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণরা অদ্যাবধি সে কার্য করেননি এবং আজ পর্যন্ত তাঁরা যে সব pact-এর খসড়া বার করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা আমাদের সমাবস্থ রাখতে চান না, বিশেষ সম্প্রদায়কে বিশেষ অধিকার দিতে চান। আজকাল এ দেশে national কথাটার ভিত্তি হয়েছে communal অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়কে এক করবার প্রধান উপায় হচ্ছে তাদের আগে থেকে পৃথক করে দেওয়া। আমরা যখন মুখে বলি যে, এটা ওটা সেটা হচ্ছে আমাদের birth right, তখন আমরা মনে ভাবি, ও-সব আমাদের birth privilege, তাই পলিটিকাল ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যে-সংঘর্ষ, সে right নিয়ে নয়, privilege নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই privilege-এর কথাটা পলিটিসিয়ানদেরই সৃষ্টি, সুতরাং সেই পলিটিসিয়ানরাই

যে এই বিরোধের মীমাংসা করতে পারবেন, এ রূপ আশা সজ্ঞানে করা যায় না। এ রকম আশায় বুক বাঁধতে হলে তার পূর্বে পলিটিকাল মোহাবিষ্ট হওয়া দরকার। সে মোহ আমাদের সবারই আছে, কিন্তু সকলের সমান মাত্রায় নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলনটা যদি স্বরাজলাভের উপায় মাত্র হয়, তা হলে কি স্বরাজলাভেব পর— আমাদের পরস্পবের কুকুর-বেড়ালের মতো লড়াই করতে হবে? উদ্দেশ্য সাধিত হলে উপায়ের ত কোন সার্থকতা থাকে না, গাছ চড়লে মইয়ের যে আর প্রয়োজন থাকে না— এ কথা এ দেশের নিরক্ষর লোকও জানে। পলিটিক্স, এ যুগে মানুষের জীবনের অনেকটা অধিকার করে থাকে, কিন্তু সবটা নয়। প্রথমত যাকে আমরা সামাজিক জীবন বলি, পলিটিক্স অদ্যাবধি তার সবটাকে গ্রাস করে ফেলতে পারেনি এবং আমার বিশ্বাস, কস্মিন্‌কালে পারবেও না। রাজ্য হচ্ছে সমাজদেহের একটা বিশেষ অঙ্গ মাত্র এবং এ অঙ্গের প্রভাব সমগ্র সমাজদেহের উপর যথেষ্ট আছে, কিন্তু সমাজই হচ্ছে রাজ্যের মূলাধার। এই সত্য উপেক্ষা করাটাই হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের প্রধান অন্তরায়।

এখন এ কথাটা সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, রাজ্যের গঠন মানুষে রাতারাতি বদলে ফেলতে পারে— কিন্তু সমাজের গড়নের উপর ও-রূপ হস্তক্ষেপ করা চলে না। আমাদের ছত্রিশ জাতকে এক জাত করার চাইতে স্বরাজলাভ করা ঢের সহজ। কারণ, সমাজ বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছে, এক দিনে তার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব।

সামাজিক জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হচ্ছে অর্থের ও ধর্মের। ফরাসি বিপ্লব এক দিনে রাজার সঙ্গে ধর্মও উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তার ফল কী হয়েছে? ফ্রান্সে আজও অসংখ্য লোক আছে, যারা Roman Catholicism-এ বিশ্বাস করে এবং সে ধর্ম রক্ষা করবার জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত। আর Economics? ফরাসি বিপ্লব এক দিনে মানুষে মানুষে সকল প্রভেদ দূর করতে চেয়েছিল। তার ফল কী হয়েছে? সমগ্র য়ুরোপে ধনী-দরিদ্রের যে-প্রভেদ আজ ঘটেছে, ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে তার সিকির সিকিও ছিল না। ফ্রান্স তার রাজ্যের চেহারা বদলে ফেলেছে, কিন্তু ফরাসিরা তাদের মনের প্রকৃতি বদলাতে পারেনি। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মমত ও আর্থিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এক দেশের লোক এক জাতি হয়ে উঠতে পারে। একজন ফরাসি দার্শনিক বলেছেন যে, nationality জিনিসটে নির্ভর করে Sur-le-commun desir-de vivre-ensemble, অর্থাৎ মানুষের একসঙ্গে মিলে-মিশে বাস করবার ইচ্ছাই হচ্ছে nationality-র মূল। 'An fond, it n'y pas d'autre criterium' অর্থাৎ nationality-র অপর কোন ভিত্তি নেই। এ কথা আমি সম্পূর্ণ মানি।

পৃথিবীতে কিন্তু এমন পণ্ডিত ঢের আছেন— যাঁরা প্রচার করেন যে, national-

ity-র ভিত্তি হচ্ছে হিস্টরি, জিওগ্রাফি, জাতিধর্ম প্রভৃতি। আমরা কেউই অবশ্য স্বয়ম্ভু নই, সবাই অতীতের হাতে গড়া, সুতরাং আমরা জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সকলেই অল্পবিস্তর অতীতের জের টেনে চলেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও আমাদের জানা কর্তব্য যে, আমরা ভবিষ্যতের স্রষ্টা। অতীতের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমরা অতীতের গর্ভদাস নই। হিস্টরি, জিওগ্রাফি, জাত ও ধর্মের চৌহদ্দির ভিতর থেকে এক পা বেরবার শক্তি মানুষের যদি না থাকে, যথা পূর্ব তথা পরই যদি মানুষের কপালের লিখা হয়, তা হলে আমাদের একটি nation হবার আশা ত্যাগ করতে হয়। কারণ, হিন্দু-মুসলমানের ধর্মও এক নয়, হিস্টরিও এক নয়। বরং সত্য কথা বলতে হলে এ ইতিহাস হচ্ছে পরস্পরের যুগ-যুগান্তর ব্যাপী বিরোধের ইতিহাস। তা ছাড়া মুসলমানের ধর্ম এক হতে পারে, হিন্দুর তা নয়। সুতরাং এ যুগেও যদি ধর্মমতের পার্থক্য থেকে শত্রুতা জন্মায়, তা হলে আবহমান কাল ধরে হিন্দুতে হিন্দুতেও মাথা ফাটাফাটি করবে।

যত দিন পৃথিবীতে নানা বিভিন্ন ধর্ম থাকবে, তত দিন নানাবিধ ধর্মমতও থাকবে এবং সে মতভেদ নিয়ে আমরা তর্কও করব— কিন্তু সে তর্ক হবে লেখনীর, লাঠির নয়। লাঠির তর্ক দেখলেই আমরা চমকে উঠি— যেমন আজকের দিনে আমরা চমকে উঠেছি। বিশেষত আমাদের হিন্দুদের চোখে ব্যাপারটা নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকে। এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায় যে, ধর্মমত নিয়ে খুনোখুনি করা আমাদের হিন্দুদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, হজরৎ মহম্মদকে চিরজীবন লড়াই করতে হয়েছিল, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের গায়ে কেউ আঁচড়টিও কাটেনি; এবং সে যুগের জনগণ তাঁকে লোকনাথ চিকিৎসক বলেই স্তুতি করেছে। পুরাকালের কথা ছেড়ে দিয়ে আধুনিক কালেও দেখতে পাই যে, মহাপ্রভু চৈতন্যের উপরেও কেউ হস্তক্ষেপ করেননি। জগাই মাধাই যে তাঁকে কলসীর কানা দিয়ে মেরেছিল— সে মাতাল হয়ে। বৃহস্পতি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে শুধু অর্থের সংবরণ মাত্র। অর্থাৎ অর্থই হচ্ছে মানুষের কাছে সার পদার্থ। ধর্ম হচ্ছে একটা pretext মাত্র। এ যুগে য়ুরোপে Karl Marx নামক একজন ইহুদি জর্মান দার্শনিক এই সত্যের আবার পুনরাবিষ্কার করেছেন এবং এই মতের ভিত্তির উপরে Bolshevism নামক নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য মানবজাতির ত্রাণের জন্য।

বৃহস্পতি ও Karl Marx-এর মত যতই অদ্ভুত হোক না কেন, ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে অধর্ম ঘটতে দেখে তাঁদের কথাকে একেবারে বাজে কথা কি মিছে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আজকের দিনে সমগ্র দেশময় ধর্মের নামে যে শুধু অধর্মের লীলা চলছে, এ সত্য অস্বীকার করবার যো নেহ; কারণ স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও এ কথা বলেছেন।

আজকের দিনে যে খুনজখম চলছে, তার মূলে ধর্ম নেই, আছে শুধু অর্থ— অর্থাৎ এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার গোড়ার কথা হচ্ছে— লোভ। Economics-এর ক্ষেত্রে হিন্দু জনগণের সঙ্গে মুসলমান জনগণের কোনই প্রভেদ নেই। যে-মুসলমান লাঙল চষে ও যে-হিন্দু লাঙল চষে— তারা উভয়েই চাষা। বিরোধ ঘটেছে শুধু শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। এ সত্য যে অতি স্পষ্টই, তার প্রমাণ হিন্দু-মুসলমান pact-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এক নজরেই দেখতে পাবেন। কোন্ দলের ক'জন কাউন্সিলে যাবেন, আর কোন্ দলের ক'জন সরকারি চাকরি পাবেন— এর একটা মনগড়া রফা ব্যতীত ঐ সব pact-এ আর কী আছে? আর কাউন্সিলে ঢোকা আর চাকরিতে ঢোকা দুই যে আসলে অর্থের কথা, তা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন। তবে যে জনগণ পরস্পর খুনোখুনি করে, তার কারণ বুর্জোয়ার মসিযুদ্ধ পরিণামে দাঁড়ায় জনগণের অসি-যুদ্ধ। Mass mind নামক অন্ধশক্তিকে জাগ্রত করতে ও বিপথে নিয়ে যেতে পারে শুধু তথাকথিত শিক্ষিত লোকরা। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোক যে সাড়া দিয়েছে, এটি একটি মহা আনন্দের কথা। আমরা হিন্দু হই আর মুসলমান হই, আমরা moderate হই আর immoderate হই, আমরা সবাই মানুষ, আর আমাদের সকলের ভিতর যে-অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব আছে, মহাত্মা গান্ধী সেই মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েছেন। তিনি যে দু'দিনের জন্যও আমাদের মনুষ্যত্বের উদ্রেক করেছেন, এ অতিশয় সুখের কথা। কারণ, Unity Conference-এ যাই হোক, আমাদের এই সদ্য জাগ্রত ধর্মবুদ্ধি আবার একেবারে ঘুমিয়ে পড়বে না, অন্তত এই ত আমার আশা।

Unity conference-এর অপর কোন সুফল ফলবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি পারে শুধু pact করতে। সুতরাং যদি দেখি যে, এই নব কনফারেন্স আবার একটি প্যাক্ট প্রসব করেছে, তা হলে আর যিনিই হোন, আমি আশ্চর্য হব না।

মহাত্মা গান্ধী বলছেন যে, তিনি পূর্বে যে-সব ভুল করেছেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি এই উপবাসব্রত অবলম্বন করেছেন। দিল্লিতে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁদের ভিতর ক'জন এ কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত? যদি ভুলের জন্যই হিন্দু-মুসলমানের এই অকারণ বিরোধরূপ পাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে তিনি একা ত তার জন্য দায়ী নন, তাঁর সহযোগীরাও ত এর জন্য সমান দায়ী, বরং সত্য কথা বলতে গেলে বেশি করে দায়ী; কেননা গুরুর চাইতে চেলারা চিরকালই বেশি দড় হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে ক'জন মহাত্মা গান্ধীর বর্তমান মনোভাবের অংশীদার?

অস্পৃশ্যতা দূর করা, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর মনোমালিন্য দূর করা কোন পলিটিকাল মণ্ডলীর কোন resolution-এর কর্ম নয়। এই সব ব্যাপারের অন্তরে যে

গুপ্ত মনোভাব আছে, সে মনোভাব তারাই কতকটা দূর করতে পারে— যারা নিজের মনের সনাতন সংস্কারের উপর জয়লাভ করেছে। সম্ভবত এ জাতীয় কোন কোন লোক দিল্লির মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু সেখানে collective মনোভাবের চাপে তাঁদের নিজ মনোভাব হয়তো স্ফূর্তি পাবে না।

আর এক কথা। আমার মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয় যে, কংগ্রেস হয়ত দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে গেলে আমরা যেমন জাতবিচার করি নে, আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবই এক হয়ে যাহ; কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসবা মাত্র আমরা মানুষে মানুষে ঘোর পার্থক্য মনে ও জীবনে সমান মানতে আরম্ভ করি, তেমনই আমরা কংগ্রেসে গিয়েও মহা উদার হয়ে উঠি, Declaration of Rights-এর সকল বুলি আওড়াই এবং সকলে অন্তত তিন দিনের জন্য ভাই ভাই হয়ে যাই, কিন্তু ঘরে ফিরেই আবার পুরনো মনোভাব ও পুরানো ধরনের জীবনযাত্রা অবলম্বন করি।

সে যাই হোক, আমার শেষ কথা এই যে, আমরা শিক্ষিত লোকরা নিজের মন না বদলালে, জনগণের পরস্পর মারামারি কাটাকাটি কিছুতেই বন্ধ করতে পারব না। আমি কাউকেই উপবাস করতে বলি নে। আমি শুধু চাই যে, সকলে নিজের মন যাচিয়ে দেখুন যে, সেখানে এই পাপের মূল আছে কি না? আর যদি থাকে ত নিজের মন থেকে সে পাপ দূর করতে চেষ্টা করুন। আমরা যদি সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবার ইচ্ছাটাকে দৃঢ় করতে পারি, তা হলেই আমরা একটা nation হয়ে উঠব; কেননা, মানুষের মনের বাইরে nation-এর কোন অস্তিত্ব নেই।

বীরবলের পত্র

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

'ভাবতী' সম্পাদিকা সমীপেষু,

গত কয়দিন ধরে এই কলিকাতা সহরে হিন্দু-মুসলমান মিলে যে নাটকের অভিনয় করেছে আপনি আমাকে সে অভিনয় সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জানতে চেয়েছেন। এ জাতীয় নাটককে ইংরাজরা বলে Passion Play. আমি চেষ্টা করলে হয়ত 'চিরকুমার সভা' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে পারি কিন্তু যে মহানাটকের অভিনেতারা মহাবীর নয় মহামূর্খ— সে নাটক সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলবার অধিকার নাই। আমি এ জীবনে hero-worshipper হতে পারলুম না যদিচ আমিও কার্লাইল পড়েছি। এর কারণ আমি দেখতে পাই যে, সাধারণত লোকে যাকে বীরত্ব বলে তার সঙ্গে গোঁয়ারতুমির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, আর গোঁয়ারতুমির সঙ্গে সুবুদ্ধির সম্পর্ক অতি কম। ইতিহাস পড়ে দেখুন— দেখতে পাবেন আমরা তাদেরই বলি মহাবীর যারা বহু লোককে বেজায় মার মারতে পারে। সম্প্রতি অবশ্য আর এক মত বেরিয়েছে যাতে বলে— তারাই হচ্ছে মহাবীর যারা দেদার মার খেতে পারে। এর ভিতর যে-মতই গ্রাহ্য করুন, দেখতে পাবেন দুয়েরই এক কথা— মারামারির মূল থেকেই বীরত্বর ফুল ফোটে। যে-দিন পৃথিবীতে মারামারি থাকবে না সে দিন মানবসমাজে বীরত্বও থাকবে না। যদি কেউ বলেন যে, পৃথিবীতে এমন দিন কখনও আসবে না যখন মানুষে মানুষে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করবে না। তার উত্তরে আমি বলি, যে-দিন কখনও আসবে না, সেই দিনই হচ্ছে আমার ideal. আর কে না জানে, সেই বস্তুই হচ্ছে ideal যা কস্মিন্‌কালেও real হবে না অথচ যাকে রিয়েল করবার প্রয়াস আমাদের নিত্য পেতে হবে। এত লম্বা বক্তৃতা করলুম, এই কথাটা বোঝাবার জন্য যে, কলিকাতা সহরে যে নাটকের অভিনয় হয়ে গেল তার রস আস্বাদন করবার আমি উপযুক্ত পাত্র নই।

আমি যে বীর-রসের রসিক নই তা আপনারা সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও আপনি যে এ বিষয়ে কেন আমার মৌনব্রত ভঙ্গ করতে ব্রতী হয়েছেন তা আমি

অনুমান করতে পারি। সে কালে যিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক করবার চেষ্টা করেছিলেন সেই আকবর সাহেবের আমি পূর্বজন্মে ছিলুম একজন প্রিয় পারিষদ।

কিন্তু আকবর সাহেবের প্রিয়পাত্র হলেও আমি যে তাঁর স্বধর্মীদের প্রিয়পাত্র হতে পারিনি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ 'তারিখ-ই-বাদায়নী' নামক পারস্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় আছে। সে গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ আছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পরিচয় পাবেন যে গালিগালাজ কাকে বলে। আর পারস্য ভাষায় যত বাছা বাছা কটু কথা আছে সে সবই বীরবলের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে। মৌলবী বাদাউন, বহুকাল পূর্বে ভবলীলা সাঙ্গ করে 'হুরি'র দেশে চলে গিয়েছেন, অতএব এ স্থলে তাঁর জন্য দুঃখ করা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে অপর কোন কথা আমার মুখে শোভা পায় না। শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, আকবর বাদশা যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটিয়েছিলেন সে সুফল যে আমার রসিকতার বলে আর ফৈজীর কবিত্বের বলে আর আবুল ফজলের পাণ্ডিত্যের বলে ঘটেছিল; মৌলবী বাদাউনের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের ত্র্যহস্পর্শকে মৌলবী সাহেব অকারণ ভয় করতেন। আকবর সা এ কার্য উদ্ধার করেছিলেন নিজ বাহুবলে ও চরিত্রবলে। বাঘ-বকরীকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো কবিরও কর্ম নয় রসিকেরও কর্ম নয়। কথার ফুঁয়ে মনের আগুন যত চটপট জ্বালিয়ে [দেওয়া যায়]— কথার শান্তি-বারিতে তত শীগগির তা নেবানো যায় না। বরং নিত্য দেখা যায় যে শান্তি-বারির ছিটেফোঁটার স্পর্শে হোমের আগুন দ্বিগুণ রাগে জলে ওঠে।

২

এই সব বিবেচনা করে বর্তমানে চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করি। বিশেষত সাহিত্যিকের পক্ষে এ অবস্থায় নীরব থাকা সব হিসেবে সঙ্গত। সাহিত্যিকের কারবার বর্তমানের সঙ্গে নয়, তার কারবার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, এক কথায় যা চিরন্তন তাই নিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সনাতন হতে পারে কিন্তু চিরন্তন নয়। তা ছাড়া এখন কথা কইতে হলেই হয় নির্বোধের মতো কথা কইতে হবে, নয় অতি-বুদ্ধিমানের মতো।

নির্বোধের মতো কথা কইলে গোল বাড়বে বই কমবে না, আর বুদ্ধিমানের মতো কথা কইতে হলে দেদার চালাকি কথা কইতে হবে আর অতি-বুদ্ধিমানের মত বাহবা করতে হলে এই বিরোধের ভিতর মিলনের চেহারা দেখতে হবে।

আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে অতিসূক্ষ্ম না করতে পারলে এ ব্যাপারের ভিতর সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের সূক্ষ্ম শরীরের দর্শন আমরা লাভ করতে পারব না। কিন্তু এ আড়ির অন্তরে ভাবের সূক্ষ্ম শরীর দেখবার প্রবৃত্তি আমার থাকলেও অপরকে তা দেখাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক— তা তারা হিন্দুই হোক

আর মুসলমানই হোক— বেজায় স্থূলদর্শী। বিপদের কথা এই যে এই সব স্থূল-দর্শীরা হয়ত আমাদের অতি-নির্বোধ মনে করবে। অতিবুদ্ধি ও অতি-নির্বুদ্ধিতার ভিতর যে-সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তা স্থূলবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে না। এই সব ভেবে-চিন্তে আমি উক্ত ব্যাপারের কাব্যাংশের বিচার না করে তার দার্শনিক অংশের বিচার করাটাই সুযুক্তির কাজ মনে করি। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাটা কী তাই বুঝতে চেষ্টা করব।

৩

হিন্দু-মুসলমানে সমস্যা বলে যে একটা সমস্যা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গত পাঁচ বৎসর ধরে এই সমস্যা নিয়ে আমাদের দেশের পলিটিক্স এমন মুখরিত হয়ে উঠেছে যে এ সমস্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব।

আমি সমস্যার নাম শুনলেই ভয় পাই। কেননা দেখতে পাই যে, সমস্যার কথা পাড়লেই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তার হাতে-হাতে মীমাংসা করতে বসে যায়। এ ত হবারই কথা। মীমাংসা করবার জন্যই ত সমস্যার সৃষ্টি। তবে সমস্যা এক হতে পারে কিন্তু তার মীমাংসা হয় অসংখ্য! কারণ সমস্যা যদি থাকে ত সে বস্তু real আর মীমাংসা জিনিসটে যত unreal হয় ততই সুন্দর হয়। আর মীমাংসা যে বহু হতে বাধ্য তার কারণ unreality-র অসীম ক্ষেত্রে প্রতি লোক অবাধে তার বুদ্ধি খেলাতে পারে। সকলেই জানে ইতিমধ্যে এক প্রকার মীমাংসাকরা কত প্রকার 'হিতং মনোহারী চ' বাক্য আমাদের শুনিয়েছেন। সুতরাং সে সকল পূর্বমীমাংসার টীকা-ভাষ্য করবার আর প্রয়োজন নেই। তবে দোসরা এপ্রিল যে পূর্ব-মীমাংসকদের সব April Fool বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। এ স্থলে এ সমস্যার একটি উত্তর-মীমাংসার পরিচয় দিই।

মাদ্রাজের জনৈক মহা-অব্রাহ্মণ পলিটিসিয়ান বলেছেন যে যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে কন্যা সম্প্রদান করেন তা হলেও উভয় জাতির আন্তরিক মিলন ঘটে। দেহান্তর থেকেই যে মনান্তর ঘটে এ কথা শুধু কবিপ্রসিদ্ধি নয় বৈজ্ঞানিক সত্যও বটে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার এর চাইতে সহজ মীমাংসা আর কী হতে পারে?

এই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব হলেই ষোল কলায় পূর্ণ হত। আমাদের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে স্বরাজ-সমস্যা। এখন ইন্ডিয়ানরা যদি ইংরাজদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তার মানে ত্রিশ কোটি Indian যদি Anglo-Indian হয়ে যায় আর ইংরাজরা যদি সব Eurasian হয়ে যায় তা হলে অতি সহজেই স্বরাজের মামলার আপনা হতেই আপোষে মীমাংসা হয়ে যায়।

অদ্যাবধি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যত মীমাংসা হয়েছে সবই এই জাতীয়। কারও logic বেশি দূর যায়, কারও কম— মীমাংসকে মীমাংসকে এই যা প্রভেদ। প্যাক্ট নামক মীমাংসার ভিতর খুব tact থাকতে পারে— কিন্তু fact নেই। এখন fact যে কী সে বিষয়ে গত কয়দিনের ঘটনা, আশা করি, সহজ মানুষকে সচেতন করে দিয়েছে। আমার শেষ কথা এই যে, এই সব মীমাংসাই উক্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নিত্যনূতন মীমাংসার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেই আমাদের কাছ থেকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটাও হয়ত উপে যাবে। কারণ সমস্যা যেমন মীমাংসার সৃষ্টি করে, আবার মীমাংসাও তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে আমাদের কী কর্তব্য? জনৈক ফরাসি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়— ফরাসি বিপ্লবের সময় terror-এর সময় তিনি কী করেছিলেন, তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে ছিলুম। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর যাতে করে আমরা ঐ উত্তর দিতে পারি তাই আমাদের কর্তব্য।

ক লি কা তা র দা ঙ্গা ১

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্মযুদ্ধ চলেছে, তা দেখে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতাদের মধ্যে অনেকে যে চমকে উঠেছেন, এতেই আমি আশ্চর্য হয়েছি। কারণ, ব্যাপার যা ঘটেছে, তা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নয়।

আজ কয় বৎসর ধরে ভারতবর্ষের পলিটিকাল গগনে যে মেঘ জমছে, সে বিষয়ে আব কারও না হোক, এ দেশের পলিটিকাল বিমান-বিহারীবা যে অন্ধ ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে শুনতে পাই যে, যাঁরা একটা বড় আইডিয়ালেব ঘুড়ির পিছনে ছোটেন, তাঁরা নাকি কোন রূপ পারিপার্শ্বিক সত্যের সন্ধান পান না।

সে যাই হোক, যাঁরা পলিটিকাল নেশার ঘোরে এ বিষয়ে আকাশকুসুম রচনা করছিলেন, তাঁরা যে আজ চোখে সরষের ফুল দেখছেন, এতে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

আজ কয় বৎসর ধরে মালাবারে, কোহাটে, দিল্লিতে, প্রয়াগে, লক্ষ্ণৌয়ে, গুলবার্গে, সেকেন্দ্রাবাদে, মুলতানে যা ঘটেছে, সে ঘটনা কীসের লক্ষণ, সমাজদেহের রোগের, না স্বাস্থ্যের? যদি কেউ বলেন যে, ও-সব তুচ্ছ ব্যাপার আমরা চক্ষুর অন্তরালেই রেখেছি, তা হলে বলতে হয় যে, বর্তমান ভারতবর্ষের চিকিৎসক আর যিনিই হোন, পলিটিসিয়ানরা নন। 'কী হওয়া উচিত'— সে বিষয়ে জ্ঞান অতিমাত্রায় টনটনে হলে— 'কী হচ্ছে' তার জ্ঞান মানুষে হারিয়ে বসে থাকে। তখন সত্যকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তিও বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। এমন কথাও আমরা শুনতে বাধ্য হয়েছি যে, কলকাতায় যা ঘটেছে, তা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের নয়— সখ্যের নিদর্শন। 'হয়'কে 'নয়' করবার এমন নির্লজ্জ চেষ্টা পূর্বে অন্তত এ দেশে কখনও দেখা যায়নি।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসানে সে দিন Peace Conference-এর যে বৈঠক বসেছিল, তাতে একটা নতুন কথা শোনা গেল। এ হাঙ্গামার পিছনে নাকি মস্তিষ্ক আছে আর আমাদের হিন্দু নেতারা সেই মস্তিষ্ক আবিষ্কারের কার্যে ব্রতী হবেন।

মস্তক বাদ দিয়ে মস্তিষ্কের খোঁজ পাওয়া যাবে না। আর যদি সে সব মস্তক

তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে সেই সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করবেন যে, তাতে মস্তিষ্ক নেই। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ও নির্বোধ হিন্দু-মুসলমানদের কুকুর বিড়ালের মতো কামড়াকামড়ি করবার প্রেরণা যেখান থেকে আসে, তাকে হৃদয় বলতে পারো, কিন্তু মস্তিষ্ক কোন হিসেবেই বলা যায় না। কারণ, এ কামড়া-কামড়িতে হিন্দুরও লাভ নেই, মুসলমানেরও লাভ নেই। যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান মনে করেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মেড়ার লড়াই করালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ফয়দা হবে, তা হলে বলি, উক্ত রূপ ধারণা শুধু অ-মানুষিকতার নয়, নির্বুদ্ধিতারও সমান পরিচায়ক। ও-রূপ ধারণার মূল এই। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে নিজের ফয়দা একা হাতে করা যায় না। পিছনে বহু লোক চাই। এই বহুর নাম mass. অতএব এই mass-কে জাগাতে হবে। অর্থাৎ আমাদের ডুগডুগির তালে তাদের নাচাতে হবে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নবধর্ম পলিটিক্সের 'প'-ও mass জানে না। তারা সেই সেকেলে হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম প্রাণপণে আঁকড়ে বসে আছে। সুতরাং ধর্মের নামে যদি ডুগডুগি বাজাই, তা হলে mass জেগে উঠবে। ফলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পলিটিকাল মামলা ফতে হয়ে যাবে। এ রকম অতিবুদ্ধি আসলে অতি নির্বুদ্ধিতা। ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু-মুসলমান নেই, আর একটি তৃতীয় পক্ষ আছে— যার নাম ব্রিটিশরাজ। আর পলিটিসিয়ানরা যে-সব ফয়দার জন্য লালায়িত, সে সবেরই দাতা হচ্ছে এই তৃতীয় পক্ষ— আর গ্রহীতা অপর দুই পক্ষ।

এই ধর্মের আগুন হিন্দু-মুসলমান নেতারা জ্বালাতে পারেন, কিন্তু নেবাতে পারেন না; তার জন্য চাই ইংরাজের দমকল। আর সে দমকল আবশ্যক হলে তাঁরা পুরো চালাবেন। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষজাত বিরাট অগ্নিকাণ্ড তাঁরা কিছুতেই হতে দেবেন না। কারণ, প্রথমত তাঁরা রাজা— দ্বিতীয়ত তাঁরা ইংরাজ। পলিটিক্সে কোথাকার আগুন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা তাঁরা সম্পূর্ণ জানেন। ভারতচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছেন— 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'

ইংরাজ জানে যে, এ প্রশ্নের উত্তর— 'এড়ায় না।'

সুতরাং জনসাধারণের মনে ধর্ম-বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা ততক্ষণই বড় চালাকির কায— যতক্ষণ না আমাদের ঘর পুড়তে আরম্ভ করে।

আমাদের নেতারা যে কত দূর অন্ধ অথবা কপট অন্ধ, একটি ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের জনৈক পলিটিকাল গুরু মৌলানা মহম্মদ আলি, কলিকাতার এ হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে-সব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা শুনে হিন্দু নেতার দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। এঁদেরও হতভম্ব ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। মৌলানা সাহেবের বাতচিৎ তাঁরা পূর্বে কখনও কি শোনেননি, না তা বোঝেননি? তাঁর লিখিত 'Comrade'-এর কথা আর তুলব না। কারণ, 'Comrade'

যখন হপ্তার পর হপ্তা কলিকাতা সহবে আবির্ভূত হত, তখন সম্ভবত আজকালকার অনেক নেতা পলিটিক্সের রাজ্যে হামাগুড়ি দিতেন। সুতরাং পুরনো কেচ্ছা কাটবার কোন প্রয়োজন নেই। বিশেষত ইতোমধ্যে যখন মহম্মদ আলির মস্ত একটা বদল হয়ে গিয়েছে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে তিনি 'গান্ধীং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, কংগ্রেসং শরণং গচ্ছামি' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে পলিটিকাল বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবনের বৌদ্ধ যুগেরই প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক।

যিনি রাতারাতি মিষ্টার থেকে মৌলানা হয়ে ওঠেন, তাঁর কথাবার্তা একটু মন দিয়ে শোনা দরকার। আমিও তাঁর ভূতপূর্ব comrade হিসাবে তাঁর কথা কান খাড়া করে শুনেছি।

তাঁর যখন ফৌজদারি আদালতে বিচার হয়, তখন সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তৃতা পড়ে দেখবেন যে, সে দিন তিনি যা বলেছেন, তাঁর সে জবাব তারই পূর্বসংস্করণ কি না। ধর্মবিশ্বাস ও fanaticism যে পর্যায়-শব্দ, সে বক্তৃতায় আগাগোড়া তাই প্রমাণ করা হয়েছে। এক ধর্মের fanaticism-এর অর্থ যে অপর ধর্মের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ, এ মনস্তত্ত্বের জ্ঞান মৌলানা মহম্মদ আলির নেই, কিন্তু আর পাঁচ জনের আছে। অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও fanatic সংস্কৃত ভাষাতেও পর্যায়শব্দ নয়, ইংরাজি ভাষাতেও নয়।

তার পর তাঁর কংগ্রেসের Presidential Speech পড়ে দেখবেন, সেটিও তাঁর বর্তমান মতামতের পূর্বসংস্করণ মাত্র। তাতে যাত্রাদলী বীররস ঢের আছে— কিন্তু সুবুদ্ধির লেশ মাত্রও নেই। যখন দেখলুম যে, আমাদের পলিটিকাল নেতারা উক্ত মহাপ্রসাদ অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করলেন, তখন আমার সন্দেহ হয় যে, সে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, হয় তাঁরা ইংরাজি ভাষা জানেন না, নয় তাঁরা জেনে-শুনেও বোকা সাজাটা পলিটিকাল বিজ্ঞতার কার্য মনে করেন। আজকে যে সেই দলই মৌলানা সাহেবের কথা শুনে চমকে উঠেছেন, তাতে তাঁরা শুধু এই প্রমাণ করছেন যে, এত দিন তাঁরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন। আজকে গুঁতোর চোটে জেগে উঠে বিলাপ করছেন। এ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আর যাই কুফল হোক, একটি এই সুফল ফলেছে যে, পলিটিকাল স্বপ্ন-বিলাসীদের লীলাখেলার দিন ফুরিয়েছে।

কলকাতার দাঙ্গার নিমিত্ত-কারণ খোঁজবার আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ, তা খুঁজে বার করা পুলিসের কর্তব্য, আমাদের কর্ম নয়। যে প্রমাণ-প্রয়োগ পুলিসের কাছে যথেষ্ট মনে হয়, সাধারণ লোকের কাছে যে তা যথেষ্ট মনে হয় না, তার পরিচয় আগে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং পরে হয়ত পরিচয় পাওয়া যাবে যে, যে প্রমাণ-প্রয়োগ সাধারণ লোকের কাছে যথেষ্ট মনে হয়, পুলিসের কাছে তা যথেষ্ট নয়— ভারতচন্দ্র বলেছেন— 'যার কর্ম তারে সাজে,/ অন্য লোকে লাঠি বাজে।' এই কথাটি মনে রাখলে লেখক ও বক্তার দল অর্থাৎ কথা বেচে যাঁরা খান, তাঁরা

অনর্থক বাক্যব্যয় করে অনর্থের সৃষ্টি করেন না। কিন্তু যিনি চোখ-কান খোলা রাখেন, তাঁর পক্ষে এ জাতীয় ঘটনা যতই অপ্রিয় হোক, অদ্ভুত নয়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম যে বিভিন্ন এবং দুই ধর্ম যে মিলেমিশে এক হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তা বলাই বাহুল্য। এ বিচ্ছেদের ভিতর বিরোধের সম্ভাবনা চিরকালই রয়েছে। সুতরাং যাঁরা হিন্দুস্থানের সমাজদেহের ধাতুসাম্য করতে চান, তাঁদের জানা উচিত যে, যে-কথায়— যে-কাজে এই বিচ্ছেদ বাড়ায়, তার ভিতরই ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ নিহিত থাকে।

গত পাঁচ-ছয় বৎসর থেকে হিন্দু-মুসলমানের পবস্পরের যোগের প্রধান উপায় আমরা ঠাউরেছি বিয়োগ। যে-দিন থেকে আমরা পলিটিক্সে Communal representation অঙ্গীকার করেছি, সেই দিন থেকেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পাকাপাকি বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছি। ফলে এ কয় বৎসর ধরে এই দুই সম্প্রদায়ের সব বিষয়ে যথা— কেশে, বেশে, ভাষায়, ভাবে আলাদা হয়ে থাকার জোর প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। পলিটিকালি আমরা সকলে যে এক community অর্থাৎ একই বিলাতি ক্ষুরে আমাদের মাথা যে মোড়ানো হয়েছে, এ সত্যটা এতই প্রত্যক্ষ যে, যার চোখ আছে, এ সত্য তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ পলিটিক্স হিসেবে যা এক, তাকে দুটি স্বতন্ত্র ভগ্নাংশ হিসেবে ধরে নিয়ে সেই দুই ভগ্নাংশকে আঠা দিয়ে জোড়বার চেষ্টাই আমাদের পলিটিসিয়ানরা এত দিন ধরে করেছেন। এই mechanical চেষ্টার নাম Hindu Mahomedan entente ফল যা হয়েছে, তা উক্ত প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী কর্মফল।

মানুষ পথিমধ্যে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হলে তার দুঃখ দেখে আমাদের কান্না পাওয়া উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কেউ আকাশের দিকে চোখ তুলে চলতে চলতে পথিমধ্যে কোন বস্তুর ঠোক্কর খেয়ে উলটে পড়েন ত দর্শকরা না হেসে থাকতে পারে না। আর এই হাসি সমাজের বিশেষ উপকারী। কেননা, হাসির মানে হচ্ছে যে, যদি দেখে না শেখো ত ঠেকে শিখবে— অবশ্য যদি কোন কিছু শেখবার ক্ষমতা তোমার থাকে। এই হচ্ছে জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সুতরাং আজ যখন দেখতে পাচ্ছি যে, যাঁরা দুই ভাগ হিন্দুর সঙ্গে এক ভাগ মুসলমানকে দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেনের মতো মিশিয়ে জল করে দিয়েছি বলে আস্ফালন করছিলেন, তাঁরাই জলের বদলে আগুনের সৃষ্টি হল দেখে আঁতকে উঠেছেন, তখন হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ও-রকম রাসায়নিক মিশ্রণ সাধন করতে হলে তার ভিতর একটি electric spark অর্থাৎ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া দরকার। মনোজগতে এই বৈদ্যুতিক শক্তির নাম আধ্যাত্মিক শক্তি। এ শক্তি কেবলমাত্র বাক্‌শক্তি নয়। আত্মা আর যাই হোক, পড়াপাখি নয়। বড় বড় কথার নাম আধ্যাত্মিক শক্তি নয; টেঁয়ার মুখে 'রাধাকৃষ্ণ' শুনে অদ্যাবধি কেউ বৈষ্ণব

হয়নি। সুতরাং স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ মহাবাক্য প্রয়োগ— আধ্যাত্মিক শক্তির অপপ্রয়োগ। আর শক্তি মাত্রেরই অপপ্রয়োগ প্রলয়ঙ্করী। হাইড্রোজেন ও অক্সি-জেনের অন্তরে electric spark-এর অপটু প্রয়োগ হলে শুনতে পাই, অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেন explode করে, তখন জল বানাতে গিয়ে আমরা আগুন বানাই। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। সে দিন যা ঘটেছে, তাব রেশ অনেক দিন চলবে। বাইরে মানুষের মনকে এ ধাক্কা নানা রূপ নাড়াচাড়া দিয়েছে। ফলে আমাদের মনে সাজানো বিলিতি তাস ভেস্তে গিয়েছে।

এ ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে পলিটিকাল, অতএব এর ফলও ফলবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। আমাদের কালকের পলিটিক্স যে ঠিক কী মূর্তি ধারণ করবে, তা আমি বলতে পারিনে। কিন্তু আগামী কল্যের পলিটিক্সের চেহারা যে গত কল্যের পলি-টিক্সের চেহারা থাকবে না, সে কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

যে-সব আইডিয়া ও আইডিয়ালের উপর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের পলিটিকাল কল্পপুরীর প্রতীক্ষা করেছিলেন, সে সব আইডিয়া ও আইডিয়াল অতঃ-পর বাতিল হয়ে যাবে, আর তার স্থান অধিকার করবে নতুন আইডিয়া, নতুন আইডিয়াল। অবশ্য চলতি বোলচাল পলিটিসিয়ানরা সহজে ছাড়বেন না, কারণ মনোরাজ্যেও পুরনো পথ লোক সহজে ছাড়তে পারে না, বিশেষত সে পথে যারা দৌড়ে চলে। চলবার ঝোঁক নামক অন্ধ শক্তির ঠেলায় তারা অভ্যস্ত পথে আরও কিছু দিন অগ্রসর হতে বাধ্য। কিন্তু এই ঘটনায় অধিকাংশ লোকের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের পলিটিক্সের মূল ভারতবর্ষের জমিতে নেই। হিন্দুর মনের সঙ্গে মুসলমানের যে মিল নেই— ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের সঙ্গে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন যে এক নয়— আজকের দিনে কারও পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব। আমাদের হিন্দু-মুসলমানের মনের জমি যে পৃথক, তা তারা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় 'cultivate your own garden' অর্থাৎ 'নিজের জমি চাষ করো।'— Voltaire-এর পুরনো উপদেশ গ্রাহ্য করতে অনেকে স্বীকৃত হবে।

কলিকাতার দাঙ্গা ২

কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে যে-সব কথাবার্তা কওয়া হচ্ছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কারও মাথা নেই, কিন্তু সকলেরই হৃদয় আছে।

হিন্দু-মুসলমান কারও কথার ভিতর যে logic নেই, তার কারণ logic জিনিসটে মাথা থেকে বেরয়। তবে হৃদয়েরও অর্থাৎ রাগদ্বেষেরও একটা logic আছে, যার সন্ধান আরিস্টটেল কিম্বা গোতম জানতেন না।

সেই হার্দ্যন্যায় বর্তমানে দিব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ও একটা মানসিক রোগ।

রোগেরও একটা লজিক আছে— যা ডাক্তারদের ভাষায় বলতে গেলে, will take its course. সুতরাং এ ক্ষেত্রে রোগীকে চটপট সারাতে গেলে হয়ত উলটো উৎপত্তি হবে।

সুতরাং যা হয়েছে তা হয়েছে বলে মেনে নিয়ে দেখা যাক, সে বিষয়ে কী বলা যেতে পারে।

মৌলবী কলম আজাদ এবং মিষ্টার জে. এম. সেনগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের পঞ্চবৎসরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যে সখ্য জন্মলাভ করেছে, উক্ত ঘটনার ভিতর শুধু সেই সখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি এই হিন্দু নেতা ও মুসলমান নেতার পরস্পরের সখ্য উক্ত জাতীয় নয়।

প্রণয় জিনিসটে খুব ভাল কিন্তু তা যদি হয় অতি গাঢ়, তা হলে প্রণয়ী-যুগলকে পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য বলতে হয়— ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

দ্বিজু রায় বলেছেন যে, একটি আদর্শ দম্পতির দাম্পত্যপ্রণয় যখন চেগে উঠত, তখন 'পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।'

এ ক'দিন ধরে যে পাড়ার লোকে পুলিশ ডেকেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পাঁচ বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত পলিটিকাল ঘটকালির ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর উক্ত রূপ দাম্পত্য-প্রেম স্থাপিত হয়েছে।

'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' প্রস্তাবটা রাজনৈতিক হিসেবে খুব চটকদার। কিন্তু যাঁদের রাজনীতির ত্বর সয় না, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি— তার পর? বিয়ে ত আর মৃত্যু নয় যে, তারপর আর কিছু নেই।

ও-রকম বিয়ের পিঠ-পিঠ কথা ওঠে, 'বর বড় না কনে বড়?' তারপরই ঘটে দাম্পত্যকলহ, যার আর এক নাম হচ্ছে অজাযুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

যা হয়েছে তা যে যুদ্ধ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ মানে মারা ও মরা। যে মরেছে তার কাছে সব যুদ্ধই সমান। ওর ভিতর ছোট-বড়র প্রভেদ নেই।

যুদ্ধ হলেই লোকে তার কারণ খোঁজে। য়ুরোপের গত যুদ্ধের কারণ লোকে আজও খুঁজছে। কলকাতার যুদ্ধেরও কারণের তল্লাসের দু'চারটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্ভবত যাঁরা খুঁজছেন তাঁরাই তা ঘটিয়েছেন, কারণ এ বিষয়ে অনেকেই এক-মত যে, এ ব্যাপারের পিছনে brain আছে।

যদি তাই হয় ত সে brain-এর সন্ধান সহজেই পাওয়া যাবে।

একটা লক্ষণে সে brain সহজেই চেনা যাবে। যে brain থেকে এ বুদ্ধি বেরিয়েছে, তা নিশ্চয়ই brainless brain

হয় মিষ্টার আবদার রহিম, নয় সহিদ সুরবর্দি বলেছেন যে, এ বিরোধের কারণ দুটি— ১) পলিটিকাল, ২) ধার্মিক।

তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতি দলের ভিতর দুটি দল আছে— ১) শিক্ষিত দল, ২) মূর্খের দল।

পলিটিক্স ত শিক্ষিত দলের একচেটে; আর যে ধর্মের মানে বিধর্ম-বিদ্বেষ, সে ধর্ম মূর্খদের একচেটে।

অর্থাৎ ধর্মের দলে brain নেই, আছে শুধু পলিটিক্সের দলে। সুতরাং brain-এর তল্লাস করতে হবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। যদি কোথায়ও তা খুঁজে পাওয়া যায়, ত সেখানেই পাওয়া যাবে।

যদি কেউ বলেন যে, ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, তা হলে মানতে হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের দলও শিক্ষিত।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্স মেশানো হচ্ছে Nitric Acid-এর সঙ্গে Glycerine মেশানো। ধর্মের গ্লিসারিন জিনিসটে অতি নিরীহ, পলিটিক্সের অ্যাসিডের সঙ্গে মেশালেই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম মেশালে পলিটিক্সের যে শক্তি বাড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে শক্তি হয় প্রলয়ঙ্করী, আর পলিটিসিয়ানদের এমন কোন বিদ্যে নেই, যার সাধ্য রোধে তার গতি।

Law and order জিনিসটে বাতাসের মতো; অর্থাৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার মর্যাদা মানুষ বোঝে না, বরং হঠাৎ 'কাগজ উড়িয়ে নিলে' বলে তার উপর মানুষ গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কিন্তু ঐ জিনিসের অভাবেই মানুষে খাবি খায়।

ও-ক্ষেত্রে আর এক বিপদ আছে। বাইরের law and order-এর সঙ্গেই মনের law and order চলে যায়। এ অবস্থায় ফুর্তি করতে পারে শুধু তারা, যাদের অন্তরে উনপঞ্চাশ বায়ু আছে। বলা বাহুল্য আমাদের অধিকাংশ লোকের ভিতর তা নেই।

সুতরাং আবার কীসে আমাদের ভিতরে বাইরে law and order ফিরে আসে, সে ভাবনা আমরা ভাবতে বাধ্য।

আমি পলিটিকাল ডাক্তার নই, সুতরাং এ রোগের ওষুধ আফিং কি ব্রান্ডি তা বলতে পারি নে।

ইতালিতে মুসোলিনি নামক একজন পলিটিকাল ডাক্তার ক্যাস্টর অইল প্রয়োগ করে এ অবস্থায় খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এ দেশের ছোট পলিটিকাল ডাক্তারদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যদি communal গোলমালের সত্য সত্যই জড় মারতে চাও, তা হলে communal representation দূর করতে হবে। এ পলিটিকাল রোগের মূল বজায় রেখে বাইরে প্রলেপের ব্যবস্থা করবে শুধু পলিটিকাল হাতুড়ের দল।

হিন্দু-মুসলমান

'আত্মশক্তি' সম্পাদক সমীপেষু,

দু'দিন আগে কলিকাতা সহরে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন ঘটেছিল সে বিষয়ে আপনি যখন আমাকে আপনার কাগজের মারফৎ আমার বক্তব্য প্রচার করতে অনুরোধ করেন, তখন আমি বলি 'মাফ কিজিয়ে'।

য়ুরোপে গত যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়ে ওঠে তখন স্বনামধন্য ফরাসি সাহিত্যিক Romain Rolland স্বনামধন্য জার্মান সাহিত্যিক Gerhart Hauptmann-কে এই বলে পত্র লেখেন যে এ সময় কোন সাহিত্যিকের পক্ষে নীরব থাকা গর্হিত, কেননা অবস্থা বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে Silence is an action.

Gerhart Hauptmann উক্ত পত্রের কোন উত্তর না দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য মনে করেছিলেন। জর্মানির একজন বড় সাহিত্যিকের যখন বড় যুদ্ধের সময় বাক্ রোধ হয়েছিল তখন বাঙলার এক জন ছোট সাহিত্যিকের এই ছোট যুদ্ধের সময় এই বাক্ রোধ হওয়া আশ্চর্য নয়। সত্য কথা বলতে গেলে— এই রকম সময়ে 'বোবার শত্রু নেই' এই বচনের আশ্রয় নেওয়াই সাহিত্যিক নামধারী নিরীহ জীবদের পক্ষে স্বাভাবিক।

২

কিন্তু আপনি যখন আমাকে অভয় দিলেন যে লেখার নিচে 'বীরবল' সই করলে আমার কথা কেউ ধরবেও না, কেউ কিছু বলবেও না— তখন কলম ধরতে ভরসা পেলুম। বীরবল যে fool তা সকলেই জানে। আর শেক্সপিয়রের নাটকে দেখেছি যে ব্যাপার যখন সঙ্গীন হয়ে ওঠে তখনই fool-এর আবির্ভাব হয়। মানুষে বীর রস, বীভৎস রস ও করুণ রস অনেকক্ষণ ধরে একটানা উপভোগ করতে পারে না— মাঝে মাঝে হাস্যরসের ব্যবধান না দিলে ও-সব বড় বড় রসও বেশি কচলালে তিতো হয়ে ওঠে।

তবে রসিকতার কপালে যে বিপদ নেই তা মোটেই নয়। রসিকতা করার ফলে ক্রমান্বয়ে বলতে হয়—'উলটা বুঝলি রাম'; আর এ ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে হয়ত

বলতে হবে 'উলটা বুঝলি রহিম'। ঐখানে ত বিপদ। তা ছাড়া এ ব্যাপারে হাসির কোন অবসর নেই— হিন্দুর পক্ষেও নেই, মুসলমানের পক্ষেও নেই।

প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক Bergson বলেছেন যে পরের দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন না হলে মানুষ হাসতে পাবে না। অন্তত সেই মুহূর্তের জন্যও আমাদের insensible হতেই হবে যে-মুহূর্তে আমাদের হাসি বেরয়। লাঠালাঠির ভিতরও মানুষ insensible হয় কিন্তু সে অন্য হিসেবে, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাবেন যে দ্বিতীয় হিসেবে insensible হলে মানুষের মুখে হাসি বেরয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি কোন কথা বলি ত তা রসিক হিসেবে বলতে পারব না, fool হিসেবে বলতে পারি। কিন্তু সে জাতীয় কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তা ত দেদার বলা হচ্চে। এ অবস্থায় বর্তমানে মহাভারতের আশ্রয়ে দু'চার কথা বলছি।

৩

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধবার অব্যবহিত পূর্বে উভয় পক্ষের ভিতর এই রকম একটা pact হয়েছিল যে—

নিবৃত্তে বিহিতে যুদ্ধে স্যাৎ প্রীতির্নিঃ পরস্পরম্।
যথাপরং যথাযোগং ন চ স্যাচ্ছলনং পুনঃ
বাচ্য যুদ্ধ প্রবৃত্তানাং বাচৈব প্রতিযোধনম্॥
(ভীষ্মপর্ব্ব ১ অধ্যায)

অস্যার্থ— 'আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও প্রতারণা আর করা হইবে না। বাক্-যুদ্ধ আরব্ধ হইলে বাক্য দ্বারাই হইবে।'

আমি আশা করি যে, 'আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। তবে এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে,— মহাভারতের যুগের লোকের সঙ্গে এ যুগের লোকের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। আমাদের তুলনায় তাঁরা ঢের বেশি সাদাসিধে লোক ছিলেন, ইংরাজিতে যাকে বলে simple-minded. এস আগে পরস্পর মাথা ফাটাফাটি করি— স্যাৎপ্রীতির্নিঃ পরস্পরম্— এ রকম pact-এর কথা শুনলে আমার [হাসিও?] পায়, কান্নাও পায়। কিন্তু আমরা যে pact করেছিলুম তার ফলে যা হয়েছে তা দেখে মনে হয় মহাভারতের তাঁরা বর্তমান ভারতের আমাদের চাইতে বেশি reality-র সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন— যদি এক[জন] মারাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন, আর একজন মার খাওয়াকে— তা হলে সে দুই ব্যক্তির সখ্য টেঁকসই হয় না।

সে যাই হোক— পুনর্বার যদি উভয় পক্ষের প্রীতি সংস্থাপিত করতে হয়—

তা হলে এই কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকা চাই যে 'ন চ স্যাচ্ছলন পুনঃ।' কেউ কেউ মনে করেন যে পলিটিক্স করতে হলেই প্রতারণা করতে হবে, কারণ উদ্দেশ্য যদি সাধু হয় ত উপায় অসাধু হলে কী যায় আসে? এই দুই পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের একীকরণরূপ মহা উদ্দেশ্য এই সব চতুর লোকদের দ্বারা কিছুতেই সাধিত হবে না। হবে শুধু এই যে কলিকাতা সহরে বসন্তের এপিডেমিকের মতো এই মারামারি-রূপ মহামারী থেকে থেকে জেগে উঠবে। বলা বাহুল্য যা ঘটেছে তা সমাজদেহের একটা রোগ-বিশেষ [এবং] এ রোগ ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে।

কিন্তু মহাভারতের pact-এর শেষ চুক্তিটাই ভীতিপ্রদ— 'বাচ্য যুদ্ধ প্রবৃত্তানাং বাচৈব প্রতিযোধনম্।' এ কাজ আমরা সবাই করতে প্রস্তুত আছি যেহেতু ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমরা কটু তর্ক ও ফুটো তর্ক সমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই বাগ্‌যুদ্ধ ভারতবর্ষে সবাই করতে পারে না, পারি আমরা, শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়। বাদবাকি সকলে [করে] শুধু বাহুযুদ্ধ। ক্রমে আমাদের বাক্-যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে অশিক্ষিতদের বাহুযুদ্ধ। সুতরাং 'বাচৈব প্রতি-যোধনম'— এ উপদেশটা আমাদের পক্ষে গ্রাহ্য নয়। সেকালে সকলেই যুগপৎ বাগ্‌যুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধ দুই কবতে পারত। কিন্তু এ কালে যারা বাগ্‌যুদ্ধ করে তারা বাহুযুদ্ধ করতে পারে না, আর যারা বাহুযুদ্ধ করতে পারে তারা বাগ্‌যুদ্ধ করতে পারে না। ইংরাজিতে যাকে বলে division of labour ইভলিউসনের প্রসাদে এ ক্ষেত্রে তা একদম [লুপ্ত?] হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে 'আমরা বাহুযুদ্ধ করব না, শুধু বাগ্‌যুদ্ধ করব' এ কথা বলা নিরর্থক। কেননা আমরা বাগ্‌যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করতে পারি নে। অতএব ভবিষ্যতে আমাদের বাক্‌সংযম করতে হবে কারণ কটু বাক্যের পরিবর্তে আমরা যদি চাটুবচন প্রয়োগ করি, তার ফলও সমান বিষময় হবে।

তারপর আমাদের এখন থেকে ভেবেচিন্তে কথা কইতে হবে। আর এমন সব কথার ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে যে-সব কথায় আমরা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করি। উদাহরণস্বরূপ একটি কথা নেওয়া যাক। আমরা খবরের কাগজে তারস্বরে প্রচার করছি যে কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে শুধু গুণ্ডারা। তাই যদি হয় ত গুণ্ডা শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক, অতি উদার হয়ে ওঠে। কারণ এ সত্য ত প্রত্যক্ষ যে যারা এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় যোগদান করেছে তারা যদি সব গুণ্ডা হয় ত ভারতবর্ষ হচ্ছে গুণ্ডার দেশ। কেননা যে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয় সেই যদি Indian হয়, তা হলে ভারতবর্ষে Indian-এর সংখ্যা নগণ্য মাত্র। বিশেষত যখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে গ্র্যাজুয়েটরাও সকলে Indian নয়— অনেকেই গুণ্ডা। যখন আমরা mass জেগেছে বলে আহ্লাদে আটখানা হই তখন কার জাগরণ

দেখে আমরা উৎফুল্ল হই— আজকে যাদের গুণ্ডা বলছি— তাদেরই। দরিদ্র নারায়ণ যে গদা প্রয়োগ করতে জানেন ও সে গদার এক আঘাতে আমাদের সব সুখস্বপ্ন যে একদম চুরমার করে ভেঙে দিতে পারেন গত ক'দিন উক্ত দেবতা তা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন।

ঐ ভীষ্মপর্বের প্রথমেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে দু'রকম পশু আছে, এক অরণ্য পশু আর এক গ্রাম্য পশু; এবং অরণ্য পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সিংহ আর গ্রাম্য পশুর মধ্যে মানুষ। মানুষ যে পশু এ জ্ঞান সেকালের লোকের ছিল। আমরা সে জ্ঞান হারিয়ে বসেছিলেম। গত কয়দিনের ঘটনা আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে মানুষ আসলে গ্রাম্য পশু।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সাহিত্যিক ফলাফল

সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্যের প্রভেদ কী এ ক'দিনে সেটা বেশ বোঝা গেছে।

সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় অশান্তির আবহাওয়ায়, কিন্তু সে আবহাওয়ার ভিতর সাহিত্যের হয় শুধু প্রণয়।

ইউরোপের গত যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের যে-রকম বাড় বেড়েছিল তার আব তুলনা নেই।

দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় সকল দেশেরই সংবাদপত্র ফুলে ঢাক হয়ে ওঠে। শান্তির সময় তারা হয় আবার ডুগডুগি।

কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে এ দেশেরও সংবাদ যে বেজায় প্রফুল্ল হয়েছে— তা বলাই বেশি।

আজকাল সকালবেলায় সংবাদপত্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনোরাজ্যে ঢুকে যায় কাল-বৈশাখী।

কলিকাতায় রাস্তাঘাটে হিন্দু-মুসলমানের জাপটাজাপটির ফলে অনেক নূতন সংবাদপত্র জন্মলাভ করেছে।

এই নবজাত সংবাদপত্র সব আজও চোখে দেখিনি, শুধু তাদের নাম শুনেছি।

এ সব নাম যে শুধু নূতন তাই নয়, এমন চমৎকার যে সে বিষয়ে দু'চার কথা না বলে থাকতে পারছি নে।

একখানির নাম 'দুর্ম্মুখ' আর তার পাঠক হচ্ছে দু'শ পঞ্চাশ জন এবং তাঁরা সবাই হচ্ছেন উচ্চ উচ্চশিক্ষিত।

বাঙলা দেশে 'দুর্ম্মুখে'র খদ্দেরেব ও উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে এত কম তার পরিচয় পেয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি।

আর একখানির নাম 'ছোলতান'। শুনতে পাই যে ও হচ্ছে 'সুলতানে'র শুদ্ধ সংস্করণ।

যুদ্ধ কী হিসেবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, না ফার্সি ব্যাকরণ অনুসারে?

সংস্কৃতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক! ফার্সি জবান অনুসারে ও বোধ হয় 'সুল', 'ছোল' হয় না।

শুনতে পাই ফার্সিতে 'সিন্' আছে, 'শিন্' আছে— কিন্তু 'ছিন' নেই। 'ছিন' যদি কোথাও থাকে ত আছে চীনে। সংস্কৃত ভাষাও আর্য ভাষা, ফার্সি ভাষাও তাই, ও-উভয়ের নিকটেই এ হেন চৈনিক আক্রমণ yellow peril বলে গণ্য হবে।

তবে এ বিষয়ে মোগল আমলের যদি নজির থাকে ত বাঙলায় এ শুদ্ধি গ্রাহ্য করতে হবে। এ বিষয়ে আমি একটি নজির দেখাচ্ছি যাতে করে মোগল আমলে সুলতানেরই অধিকার সাব্যস্ত হয়।

ওস্তাদদের মুখে একটি চমৎকার ছায়ানটের খেয়া[ল] হামেশা শোনা যায়।

তার কথা হচ্ছে এই : 'লাগি লগন সুলতান সলিম সোঁ।' এ গান যখন জাহাঙ্গিরের বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত হয়েছিল তখন তা নিশ্চয়ই গাওয়া হয়েছিল আকবর সাহের সভায় এবং তানসেন কর্তৃক।

উক্ত শুভলগ্নে মিঞা তানসেন যদি এই বলে গান ধরতেন যে— 'লাগি লগন ছোলতান ছলিম ছোঁ', তা হলে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে বলে উঠতেন 'ছো ছো'। কেননা তা হলে মুবারক বাদী comic song হয়ে উঠত।

কেউ কেউ বলেন যে 'ছ' আমদানি কবা হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে। তাই যদি হয়ে থাকে ত বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পূর্ববঙ্গের 'স'-এর উচ্চারণ বঙ্গ-সাহিত্যে চলবে না।

'ছ'-এর বিষয়ে এত কথা বল্লুম এই কারণ যে অক্ষরটি অত্যন্ত সংক্রামক। এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে অনেক হিন্দু পত্রিকাও এই 'ছ'-রোগগ্রস্ত হয়েছে। তারাও সত্য কথা বলতে উৎসুক হয়েছে।

আমার ভয় যে 'ছ' 'ছংবাদপত্রে' প্রশ্রয় পেয়ে শেষটা 'ছাহিত্যের' ঘাড়ে না চড়ে বসে।

ধর্মবিকারে প্রথম সাহিত্যিক ফল এই বর্ণ-বিভ্রাট।

বাঙলার কথা

ইংরাজেরা বলেন— The way to hell is paved with good resolutions, অর্থাৎ নরকের পথ সাধু সংকল্প দিয়ে বাঁধানো। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। যিনি মানুষ চেনেন তিনিই জানেন যে, মানুষে থেকে-থেকেই নানা রূপ সাধু সংকল্প করে, কিন্তু কাজে সে তা রাখতে পারে না। তার কারণ মানুষের ইচ্ছা, হয় তার প্রকৃতি, নয় তার শক্তির মাপকাটি নয়। শুধু সাংসারিক হিসেবে নয়, আধ্যাত্মিক হিসেবেও বড়লোক হবার সাধ আমাদের প্রায় সবারই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে মাঝারি গোছের লোক হবাব সামর্থ্য মাত্র আমাদেব প্রায় অনেকেরই আছে কিন্তু ষোল আনা ভাল কিম্বা ষোল আনা মন্দ হবার শক্তি আমাদের সকলের ধাতে নেই। এই কারণে আমাদের শুভ কামনা কামনা মাত্রই থেকে যায়— বড়জোর কথায় প্রকাশ পায়। বর্তমান যুগ সংবাদপত্র ও বক্তৃতার যুগ, এক-কথায় কথার যুগ; সুতরাং এ যুগে, আমাদেব মনে কোন রূপ ইচ্ছা উদয় হতে না হতেই তা কথায় পরিণত হয়। ফলে আমরা আমাদের অনেক কথা যে রাখতে পারি নে, তার কারণ, আমাদের মুখের কথা আমাদের মনের কথা নয়। এ যুগে আমরা যে জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলি তা নয়, তবে আমাদের অনেক কথাই যে মিছে নয়, তার কারণ আমরা আমাদের মন জানি নে এবং তা জানবার চেষ্টাও আমরা করি নে, কারণ সে চেষ্টা করতে হলে আমাদের কথা বলাটা মুলতুবি থেকে যায়। আমরা ভুলে গিয়েছি যে, বাসনা মনের একটা বিশেষ ধর্ম মাত্র, সমগ্র মন নয়। ভাঙা সাধু সংকল্প নরকের পথের খোয়া হোক আর নাই হোক, স্বর্গের যে সোপান নয়, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে। এই সহজ সত্যের জ্ঞান সেকালের লোকের ছিল। তাই ভারতচন্দ্র বলে গিয়েছেন— 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' এ কালের লোকের নেই বলে আমাদের কথা হচ্ছে 'ভাবনা উচিত নয় প্রতিজ্ঞা যখন।' সংস্কৃতের যুগে মীমাংসকেরা বলতেন, কথারও কেবল মাত্র কথা হিসেবেই একটা শক্তি আছে, আমাদের বিশ্বাসও তাই। তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইটুকু যে, তাঁরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আমরা করি বক্তৃতা-শক্তিতে।

২

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাটা, যে প্রতিজ্ঞা ভাঙে সে ছাড়া অপর কেউই পছন্দ করে না। ব্যাপারটা সেকালে ছিল নিন্দনীয়, এ কালে হয়েছে হাস্যাস্পদ। তারপর ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে যে-কাজ নিন্দনীয়— জাতিবিশেষের পক্ষে সে কাজ যে প্রশস্য, এ মতের মাহাত্ম্য আমি অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারিনি। কাজেই আমাকে কংগ্রেসের Non-Cooperation Resolution সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে— 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' উক্ত সংকল্প যে মুখের কথাই রয়ে গেছে, কাজে পরিণত হচ্ছে না, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, তার প্রমাণের আবশ্যক নেই। উক্ত রিজলিউ-শনের সাতটি দফার ভিতর পাঁচটি ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট দুটির মধ্যে, যেটি অবলম্বনে কোন রূপ স্বার্থত্যাগ নেই, অর্থাৎ কাউন্সিল বয়কট করা, এক জাতের পলিটিসিয়ানরা সেইটি শিরোধার্য করে নিঃস্বার্থ পেট্রিয়-টিজমের পরিচয় দিচ্ছেন। তারপর মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা মহম্মদ আলি আর মৌলানা শৌকত আলি স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের বার করে আনবার চেষ্টায় ফিরছেন। স্কুল-কলেজের দ্বারস্থ না হয়ে এঁরা যদি আইন-আদালতের দ্বারস্থ হয়ে উকিলবাবুদের সে স্থান থেকে বহিষ্কৃত করতে চেষ্টা করতেন, তা হলে আমি সত্য সত্যই খুশি হতুম। তাতে আর কিছু না হোক— আমাদের পলিটিক্স উকিলি বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেত। ছেলেদের স্কুল-কলেজ ছাড়িয়ে নিলে তাদের জন্য আবার স্কুল-কলেজ তয়ের করতে হবে, তার জন্য ঢের কাঠ-খড় চাই, শুধু কাঠ-খড় নয় ঢের ভাবনাচিন্তেও চাই। স্কুল-কলেজ ভাঙতে যে খুশি সেই পারে কিন্তু ও-সব জিনিস গড়তে পারে শুধু সেই সব লোক, যারা শিক্ষা বিষয়ে ব্যবসায়ী ও কারিগর। মনে রাখবেন শিক্ষা জিনিসটে একসঙ্গে বিজ্ঞান ও আর্ট। স্কুলের বাড়ি গড়ার চাইতে স্কুল গড়া কিছু কম শক্ত নয়। যাঁরা পলিটিক্সে হাত পাকিয়েছেন তাঁরা নিজহাতে একটা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন না, দেখতে পাবেন যে, সে আলয় অর্ধেক উঠতে না উঠতেই ভেঙে পড়বে।

৩

কংগ্রেসের উক্ত রিজলিউসনের বিরুদ্ধে বাঙালি যে ভোট করেছিল তার কারণ বোধ হয় বাঙালির মনের ভিতর এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, তারা উক্ত প্রস্তাব মুখে গ্রাহ্য করলেও কাজে অমান্য করতে বাধ্য হবে। এ ধারণা তাদের মনে জন্মানো অসম্ভব নয়। গত পনেরো বৎসর ধরে যে বাঙালি কঠোর রাজ-নৈতিক স্কুলে মানুষ হয়েছে তাতে আশা করা যায়, তার বাহ্যজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান দুই-ই কতকটা বেড়ে গিয়েছে। প্রবৃত্তি ও শক্তির ব্যবধানের জ্ঞানটা আত্মজ্ঞানেরই অংশ, আর কার্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞানটা বাহ্যজ্ঞানের অংশ। সুতরাং মৌলানা আজাদ

কালাম-কল্পিত এবং মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রচারিত উক্ত রিজলিউসন শিরোধার্য করবার পক্ষে সম্ভবত বাঙালির মস্তক প্রতিবাদী হয়েছিল।

কিন্তু আমি ইতিমধ্যে প্রমাণ পেয়েছি যে অপর প্রদেশের কংগ্রেসি নেতাদের মতে বাঙালির মস্তিষ্কের অসদ্ভাব নয়, বাঙালির হৃদয়ের অভাবই হচ্ছে আমাদের পশ্চাৎপদ হবার কারণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি এ বিষয়ে বাকি ভারতবর্ষের কংগ্রেসি পলিটিসিয়ানরা একমত।

কেন যে আমরা পিছু হটলাম, তার কারণ কোন বড় বড় বিদেশি নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। সে প্রশ্নের ভিতর একটা স্পষ্ট তিরস্কারের সুর ছিল। আমি যথাসাধ্য স্বজাতির হয়ে সাফাই সাক্ষী দিতে চেষ্টা করেছি। তার ফলে তাঁরা আরও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'তোমরা বাঙালিরা নিজের অহঙ্কারেই মারা গেলে, তোমরা ভাবো যে বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোন দেশ নেই আর বাঙালি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ মানুষ নয়।' এ কথার অবশ্য উত্তর এই যে— বাঙালির ভিতর যদি পদার্থ না থাকে তা হলে বাঙালিকে দলে টানবার এত চেষ্টা কেন? বাকি ভারতবর্ষ যদি ছ'মাসে স্বরাজ লাভ করে তা হলে আমরা সেই স্বরাট-ভারতবর্ষের কেরানিগিরি করব, আর তোমরা যদি স্বাধীন ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষার পাট একেবারে তুলে না দেও তা হলে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে স্কুলমাস্টারি করব— আর যদি স্বরাট-ভারতবর্ষে সংবাদ বলে কোন জিনিস থাকতে দাও তা হলে তারও এডিটারি করব।

আর তোমাদের সৃষ্ট কৃষ্ট-ব্যুরোক্রাসি যদি ভারতবর্ষে আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আনে, তা হলে আমাদের ছেলেরা আতসবাজি তৈরি করবে, আর কোন কারণে না-হোক সমগ্র ভারতবর্ষকে একটু আলোর চেহারা দেখিয়ে দেবার জন্য। এ সব কথা তাঁদের শোনাইনি, কেননা ভয় ছিল, হয়তো ও-কথা শুনে তাঁরা খুশি হবেন না। অগত্যা বাঙালি যে একদম মরে যায়নি, এই কথাটা নানা রকম যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

সে সব যুক্তিতর্কের আর পুনরুল্লেখ করব না। এই কয় বৎসর ধরে লেখা-লেখির ফলে আমার একটি জ্ঞানলাভ হয়েছে। বাঙালির বিদ্যাবুদ্ধির নিন্দে করলে একদল বাঙালি যেমন ভারি চটে যায় তেমনি তার চাইতে ঢের বেশি চটে যায় আর একদল বাঙালি যদি তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করা যায়। তাঁরা মনে করেন ও-রূপ প্রশংসায় প্রকারান্তরে তাদের মহাপ্রাণতা অস্বীকার করা হয়। হিন্দিতে একটি গান আছে যার প্রথম চরণ এই, 'মাতোয়ারা হুয়া ত কেয়া হুয়া, বাউরা হুয়া ত কেয়া হুয়া।' গায়ক প্রশ্ন করছেন, 'মাতাল হয়েছি ত কী হয়েছে, পাগল হয়েছি ত কী হয়েছে'? উত্তর অবশ্য খুব ভালো হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি প্রেমের গান। যে ভালোবাসায় মানুষ মাতাল না হয়, পাগল না হয়, সে ভালোবাসার আর তেজ

কী? আমাদের স্বদেশপ্রেমের কারবারিরাও প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরাও স্বদেশ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন, বাউরা হয়েছেন, অতএব তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান আছে এ অপবাদ তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না। যাঁরা সত্য সত্যই কোন ভাবের নেশায় চুর হয়েছেন, তাঁদের আমি যত ভয় না করি তার চাইতে ঢের বেশি ভক্তি করি। তাঁরা কে কী বলে তাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু ছেরেপ ভয় করি সেই সব লোককে, যাঁরা পেট্রিয়টিজমের বিলেতি মদ গোঁফে মেখে মাতাল সাজেন। এঁরা যা মুখে আসে তাই বলতে বাধ্য, নচেৎ তাঁরাও যে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা এ সত্য আর কী উপায়ে প্রমাণ করা যায়! এঁরাই হচ্ছেন দলে পুরু এবং এঁদের পেট্রিয়টিক উপদ্রব আমি পারৎপক্ষে এড়াতে চাই। সে যাই হোক— এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অন্য প্রদেশের পলিটিকাল নেতারা বাঙালিকে আজকের দিনে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখছেন।

৪

কংগ্রেসের রিজলিউসনের প্রসাদে বাঙালির যে ছুঁচো-ধরা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্বজনবিদিত। কিন্তু কী কারণে আমরা নন-কো-অপারেশন গিলতেও পারছি নে, ফেলতেও পারছি নে— তার কারণ আবিষ্কার করা আবশ্যক। কেননা আমাদের বর্তমান অবস্থাটা গৌরবেরও নয়, আরামেরও নয়।

আমরা কেন যে এই উভয় সঙ্কটে পড়েছি— তার খুব স্থূল কারণগুলি নির্ণয় করতে চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য যে, এখানে আমি আমার নিজের ধারণাই প্রকাশ করব, সে ধারণা অপরের সঙ্গে মিলতেও পারে না-ও মিলতে পারে।

উক্ত প্রস্তাবে যে আমরা মোহপ্রাপ্ত হইনি, তার কারণ ওর ভিতর নূতনত্বের মোহ নেই। ভাবের নেশায় পাগল হতে বাঙালি জানে ও চায়ও। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আবার মোরে পাগল করে দিবে কে?' মনের এ সাধ রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিরও আছে, আমরা চিরজীবন শুধু লাভ-লোকসানের হিসেব-কিতেব নিয়ে থাকতে পারি নে, আমরা আর যা হই, মাড়োয়ারি নই। কিন্তু তিনি যত বড়ই প্রেমিক হন না কেন, একই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ফিরে ফিরতি দু'বার ভালবাসায় পড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়; বিশেষত সে ভালবাসার সকল আনন্দ সকল বেদনা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ আর ভোগ যে করেছে তার পক্ষে ত নয়ই। আমাদের সেই পুরনো ভাব যদি নূতন রূপ ধরে আসত তা হলেই হয়ত আমাদের ক্ষণিকের জন্যও ভোলাতে পারত। কিন্তু এসেছে শুধু নূতন নাম ধরে। যা ছিল 'স্বদেশি', তাই হয়েছে Non-co-operation. ভাষান্তরে অবশ্য তার যথেষ্ট রূপান্তরও ঘটেছে কিন্তু সে বিরূপতার দিকে। বাঙলার পদ্য— অ-বাঙালির হাতে পড়ে গদ্য হয়ে উঠেছে। এই Non-co-operation-এর ভিতর যদি কিছু থাকে ত ছেরেপ

পলিটিক্স— আব তার ভিতর যা আদপে নেই তা হচ্ছে idealism, অবশ্য যদি reality-কে অস্বীকার করার নাম idealism না হয়। বাঙলার স্বদেশীয়তার গায়ে রূপ ছিল রঙ ছিল, তার অন্তরে কল্পনা ছিল কবিত্ব ছিল। আমাদের স্বদেশি মনের ভিতর একমাত্র পলিটিকাল বিদ্বেষের তীব্রতা ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল একটা আনন্দ ব্যাকুলতা। তাই না সেদিন বাঙলার স্বদেশি সহস্র গানে মুখরিত, শত ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। Non-co-operation সম্বন্ধে কেউ একটি কবিতা লিখতে চেষ্টা করে দেখুন ত কী ফল দাঁড়ায়? তারপর তার সঙ্গে সুর সংযোগ করে একবার দেশের লোককে শোনান। দেখতে পাবেন বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হাসির বন্যায় ভেসে যাবে। Non-co-operation-এ যে আমাদের নেশা ধরছে না, তার কাবণ ও-বস্তু জাতীয় ভাবের সুরা নয়। আজ পনেরো বৎসর পূর্বে যে-ভাবের আন্দোলনে বাঙলার মন মথিত হয়েছিল তাতে করে সে মনের ভিতর হলাহল ও অমৃত দুই-ই উত্থিত হয়েছিল। আর ও-দুয়ের মিশ্রণে যা জন্মলাভ করে তারই নাম না সুরা!

অপর পক্ষে Non-co-operation হচ্ছে জাতীয় সর্বরোগের মহৌষধ। ও-ঔষধ সেবন করা মাত্র আমরা নাকি যুগপৎ সুস্থ সবল মহাপ্রাণ মহাজ্ঞান স্বরাট ও বিরাট হয়ে উঠব। সম্ভবত তাই হব। কিন্তু ঔষধ সহজে কেউ গিলতে চায় না। তাই কংগ্রেসের হাকিম-কবিরাজেরা জোর করে দেশের লোককে তা গেলাতে চাচ্ছেন।

৫

আমার বাঙালি পেট্রিয়টিজম যতই প্রবৃদ্ধ হোক, আমি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের প্রতি অপর জাতির এই অবজ্ঞা অযথা হলেও অভক্তি অমূলক নয়। জীবনের যে-কোন কর্মক্ষেত্রে আমাদের এক পক্ষ না আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। যে-জাতি কার্যকালে মনস্থির করতে পারে না, সে জাতির উপর কেউ নির্ভর করতে পারে না। আর এই কংগ্রেসের Non-co-operation রিজলিউসন নিয়ে আমরা অসামান্য অব্যবস্থিতচিত্ততার প্রমাণ দিয়েছি।

গত কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই জানেন, বাঙালি ডেলিগেট-দের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন Non-co-operation-এর বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই বিরুদ্ধমতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। আমাদের নেতৃবৃন্দ এ ক্ষেত্রে দু'নৌকোয় পা দিয়েছিলেন, কাজেও অপদস্থ হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর রিজলিউসনকে চাপা দেবার জন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে-amendment খাড়া করেন, সে amendment-এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সূত্রে কংগ্রেসকে ভোগা দিয়ে, মহাত্মা গান্ধীর রিজলিউসনটিকে এ ফেরা মুলতুবি রাখা। উকিলি বুদ্ধি রাজ-নীতির ক্ষেত্রে সব সময়ে খাটে না, এবং এ ক্ষেত্রে খাটবার কোন সম্ভাবনা ছিল

না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রস্তাবের মাহাত্ম্যে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, অপর পক্ষে বাঙলার তরফ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবের মাহাত্ম্যে যে-কোন বাঙালি বিশ্বাস করেননি, এবং স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পালও যে করেননি, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। যদি প্রথমে উক্ত amendment এবং তৎপরে উক্ত রিজলিউসন সম্বন্ধে ভোট নেওয়া হত, তা হলে আমার বিশ্বাস অধিকাংশ বাঙালি উক্ত উভয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দিতেন। ফলে শুধু যে বাঙলার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল তাই নয়, বাঙালি বেয়কুবও বনে গেল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব আমরা যদি ষোল আনা গ্রাহ্য করতে পারতুম কিম্বা ষোল আনা অগ্রাহ্য করতে পারতুম তা হলে বাকি ভারতবর্ষের কাছে আমরা এতটা খেলো হয়ে পড়তুম না। যে-ক্ষেত্রে রফাছাড়ের প্রাসাদে উভয় পক্ষের ভিতর আপোষ মীমাংসার কোন রূপ সম্ভাবনা নেই, সেখানে সুবুদ্ধিব কাজ হচ্ছে— নিজের কোট ষোল আনা বজায় রাখবার চেষ্টা করা। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতের এক চুলও পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, সমগ্র কংগ্রেস যদি তাঁর বিরুদ্ধেও যায় তা হলে তিনি তাঁর Non-co-operation-এর ধর্ম প্রচার করবেনই এবং দেশসুদ্ধ লোককে সেই ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করবেন। যে-ব্যক্তির কাছে সমগ্র কংগ্রেসের মত তুচ্ছ এবং নগণ্য, অবশ্য সে মত যদি তাঁর মতের তিল মাত্রও বিরোধী হয়, সে ব্যক্তির কাছে হয় মাথা নিচু করা, নয় তাঁর সমুখে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া অপর কোন ভঙ্গি অবলম্বন করা যেমন নিরর্থক তেমনি হাস্যকর।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, অধিকাংশ বাঙালিই মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত Non-co-operation-এর বিরোধী পক্ষ ছিলেন তা হলে বাঙলার কর্তব্য ছিল, উক্ত প্রস্তাব আদ্যোপান্ত প্রত্যাখ্যান করা। তা হলে আর যাই হোক বাকি ভারতবর্ষ আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখত না, এবং তারপর বাঙলাকে পলিটিকালি একঘরেও করে দিত না। কেননা আজকের দিনে বাঙলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজমের অভিনয় করা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করারই তুল্য।

তবে গত কংগ্রেসে বাঙলা যে শ্যাম ও কুল দুই রাখবার বৃথা চেষ্টা করেছিল, এখন বুঝছি তার কারণ বাঙালি আজ নিজের মন জানে না, অতএব এ ক্ষেত্রে তার হয় এদিক, না হয় ওদিক, কোন দিকেই মনস্থির করা সম্ভব ছিল না।

পলিটিকাল হিসেবে— আমরা যে কত দূর অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে পড়েছি তার প্রমাণ, যাঁরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরাই আবার উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরা কেন যে এই রূপ উলটো ডিগবাজি খেলেন, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ অদ্যাবধি তাঁরা দেখাতে পারছেন না। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যা সব লেখালিখি চলছে তার তুল্য হ য ব র ল দেশে

ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায়নি। এতে আশ্চর্য হবার বাঙলা কোন কারণ নেই। ডিক্রি, যদি রায়ের ঠিক উলটো করতে হয় তা হলে তার সঙ্গত কারণ দেখানো উকিলি বুদ্ধিতেও কুলোয় না। এই দেখুন না, যাঁরা বলছেন যে কংগ্রেসের রিজলিউসন, কংগ্রেসের রিজলিউসন বলেই মান্য, তাঁরা নিজে আদালত বয়কট না করে অপর সকলকে কাউন্সিল বয়কট করবার জন্য তাড়না করছেন। কথায় ও কাজের এতাদৃশ গরমিল এ দেশেও ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

বাঙলার 'স্বদেশি' কিন্তু কোন বাঙালিকে জোর করে গেলাতে হয়নি। কংগ্রেসের মতো ভাড়াটে ভোটারের সাহায্যে রিজলিউসন পাস কবে, আমরা স্বদেশি আন্দোলন শুরু করিনি। আমরা আগে সে আন্দোলন পুরো মাত্রায় চালিয়ে তার পর কংগ্রেসে রায় ও সই নিতে চেয়েছিলুম। ফল কী হয়েছিল তা ত সুরাট কংগ্রেসের কথা স্মরণ করলেই মনে পড়বে।

অতএব নির্ভয়ে বলা যায় যে 'স্বদেশি' ব্যাপারটা ছিল যেমন স্বাভাবিক, Non-co-operation বস্তুটা তেমনি কৃত্রিম। কংগ্রেসে রিজলিউসন পাস করে, তার প্রভাবে দেশের লোকের মন গড়ে তোলবার চেষ্টা তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা মানুষের মন কী বস্তু জানেন না, এবং যাঁদের বিশ্বাস— মনের নিজের কোন শক্তি গতি কি ধর্ম নেই, অতএব যে উপায়ে জড় পদার্থের রূপান্তর ঘটানো যায় সেই উপায়ে মনেরও রূপান্তর ঘটানো যায়, অর্থাৎ— বাইরের চাপে এই materialistic প্রচেষ্টার ফলে যা জন্মলাভ করে তার নাম হুজুগ, অর্থাৎ— তাতে লোকের মনে ক্ষণিক চাঞ্চল্য এনে দিতে পারে কিন্তু তার কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

স্বদেশি বাঙলার ঘাড়ে কেউ চাপিয়ে দেয়নি, বাঙালির মন থেকে তা স্বত-উদ্ভূত হয়েছিল। গত এক শতাব্দী ধরে আমাদের জাতের মনের কোন নিভৃত কোণে যে-ভাবের বীজ, বাঙালি মনের রসে ও তেজে পুষ্ট হচ্ছিল, স্বদেশি যুগে সেই ভাব ফুলের মতো ফুটে উঠেছিল আর তার বর্ণে গন্ধে দেশের মন-প্রাণকে মাতিয়ে তুলেছিল। সে ফুল আজ ঝরে গিয়েছে কিন্তু তার রস আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছে, তার বর্ণ গন্ধ আমাদের মনের ভিতর সঞ্চিত রয়েছে। স্বদেশি আন্দোলন থেমে গিয়েছে কিন্তু তার ফলে দেশের মনকে স্থায়ী ভাবে স্বদেশি করে রেখে গিয়েছে। প্রকৃত ফুলের সঙ্গে কাগজের ফুলের যে-প্রভেদ স্বদেশির সঙ্গে Non-co-operation-এর সেই প্রভেদ। তাই এই কাগজের ফুল পুজোর ফুল বলে আমরা শিরোধার্য করতে পারছি নে।

এখন ভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথায় আসা যাক। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত Non-co-operation-এর যদি কোন রূপ সার্থকতা থাকে ত সে practical হিসেবে। নগদ বিদায়ের লোভে যে-কাজে হাত দেওয়া যায় তা যে ideal কাজ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের একটা বিরাট লোভ দেখাচ্ছেন। আমরা যদি নির্বিচারে তাঁর কথা শুনে চলি তা হলে বছর না পেরুতে তিনি আমাদের স্বরাজ দান করবেন। কোন রূপ দাম না দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের হাজার বৎসরের হারানো স্বরাজ লাভ করতে কে না রাজি? উপাধি ছাড়া, স্কুল ছাড়া আর ওকালতি ছাড়ার ভিতর কোন রূপ পৌরুষ থাকলেও ত পৃথিবীর লোক আজ পর্যন্ত তাকে বীরত্ব বলতে শেখেনি। আমার কানে এ হেন কথা রূপকথার মতো শোনায়। তবে এ দেশে এ কালে সম্ভব ও অসম্ভবের ভেদজ্ঞান থাকাটা একটা দোষের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং কিছুই অসম্ভব নয়; এ কথা মেনে নিয়েও কথাটা কত দূর অসম্ভব তার কিঞ্চিৎ আলোচনা না করে আমি থাকতে পারছি নে। কিন্তু এ স্থলে আমি বলে রাখি যে, আমি মনে মনে কামনা করছি যে মহাত্মা গান্ধীর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাঁর হাত-তোলা স্বরাজ্য আসছে বছর আমরা যেন দানে পাই। আপাতত বিচার শুরু করা যাক।

সংকল্প মাত্রেরই জন্মের একটা না-একটা কারণ আছে। এই Non-co-operation সংকল্পের জন্মের কারণটা কী? জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড, না তুর্কির সুলতানের সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ? যদি কেউ বলেন যে এ দুই-ই, তা হলেও প্রশ্ন ওঠে, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ, কেননা একসঙ্গে ও-দুইকে মেলানো যায় না, এক গোঁজামিলন দেওয়া ছাড়া। যেহেতু ও-দুটির জন্ম হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব থেকে। একটির মূলে আছে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মবুদ্ধি আর একটির মূলে আছে সমগ্র ভারতবাসীর পলিটিকাল বুদ্ধি। দ্বিতীয়টি বিচারসাপেক্ষ, প্রথমটি নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ হচ্ছে আমার ধর্মের কথা তা হলে আমাদের নীরব থাকতে হয়। কেননা সে স্থলে কোন রূপ তর্ক তুলতে গেলে, তাঁর ধর্মজ্ঞানে আঘাত লাগতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, খিলাফৎ সম্বন্ধে বিচার করবার আমাদের কোন রূপ অধিকার নেই। কিন্তু মুখে বিচার করবার অধিকার না থাক, মনে মনে আলোচনা করবার অধিকারে ত কেউ বঞ্চিত নয়। তুর্কির সুলতানের গোটা সাম্রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত কি না সে বিচার অবশ্য আমরাও করতে পারি কিন্তু সে একমাত্র পলিটিকাল হিসেবে, ভারতবর্ষের লাভ-লোকসানের দিকে লক্ষ রেখে। এবং সেই পলিটিক্যাল বিচার তুললে আমাদের পরস্পরের মত-ভেদ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়, এবং তা হলেই আমাদের মধ্যে মনান্তর ঘটবারও সম্ভাবনা।

তবে এ সত্যটি প্রত্যক্ষ যে, Indian Nationalism এবং Pan-Islamism এক মনোভাব নয়। একটির মূলে আছে স্বদেশ-বাৎসল্য, আর একটির মূলে আছে স্বজাতি-বাৎসল্য। Indian Nationalism-এর স্বদেশ বাৎসল্য হচ্ছে বর্ণ ধর্ম নির্বিচারে স্বদেশি বাৎসল্য আর Pan-Islamism-এর স্বজাতি বাৎসল্য হচ্ছে স্বদেশি বিদেশি

নির্বিচারে স্বধর্মী বাৎসল্য। জাতীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে, এ দুয়ের পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, কাউকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

অবশ্য এমন কথা আমি বলি নে যে, কংগ্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সহৃদয়তা আদপেই নেই। ভারতবর্ষের মুসলমানের পক্ষে ন্যাশনালিস্ট হওয়াব কোন বাধা নেই, কেননা পলিটিকাল হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক, অপর পক্ষে হিন্দুদের পক্ষে খিলাফৎ-বিষয়ে মুসলমানদের ব্যথার ব্যথী হওয়াও স্বাভাবিক। কেননা আমাদের উভয়ের মধ্যে একমাত্র স্বার্থের নয়, সমবেদনারও বন্ধন আছে। আমার বক্তব্য এই যে, পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে গেলে পলিটিকাল সমস্যার পলিটিকাল মীমাংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্মের যোগ করাটা পৃথিবীর সকল দেশেই বিপজ্জনক এবং আমাদের এই নানা ধর্মের দেশে বিশেষ আশঙ্কার কথা। পাঠক মনে রাখবেন যে পলিটিক্স ব্যাপারটা হচ্ছে আগাগোড়া সাংসারিক। তারপর আমার জিজ্ঞাসা এই যে ইংবাজ-রাজের সাহায্য ব্যতীত এই দুই বিষয়ে কি আশু প্রতিকার হতে পারে? এ দুই ক্ষেত্রে ইংরেজ-রাজ কোন রূপ প্রতিকার করেননি বলেই ত আমাদের এই অভিমান।

৬

সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর কথা এই যে, স্বরাজ্যলাভই হচ্ছে Non-co-operation-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পঞ্জাবের ও তুর্কির প্রতি ইংরাজের ব্যবহার আমাদের শুধু এই বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে মাত্র।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত দুই ঘটনা যদি না ঘটত তা হলে কি স্বরাজের পুরো দাবি আমাদের পক্ষে করাটা, হয় অন্যায় নয় অনাবশ্যক হত? মনে রাখবেন— স্বরাজের কথাটা স্বদেশি যুগেও ওঠে এবং সে গত যুদ্ধের বহু পূর্বে।

এর উত্তর অবশ্য এই যে, পূর্বে স্বরাজলাভের আমাদের ত্বর সইত, এই দুই ঘটনার পর আর ত্বর সয় না। মেনে নেওয়া যাক যে আমাদের মনের অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, ছ'মাসে স্বরাজলাভের পক্ষে Non-co-operation যথার্থ উপায় কি না?

দু'শ-চারশ উপাধিকারীর উপাধি ত্যাগ, পাঁচ-সাত হাজার উকিলের ওকালতি ত্যাগ এবং লাখ-দেড় লাখ ছেলের স্কুল ত্যাগের ফলে এ দেশ থেকে ইংরাজ বণিকও চলে যাবে না, ইংরাজ সৈনিকও চলে যাবে না। অতএব Non-co-operation-এর প্রসাদে কী রকম স্বরাজ যে আমরা লাভ করব তা আমার কল্পনার অতীত। তবে এ কথা নিশ্চয় যে সে স্বরাজ দাদাভাই-কল্পিত স্বরাজ নয়, স্বাধীনতাও নয়। স্বদেশি যুগে লোকে যাকে Self Government within the Empire বলত, তা লাভ

করতে হলে ইংরাজ-রাজের সংস্রব ত্যাগ করবার কথা ওঠে না— আর যাকে Autonomy outside the Empire বলত, তা লাভ করবার জন্য না হোক, অন্তত রক্ষা করবার জন্য army এবং navy চাই। বলা বাহুল্য যে— ছ'মাসে আর যাই করা হোক, army এবং navy আমরা গড়তে পারব না, অন্তত Non-co-operation-এর সাহায্যে ত নয়ই। স্কুল-পালানো ছেলেরা সৈনিক হলেও হতে পারে, কিন্তু আদালত-পালানো উকিলবাবুরা যে General এবং উপাধিত্যাগীরা যে Admiral হবেন, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Non-co-operation-এর যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে ইংরাজ-রাজকে চালমাৎ করা। বলা বাহুল্য যে বিপক্ষকে চালমাৎ করবার জন্য কেউ খেলা শুরু করে না, ও হঠাৎই হয়, এবং ও হচ্ছে হারেরই সামিল। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারদের' নিয়ে কংগ্রেস করা চলতে পারে কিন্তু স্বরাজ্য সৃষ্টি স্থিতি করা চলে না। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে মহাত্মা গান্ধী যে স্বরাজের লোভ আমাদের দেখাচ্ছেন তাতে যে আমরা তাদৃশ প্রলোভিত হচ্ছি নে তার কারণ সে স্বরাজের স্বরূপ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এক কথায় Non-co-operation-এর প্রস্তাব গ্রাহ্য করার পক্ষে আমাদের প্রধান বাধা intellectual বাধা। যার intellect-এর বালাই নেই তার পক্ষে উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য করা যত সহজ বাঙালির পক্ষে তত সহজ নয়। বাঙালি যে intellectual জাত এ সত্য তার মহাশত্রুও অস্বীকার করে না।

এই সব কারণেই আমার বিশ্বাস, বাঙালি Non-co-operation গিলতে পারছে না।

৭

অপর পক্ষে তারা যে তা ফেলতেও পারছে না, তার কারণ, আমাদের বর্তমান অবস্থায় কী করা কর্তব্য সে বিষয়ে বাঙালির কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

পঞ্জাবের উপর অত্যাচারের কী প্রতিকার করা যায় তাই স্থির করবার জন্যেই সেদিন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। জেনেরাল Dyer জালিয়ানাবাগের খোঁয়াড়ে পুরে যদি দশ হাজার বাঁদরের উপর গুলি চালাতেন তা হলে তাঁর এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। এবং আমার বিশ্বাস যে তা হলে House of Commons ও House of Lords তাঁকে মহাবীর বলে পূজা করতে ইতস্তত করতেন, এমনকী হয়ত তাঁকে শাস্তিও দিতে পারতেন, কেননা ইউরোপীয় সভ্যতা Cruelty to animals-এর ভয়ঙ্কর বিরোধী। ঘটনা যে ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সেই সভ্যতার কাছে ভারতবাসীর জীবনের মূল্য পশুর জীবনের চাইতেও ঢের কম। এর পর, ভারতবাসীরা একত্র হয়ে যদি এই মর্মের একটি রিজলিউসন পাস করতেন যে, উক্ত ঘটনা তাঁদের অতি মনোকষ্টের কারণ

হয়েছে, যেহেতু এ কার্য ইংরাজ-চরিত্র এবং ইংরাজি-সভ্যতার উপযুক্ত হয়নি, তা হলে সেটা যে ভারতবাসীর পক্ষে খুব গৌরবের কাজ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য। অতএব গত কংগ্রেস যদি কোন কাজের কথা বলতে না পারত তা হলে কংগ্রেসের উক্ত বৈঠক বসাবার কোন আবশ্যক ছিল না। মহাত্মা গান্ধী যা হোক এমন একটি প্রস্তাব তুলেছেন যা মেনে নিতে নিলে দেশের লোককে কিছু করতে হবে, আর কিছু না-হোক কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। অপর পক্ষে সে ক্ষেত্রে কি বাঙালি কি মারহাট্টি কোন কাজের কথা বলতে পারেননি। উক্ত প্রস্তাব ছিল একমাত্র প্রস্তাব, তাই ওটিকে একেবারে ফেলাও কঠিন। মহাত্মা গান্ধী আর কিছু না করুন, দেশের লোককে এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে. যাঁরা স্বরাজের জন্য চিৎকার করছেন, তাঁদের তা লাভের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশের পলিটিক্স যে কত শূন্যগর্ভ, অর্থাৎ— আমাদের বড় কথার পিছনে যে বড় বড় মন বড় বড় চরিত্র নেই, এই সত্যটিই মহাত্মা গান্ধী দেশের লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেও দেশেব লোক মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তাদের বিশ্বাস যে এই সূত্রে আমাদের পেট্রিয়টিজমের পরীক্ষা হয়ে যাবে।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কোন জাতের পক্ষে বহুদিন ধরে দো-মনা করাটা, তার কি আত্মা কি স্বার্থ, কিছুরই পক্ষে শ্রেয় নয়। অতএব বাঙালি পলিটিকালি তার মনস্থির করেছে এর পরিচয় পেলে খুশি হব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, Non-co-operation-এর পক্ষ কিম্বা বিপক্ষ হওয়ার কোন লাভ নেই। উক্ত প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে আমরা নিজেদের ভিতর শুধু নূতন দলাদলির সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারব না— আর বিপক্ষ হলে যেমন নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছি তেমনি থাকব।

আসল কথা এই যে, কংগ্রেসি পলিটিক্সের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ব্যুরো-ক্রাসির মামলা আর বেশি দিন চালানো যাবে না। ভবিষ্যৎ পলিটিক্সে bourgeois-র একাধিপত্য আর থাকবে না, কেননা পৃথিবীময় demos জেগে উঠেছে। আজকের দিনে, এ জ্ঞান আমাদের হওয়া উচিত যে, পতিত ভারত উদ্ধারের আসল কথা হচ্ছে ভারতের পতিত উদ্ধার।

আ গা মী ক ং গ্রে স

১

আগামী কংগ্রেস কী মূর্তি ধারণ করবে, তা জানবার জন্য দেখছি আজকের দিনে অনেকেই উৎসুক। আমাদের পলিটিকাল নিকট-ভবিষ্যৎ যে কংগ্রেসের মতিগতির উপর অনেকটা নির্ভর করবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলুক আর না-ই মিলুক, এ সত্য আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি নে যে, দেশের বর্তমান পলিটিকাল অবস্থায় কংগ্রেস হচ্ছে একমাত্র লৌকিক প্রতিষ্ঠান এবং কালক্রমে সে প্রতিষ্ঠান এতটা শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, আজকে কংগ্রেসকে দেশের রাজা-প্রজা কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না।

২

কংগ্রেসের কী করা উচিত, সে বিষয়ে নানা লোকের নানা মত আছে এবং সেই সব বিভিন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর-বিরোধী মত লোকে নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে এবং সেই সব মতের দ্বারা কংগ্রেস অবশ্য কতকটা চালিত হবে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত মতের প্রভাব কংগ্রেসের উপর যে খুব বেশি হবে, এ রূপ আশা করা অন্যায়। কেননা, কংগ্রেস পরের মতের দ্বারা ততটা চালিত হবে না, যতটা হবে দেশের বর্তমান অবস্থার দ্বারা। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করাই হচ্ছে পলিটিক্সের ধর্ম, আর কংগ্রেস হচ্ছে একটি পলিটিকাল সঙ্ঘ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা অনুমান করবার জন্য কংগ্রেসের অতীতের জ্ঞান আমাদের থাকা দরকার। এই বিশ্বাসে আমি সংক্ষেপে কংগ্রেসের ইতিহাস সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

৩

'ইলবার্ট বিল' নিয়ে দেশে যে-আন্দোলন হয়েছিল— তারই ফলে কংগ্রেস জন্ম-লাভ করে। মিস্টার হিউম জনকতক উচ্চপদস্থ উকিল ব্যারিস্টার প্রভৃতিকে একত্র করে বোম্বাই শহরে প্রথমে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, তার পরের বৎসর

কলিকাতায় তার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, তার পর দু'চার বৎসরের ভিতরই কংগ্রেস দেশের সর্বপ্রধান পলিটিকাল সঙ্ঘ হয়ে ওঠে। ঐটি হল দেশের একমাত্র পলিটিকাল মিলনক্ষেত্র; এবং এই হিসাবেই তা দেশের লোকের প্রীতি আকর্ষণ করলে। তারপর সেকালের গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের বিরোধী হওয়ায় সেটিকে বজায় রাখবার ও তার শ্রীবৃদ্ধি করবার জিদও বহু লোকের মনে জন্মলাভ করলে।

এই আদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, গভর্নমেন্টকে লোকমত জানানো এবং গভর্নমেন্টের আইনকানুনের বিচার করা এবং এ কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন সব উচ্চপদস্থ ও ধনী— আইন-ব্যবসায়ীর দল। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিশেষ আইন সম্বন্ধে আমরা আমাদের আপত্তি জানালে, সে আপত্তি গভর্নমেন্ট মঞ্জুর করবেন এবং কোন বিষয়ে প্রজারা দুঃখ জানালে, গভর্নমেন্ট সে দুঃখের প্রতিকার করবেন। সংক্ষেপে তাঁদের ধারণা ছিল যে, গভর্নমেন্ট হচ্ছে একটি হাইকোর্ট, অতএব কংগ্রেসের হওয়া কর্তব্য একটি বার লাইব্রেরি। সুতরাং সে যুগে বক্তৃতা করাই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র কার্য। ফলে বড় বড় বক্তারা সব বড় বড় কংগ্রেস-ওয়ালা হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের সম্যক্ পরিচয় লাভ করার পর গভর্নমেন্ট আর কংগ্রেসের প্রতিকূল থাকলেন না, এবং সত্য কথা বলতে গেলে তার প্রতি ঈষৎ অনুকূল হলেন। শেষটা দাঁড়াল এই যে, যাঁরা ওকালতিতে পয়সা করেছেন, তাঁরা একদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবার আশা মনে মনে পোষণ করতে লাগলেন, আর যাঁরা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁরা হাইকোর্টের জজ হবার আশায় রইলেন, কেননা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে হাইকোর্টের জজ করা গভর্নমেন্টের একটা অ-লিখিত আইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। শেষটা দেখা গেল যে, কংগ্রেসের দেহ আছে, কিন্তু তার প্রাণ নেই, আর তখন দেশের যুবকের দলের মনে কংগ্রেস সম্বন্ধে উৎসাহ কমে এল। এর পরও কংগ্রেস যে টিকে রইল, তার কারণ, কংগ্রেস ছাড়া দেশে আর কোন সর্বজনীন পলিটিকাল সঙ্ঘ নেই। তাই সকলেই কংগ্রেসকে ধরে থাকলেন ও বাঁচিয়ে রাখলেন। এই হল কংগ্রেসের প্রথম পর্ব।

তারপর যখন বুয়র যুদ্ধ হল, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, এই সূত্রে আমরা ইংলন্ডের নব ইম্পিরিয়ালিজমের পরিচয় লাভ করলুম। যে-বিশ্বাসের উপর পুরনো কংগ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিশ্বাস ভেঙে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে দেশে এল প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ। এর ফলে দেশের লোকের চোখ পড়ল দেশের ইকনমিক অবস্থার দিকে। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে দরিদ্র দেশ, এ কথা আর চাপা রইল না। আর বিদেশী গভর্নমেন্টই যে দেশের দারিদ্র্যের কারণ, Digby, নাওরাজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই মত, এই নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। যখন দেশের লোকের এই ধারণা হল যে, কংগ্রেস এত দিন তুচ্ছ

জিনিস নিয়ে বকাবকি করেছেন— যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে একমাত্র seperation of the executive and the judicial নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত হওয়াটা জাতির গোড়া কেটে তার আগায় জল দেওয়ারই সামিল। এই জ্ঞান হবা মাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে একটা অস্পষ্ট ও বিরাট অসন্তোষ জন্মলাভ করলে। লোকের মনের অবস্থা যখন এই, তখন বিলেতি ইম্পিরিয়ালিজমের অবতার Lord Curzon ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এ দেশে এলেন। তাঁর প্রতি কথা, প্রতি কাজ এই অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে তুলতে লাগল। শেষটা বঙ্গভঙ্গের পর বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠল। দেখা গেল, লোকের মনে একটা নতুন ভাব জন্মলাভ করেছে। দেশ উদ্ধার নিজ হাতে করতে হবে, এই বিশ্বাস লোকের মনে প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। এই সূত্রে কংগ্রেসে ফাট ধরল। কংগ্রেসের প্রাচীন দল প্রাচীন প্রোগ্রাম নিয়েই থাকতে চাইলেন। বাংলার নূতন প্রোগ্রাম অর্থাৎ বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও সালিসি পঞ্চায়েৎ, কংগ্রেসের অবাঙালি কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। এ বিরোধ কলিকাতা কংগ্রেসে শুরু হয়, কিন্তু কলিকাতায় তা বহু কষ্টে চাপা দেওয়া হয়। সুরাটে ঐ দু'দলের মতবিরোধ আর চাপা থাকল না; ফলে কংগ্রেস ভেঙে গেল; মডারেট ও extremist-এ বিচ্ছেদ ঘটল। কংগ্রেসে পলিটিকাল দক্ষিণ মার্গ ও বাম মার্গের সৃষ্টি হল। দক্ষিণমার্গীরা বামমার্গীদের কংগ্রেস হতে বহিষ্কৃত করে দিয়ে কংগ্রেসকে নিজেদের হস্তগত করলেন। এই সময়ে কংগ্রেস তার আইডিয়াল লিপিবদ্ধ করলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নাওরাজী বলেন— 'স্বরাজ' লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই 'স্বরাজ' শব্দটির যে দুটি অর্থ হতে পারে, তা সে যুগের খবরের কাগজ পড়লেই দেখতে পাবেন। এক দল বল্লেন যে, স্বরাজ অর্থ autonomy within the Empire. আর এক দল বল্লেন যে, ওর অর্থ autonomy without the Empire. যদিও বাইরে থেকে দেখতে স্বদেশী প্রোগ্রাম নিয়েই দক্ষিণমার্গী ও বামমার্গীদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তবুও আসল কথা এই যে, সে বিচ্ছেদের মূল কারণ স্বরাজের এই বিভিন্ন আইডিয়াল। কাজেই মডারেটরা কংগ্রেসকে হস্তগত করেই কংগ্রেসের এই Creed তৈরি করলেন যে Dominion self-government লাভই হচ্ছে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং যিনি ও-Creed স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত নন, তিনি কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবেন না। এই হল কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্ব।

৪

সুরাট কংগ্রেসের ভঙ্গ হবার পর, বাংলাদেশে যুবকদের মধ্যে এক দল বিপ্লবপন্থী দেখা দিলে। তার পর গভর্নমেন্ট এই দলকে দমন করতে প্রবৃত্ত হলেন। কংগ্রেস টিকে থাকল বটে, কিন্তু দেশের সঙ্গে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমগ্র দেশ কংগ্রেস

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ল। তার পর বাইরে থেকে এল দেশের পর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা— গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের ধাক্কা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান হল যে, এ যুদ্ধের ফলে সমগ্র মানবসমাজ একবার ভেঙে পড়ে আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। এই যুদ্ধের পূর্বে মানুষের যা কল্পনার অতীত ছিল, মানুষ তা চোখের সুমুখে ঘটতে দেখলে। রুসিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্মানির রাজপাট এক নিমিষে উড়ে গেল। পৃথিবীর সব চাইতে বড় ও প্রবল পরাক্রান্ত তিনটি সাম্রাজ্য একটির পর আর একটি ধূলিসাৎ হল— আর সে সব দেশে প্রজারা রাজা হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীর অপরাপর জাতের মত, ভারতবাসীরও মন একেবারে বদলে গেল। সকলের ধারণা হল যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেরও একটা প্রকাণ্ড বদল হবে।

এই যুদ্ধ যখন চলছিল, তখন শ্রীমতী আনি বেসান্ত একদিকে দেশে 'হোম রুলে'র দাবি তুললেন আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অনুবর্তী হলেন। আর একদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার আইডিয়ালও ব্যক্ত করলেন। পার্লিয়ামেন্ট থেকে বলা হল যে, progressive realisation of self-government হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের আইডিয়াল। কংগ্রেসের মরা গাঙে আবার জোয়ার এল। দক্ষিণমার্গী ও বাম-মার্গী দু'দলই আবার কংগ্রেসে একত্র হলেন। তারপর এল reform. এ রিফর্ম নিয়ে দু'দলে আবার মতান্তর ঘটল। দক্ষিণমার্গীরা যা পেয়েছেন, তা শিরোধার্য করলেন, আর বামমার্গীরা আরও বেশি দাবি করতে লাগলেন। এই নিয়ে এ দু'পক্ষের ভিতর আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সুরাটে মডারেটরা একস্ট্রিমিস্টদের কংগ্রেস হতে বার করে দিয়েছিলেন, এ ফেরা মডারেটরা নিজে হতেই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন। শেষটা অমৃতসর কংগ্রেসে ঠিক হল যে, রিফর্ম সন্তোষজনকই হোক আর অসন্তোষজনকই হোক— কাউন্সিলে কংগ্রেসওয়ালাদের প্রবেশ করা কর্তব্য। এই হল কংগ্রেসের তৃতীয় পর্ব।

৫

তার পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম গ্রাহ্য করতে বাধ্য করলেন। এ দলেরও আইডিয়াল হচ্ছে স্বরাজলাভ। কিন্তু এ মতে 'স্বরাজে'র অর্থ কী, তা প্রথমে বলা হল না, শুধু এইমাত্র বলা হল যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেশের লোক স্বরাজ পাবে। কিন্তু দেশের লোকের দোষে হোক আর যার দোষেই হোক, গত ৩১ ডিসেম্বর স্বরাজ তারা পায়নি। সে তারিখে তারা পেয়েছে শুধু স্বরাজের definition. এ স্বরাজ মানে হচ্ছে Dominion self-government.

অতএব দাঁড়াল এই যে, কংগ্রেস অমৃতসরে যে অবস্থায় ছিল, আজ আবার

সেইখানেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস আবার তার প্রোগ্রাম বদলাবে। যদি দেখা যায় যে আসছে ডিসেম্বর কংগ্রেস, কংগ্রেসওয়ালাদের কাউন্সিলে ঢোকবার অনুমতি দেন, তা হলে আর যিনিই হোন, আমি আশ্চর্য হব না।

৬

ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের যে কার্যকারণের সম্বন্ধ আছে— এ সত্য উপেক্ষা করলে, কোন বিষয়েই কোন রূপ অনুমান করা যায় না। কংগ্রেসের পূর্ব ইতিহাস থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, কংগ্রেসের মত সভা মধ্যপন্থী হতে বাধ্য। পৃথিবীর সকল দেশে চিরকালই সার্বজনিক মত মাধ্যমিক মত। আর এই কারণেই বোলসিভিকরা তাদের প্রতিশ্রুত ন্যাশনাল assembly বসাতে দিচ্ছে না। কারণ, সকল সম্প্রদায়ের মত অনুসারে কায করতে গেলে নানা মতামতের যোগ-বিয়োগে একটা মাঝামাঝি মত দাঁড়িয়ে যায়, কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতের একাধিপত্য থাকে না। এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, কংগ্রেস ত নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করেছিল। তার উত্তর— বহু লোক ওটিকে একটি experiment হিসেবেই গ্রাহ্য করেছিল। তা ছাড়া উক্ত ব্যাপারে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছিল। স্বদেশী যুগের বামমার্গীদের কাছ থেকে নন-কো-অপারেশন ও সেই যুগের দক্ষিণমার্গীদের কাছ থেকে non-violence, এই দুটি জুড়ে ঐ পুরো মতটি গড়া হয়েছিল। এ experiment সফল হল না।

যে experiment ফেল করেছে, ফিরে ফিরতি সেই experiment করা যে বৃথা, বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অভাবে, এ রকম বিশ্বাস কংগ্রেসের হওয়া অসম্ভব নয়। আর সে বিশ্বাস জন্মালে খুব সম্ভবত কংগ্রেস কাউন্সিল বয়কট করবার রায় উলটে দেবেন।

তার জন্ম থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কংগ্রেসকে তিন-তিন বার তিন দলের পলিটিসিয়ানরা হস্তগত করেছেন, কিন্তু ইতঃপূর্বে কোন দলই বেশি দিন নিজের দখলে রাখতে পারেননি। এর কারণও স্পষ্ট। কোন বিশেষ পলিটিকাল সম্প্রদায় যদি দেশের লৌকিক পলিটিক্সের উপর একাধিপত্য করতে চান ত তা করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কংগ্রেসকে ডাকা, তাকে হস্তগত করা নয়। যত দিন কংগ্রেস থাকবে, তত দিন তা একবার ডান দিকে ঝুঁকবে, একবার বাঁ দিকে ঝুঁকবে— কিন্তু অগ্রসর হবে মধ্যপথ ধরেই।

বাঙলার বর্তমান

যাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর মুখেই শুনতে পাই যে পলিটিক্সে বাঙালি জাতটা দু'তিন ক্লাস নেবে গিয়েছে।

বাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালির এ অভিযোগ একেবারে নূতন নয়। শ্রীমতী আনি বেসান্ত দেশে যখন Home Rule-এর আন্দোলন তোলেন, তখনও এ অভিযোগ নানা লোকের মুখে শুনেছি। তার পর মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালি যে তেমন স্ফূর্তি করে যোগ দেয়নি, এ কথা ত গোটা ভারতবর্ষ জানে। উক্ত আন্দোলনে বেহারও যে বাঙলার উপর টেক্কা দিয়েছে তা-ও ত অস্বীকার করবার যো নাই।

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে পলিটিক্স মানে পলিটিকাল আন্দোলন এবং সম্ভবত সকল দেশেই তাই। সুতরাং পলিটিকাল আন্দোলনে বিধিমত আন্দোলিত না হওয়ার অর্থ অবশ্য পলিটিক্সে পিছু হটা।

এ রকম হওয়ার অবশ্য অনেক কারণ আছে, যেমন পৃথিবীর সব ঘটনারই থাকে। তবে কী কারণে বাঙালি জাতির এ দশা ঘটেছে, তা নির্ণয় করবার ভার ইতিহাসের হাতে। আর আজ আমি বর্তমানের ইতিহাস, ভাষান্তরে পুরাতত্ত্ব লিখতে যাচ্ছি নে বলে, আমাদের পলিটিকাল অন্যমনস্কতার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করব না। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ বাঙালিই এখন পলিটিকাল sceptic হয়ে উঠেছে। যে-কোন বাঙালির সঙ্গে কথা কন, পাঁচ মিনিটে ধরা পড়বে যে তিনি কোন রকম প্রচলিত পলিটিকাল মতে বিশ্বাস করেন না, এমনকী পলিটিকাল নাস্তিকতাতেও নয়। আমি scepticism-কে ভয় করি নে, কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে scepticism-এর জমি থেকেই নূতন বিশ্বাস জন্মলাভ করে, পুরনোর তুলনায় সে নূতন বিশ্বাস হয় ঢের বেশি টেঁকসই।

বাঙলা আজ পর্যন্ত দাবি করে এসেছে যে, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের নব যুগের নেতা। সুতরাং পলিটিক্সে তার নেতৃত্ব পদ হারানোটা অনেকে দুঃখের বিষয় মনে করেন। তাতে নাকি তার প্রাণশক্তির হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বছর-আড়াই পূর্বে জনৈক অ-বাঙালি নেতা (ইতিমধ্যে তিনি নন-কো-অপারেশন-এর জনৈক

উপনেতা হিসেবে খুব নাম করেছেন) আমাকে বিদ্রূপ করে বলেন যে, আমি হচ্ছি সেই শ্রেণীর বাঙালির অন্যতম, যারা মনে ভাবে, 'Bengal first, Bengal second, Bengal last.' কথাটা শুনে আমি ঈষৎ বিরক্ত হই, কেননা উক্ত মন্তব্যটি প্রথমত অযথা, দ্বিতীয়ত অভদ্র। উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমি অপর আর এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম; সে কথা উক্ত পলিটিকাল নেতার শ্রবণগোচর হবা মাত্র তিনি অনাহুত তেড়ে এসে আমার কাছে উক্ত বাঙালিবিদ্বেষ প্রকাশ করলেন। এ রূপ ব্যবহারকে অবশ্য বাঙলায় সৌজন্য বলে না। তার পর যে কথা আমি বলছিলুম, তার ভিতর আমার বাঙালি পেট্রিয়টিজমের গন্ধ মাত্রও ছিল না। কাজেই প্রত্যুত্তরে আমি বলতে বাধ্য হলুম যে, second ও last-এর বিষয় আমি কিছু জানি নে, কিন্তু Bengal যে first সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। এ ঘটনার এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন এই যে, সত্য হোক, সত্যাভাস হোক, Bengal first-এর ধারণা বাঙালি মাত্রেরই থাকা উচিত। যে ছেলে আগে থাকতে মনে ঠিকা দিয়ে বসে যে, ক্লাসে সে last, সে কস্মিন্‌কালেও first হতে পারে না। আর যে মনে করে সে first, সে অন্তত first হবার চেষ্টা করে। অপরের মতো বাঙালি জাতেরও আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। এই বিশ্বাসবশতই আমি সহজে মানতে চাই নে যে বাঙালি জাতির প্রাণশক্তির দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে। অতএব দেখা যাক বাঙালি আর কোন বিষয়ে প্রাণের সাড়া দিচ্ছে কি না।

সকলেই লক্ষ করেছেন যে, বাঙলার সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে একটা নূতন সুর আছে।

সেকালে এ দেশে যাকে Social Reform বলত সে বিষয়ে দেখতে পাওয়া যায় দেশের লোকের মত বদলেছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষপাতীরা কিছুদিন আগে সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে ঠাট্টার পাত্র ছিলেন। এখন হয়েছেন ঠাট্টার পাত্র তাঁরা যাঁরা ও-সকলের বিরোধী। গৌড়ের অসবর্ণ বিবাহ বিলের বিরোধীপক্ষের উপর কী রকম বিদ্রূপ বর্ষণ হচ্ছে তা বাঙলা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন। আর যাঁরা হিন্দু সমাজের চিরাগত রীতিনীতির পক্ষপাতী তাঁরাও এ দেশে স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীকে দাসদাসী করে রাখবার সপক্ষে আজ কোন রূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক যুক্তি দেখাচ্ছেন না। পূর্বে যে তা নিত্য দেখাতেন তার সাক্ষী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লাখ কথার এক কথা— 'Huxley শশধর আর goose.' এই তিনের মিশ্রণেই যে সেকালের সনাতনী মত গড়ে তোলা হয়েছিল তা তিনিই জানেন, যাঁর বিশ বৎসর আগেকার বাঙলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে। কোন রূপ সামাজিক মুক্তির নাম শুনলে যাঁদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাঁরা সমাজের সনাতন আচার বজায় রাখবার সপক্ষে এখন একমাত্র পলিটিকাল যুক্তি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা বলেন সমাজের এ সকল সংস্কার তাঁরা ইংরাজের

আইনেব সাহায্যে করতে চান না। যে-দিন তাঁরা স্বরাজ্য পাবেন, অর্থাৎ যে-দিন তাঁরা দেশের রাজা হয়ে বসবেন, সেদিন তাঁরাই সমাজকে মুক্তি দেবেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে এঁরাও মনে করেন যে এ সব সংস্কার একদিন না একদিন করতেই হবে। সেই evil day তাঁরা যত দিন পারেন তত দিন পিছিয়ে দিতে চান। স্বরাজ পেলে তাঁরা নিজে অবশ্য দুর্দান্ত সমাজ-সংস্কারক হয়ে উঠবেন, তবে কবে যে তাঁবা তা পাবেন, এখন আর তার তারিখ ফেলা নেই।

এই নূতন মনোভাবের আর একটি লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার দাবি আজকের দিনে প্রধানত স্ত্রীলোকেই তুলেছে। এ বিষয়ে আজকাল লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশি। অনেকে এই ব্যাপারের নাম দিয়েছে নারী-বিদ্রোহ। সত্য কথা বলতে গেলে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্তঃপুর-বাসিনীরা যে-মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, সে মনোভাব সামাজিক evolution-এর নয়, সামাজিক revolution-এর পূর্বাভাস। এঁরা ভবিষ্যতে কী নূতন ব্যবস্থা চান সে বিষয়ে এঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা যে নষ্ট করা দরকার সে বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত, এবং সে মত তাঁরা খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করছেন। আর পরিস্ফুট হৃদয়াবেগ ও অস্পষ্ট আশা এ দুয়ের যোগেই revolution জন্মলাভ করে।

বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংবাদপত্রের এই সব মতামত পড়ে অনেকে হাসেন। তাঁরা বলেন সমাজ যেমন চলছিল তেমনিই চলছে, তার এক চুলও বদল করবার সাহস কারও নেই। সুতরাং ঐ লেখালেখি হচ্ছে মুখের কথা মাত্র, ওর কোনই ফল হবে না। ভবিষ্যতে কী হবে আর না হবে তা বলা অবশ্য অসাধ্য।

সম্ভবত স্ত্রীজাতির এই সব বলা-কওয়া একটা সাহিত্যিক খেলা মাত্র। বাঙালি পুরুষের কাছ থেকে বাঙালি মেয়েরা হয়ত এই বক্তৃতা-রোগ পেয়েছে। তা যদি হয় তা হলে অবশ্য সমাজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, অর্থাৎ কোনখানেই থাকবে না।

আবার এ-ও হতে পারে যে, যে-মনোভাব আজ কথায় ব্যক্ত হচ্ছে কাল তা কাজে ব্যক্ত হবে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, মানুষের আগে মনের বদল হয়, তার পর তার জীবনের বদল হয়। আর এ কথা নিশ্চিত যে মানুষের মন না বদলে তার জীবন বদলাবার চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ। আমাদের রাজনৈতিক অনেক চেষ্টা যে অদ্যাবধি পণ্ড হয়েছে তার কারণ পঞ্জিকাশাসিত মন নিয়ে আমরা স্বরাট হতে চেয়েছি। সামাজিক জীবনে দাসত্বের আদর্শ শিরোধার্য করে রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা যে ভাববিলাস মাত্র, এ ধারণা আজ বহু লোকের মনে স্থান পেয়েছে। সে যাই হোক, এই ব্যাপারেই প্রমাণ যে বাঙালি জাতির প্রাণশক্তি হ্রাস হয়নি, বৃদ্ধি হয়েছে।

মানুষ জড় পদার্থ নয়, সচেতন জীব। আমরা যাকে বলি প্রাণের সাড়া, মানুষের পক্ষে বস্তুত তা মনের সাড়া। আর আমাদের নিজের পাতা ফাঁদে যে আমরা পড়ে রয়েছি এ জ্ঞান হবা মাত্র মুক্তির কামনা মানুষের অন্তরে জন্মাতে বাধ্য। আর মুক্তির কামনার বলেই মানুষের প্রাণ যুগে যুগে স্ফূর্ত হয়ে এসেছে। ও-প্রবৃত্তির অভাবে মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের মতো মনেরও একটা জড়তা আছে। এবং সে জড়তাকে অতিক্রম করবার শক্তির নামই আধ্যাত্মিকতা। আত্মা স্বাধীন তাই মনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আত্মারই ধর্ম। যে সমাজের লোকে এই স্বাধীনতার প্রতি অন্তরায় সে সমাজ একটা জড় পদার্থ হয়ে উঠতে বাধ্য যেমন আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সমাজ সম্বন্ধে বাঙালি আজ যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে তাতে জাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হবার কারণ নেই, আশান্বিত হবারই কথা। Know thyself— এ আদেশ লঙ্ঘন করে মানুষ কখনও মানুষ হতে পারবে না। আত্মপরীক্ষা ব্যতীত সে আত্মবশ হতে পারবে না, এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।

এই সত্য আমি সকল মন দিয়ে বিশ্বাস করি বলে, বাঙালি জাত যে আজ আত্মপরীক্ষা করতে ব্রতী হয়েছে এটি আমি স্বজাতীয় উন্নতির মহা সুলক্ষণ বলেই মনে করি।

আমাদের সমাজ ভবিষ্যতে কী রূপ বাহ্য আকার ধারণ করবে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিন্তু আশা করি যে, তা যে-আকারই ধারণ করুক বর্তমানের চাইতে তা শতগুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এবং সেই জীবন্ত সমাজের পলিটিক্সও তার প্রাণের অনুগামী হবে। অতএব দেশে আজ পলিটিকাল আন্দোলনের বড় বড় ঢেউ উঠছে না বলে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বাঙলা ভারতবর্ষের আবার একটা নবযুগের অগ্রদূত হবে।

বা ঙ লা র ভাঁ টা র যু গ

'খেয়ালী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনি আমাকে পুজোর সংখ্যার 'খেয়ালী'র জন্য দু'কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ ত মামুলি; অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয়দের কাছ থেকে এ জাতীয় অনুরোধ প্রতি বৎসরেই পাই, অন্তত পূজার প্রাক্কালে।

তবে আপনাদের অনুরোধের ভিতর একটু নূতনত্ব আছে। আপনারা চান যে আমি রাজনীতি লিখি, গল্প নয়। ইতিপূর্বে সকলে বরাবরই গল্পের দাবি করেছেন।

বোধ হয় সম্পাদকদের ধারণা যে গল্প হচ্ছে সেই জাতীয় সাহিত্য যার অন্তরে রাজনীতিও নেই, অন্য কোন রকম নীতিও নেই। অর্থাৎ গল্প একেবারে নিষ্কণ্টক। কোন গল্প-লেখক তাঁর লেখা থেকে নীতি ছেঁটে দিতে পারেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বড়জোর গল্পকার তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে নবনীতি প্রচার করতে পারেন, অর্থাৎ মানুষের নৈতিক জীবনের মফস্‌সল দিকটে সদর করতে পারেন। এরই নাম নাকি realism. তবে এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না; অর্থাৎ আর্ট কী বস্তু তা নিয়ে তর্ক শুরু করব না।

সে যাই হোক, আপনাদের ফরমায়েস শুনে আমি চমকে উঠিনি। পলিটিসিয়ানদের কাছে সাহিত্যের ফরমায়েস দেওয়া যদ্রূপ অদ্ভুত, সাহিত্যিকদের কাছে পলিটিক্সের ফরমায়েস দেওয়া তদ্রূপ অদ্ভুত নয়। একটা উদাহরণ দিই। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন সর্বাগ্রগণ্য পলিটিসিয়ান— অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ কবি। মহাত্মা গান্ধীকে কেউ কখনও দ্বিতীয় উর্বশীকে ছন্দোবদ্ধ করতে বলবে না; কিন্তু হরিজন-সমস্যার মূল কথা রবীন্দ্রনাথ বিনা উপরোধে বলেছেন ও বলছেন। আর এ সমস্যা কি একটা পলিটিকাল সমস্যা নয়? রাষ্ট্র কি সমাজের বাইরে?

২

তবে দেশের বর্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙলার সাহিত্যিকদের কিছু বলা কঠিন। কেন তা পরে বলছি। ভাল কথা, সাহিত্যিকদের সঙ্গে পলিটিসিয়ানদের প্রভেদ

কী? আমার মনে হয়, এ দুই জাতের প্রধান প্রভেদ ভাষার। যাঁরা বাঙলা ভাষায় লেখেন, তাঁদেরই নাম সাহিত্যিক— আর যাঁরা ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করেন, তাঁদের নাম পলিটিসিয়ান। অবশ্য আরও অনেক প্রভেদ আছে— কিন্তু মুখ্য প্রভেদটা এই ভাষার প্রভেদ। আমার এ কথাকে শুধু রসিকতা বলে মনে করবেন না। ইউরোপে যদি সকল জাতেব ভাষা এক হত, তা হলে সকলেরই মুখের কথা এক হত। তা হলে সে ভূ-ভাগের এই international কলহটা দিনের পর দিন, ক্রমে পঞ্চমে চড়ে যেত না। মনে রাখবেন যে পলিটিসিয়ানদেরও কারবার কথা নিয়ে। তারপর ইংরেজি আমাদের আটপৌরে ভাষা নয়, পোষাকি ভাষা। আর এ পোষাকও আমাদের বিলেত থেকে ধার করা পোষাক, ফলে আমাদের মনের গায়ে ঠিক fit করে না। বাঙলা ভাষা যেমন আমাদের গায়ে বসে, পলিটিসিয়ানদের ধার করা বিলেতি পোষাক তেমনি তাদের গায়ে আলগা হয়ে ঝোলে। কিন্তু আমাদের প্রতি প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন। সেই জন্য বাঙলায় যদি কোন বাঙলা রাজনীতি থাকে ত তার ভারতীয় রাজনীতিব সঙ্গে এখানে ওখানে গরমিল হতে বাধ্য।

৩

কিছুদিন পূর্বে বাঙলা দেশে কতকগুলি পলিটিকাল ideal গড়ে উঠেছিল। এ idealism-এব নাম liberalism মনে রাখবেন, liberalism এক রকম ফিলজফি, Liberal নামক একটি পলিটিকাল দলের প্রোগ্রাম নয়। এবং সে ideal তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন, যাঁরা এ যুগের বাঙলা সাহিত্য গড়ছেন। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা লেখকেরা বাঙালির মনের এই দিকটাকে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। সংক্ষেপে বাঙলার সাহিত্যিকরাই বাঙালির পলিটিকাল মনোভাবের জন্মদাতা। আর, আমাদের মতো সাহিত্যের camp follower-দের মনও 'মহাজনাঃ যেন গতাঃ', সেই পথেই চলেছে। এর কারণ জোর করে বলা যায়— যে বাঙলার পলিটিক্স বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল।

বাঙলার পলিটিক্স যে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক পলিটিক্স হয়ে ওঠেনি এর কারণ সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঙালিরা কখনও ভোলেনি। সেকালে আমরা অতীত ভারতবর্ষের অনেক গুণগান করেছি। সে ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক কি কাল্পনিক তাতে কিছু আসে যায় না। বলা বাহুল্য, এই অতীত ভারতবর্ষ কোন বিশেষ প্রদেশের একচেটে নয়। তাই এই অতীত ভারতবর্ষ নামক ideal-টি সকল প্রদেশের যোগসূত্র ছিল। ফলে বাঙলার পলিটিক্স অপর সকল প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' বাঙলা দেশেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। আর এই মহাবাক্য বাঙলা সাহিত্যের অন্তর থেকেই উদ্ভূত।

আজকের দিনে বঙ্গ-সাহিত্য, পলিটিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার কারণ

পলিটিক্স এখন বইয়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, খাতার অর্থাৎ হিসেবের খাতার অন্তরে প্রবেশ করেছে। তাই পলিটিসিয়ানরা এখন আর মাথা ঘামাচ্ছেন না, মাথা গুণছেন।

৪

আজকের দিনে পলিটিক্সের বড় কথা হচ্ছে ভোটের ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা। আর যাঁরা এই ভোটের হিসেব নিয়ে দলাদলি করছেন, তাঁদেরও ঠিক মিলছে না। আর তাঁরা ঠিক মেলাতেও পারবেন না। কারণ এ অঙ্কের ভিতর— প্রথমত একটা বড় ভগ্নাংশ আছে, তারপর অনেক ছোট ছোট ভগ্নাংশ আছে। এই সব ভগ্নাংশ-গুলোকে যোগ দিয়ে 'এক' কিছুতেই করা যায় না, এক গোঁজামিলন দেওয়া ছাড়া। অপর পক্ষে সাহিত্যের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ অখণ্ড এক, আর তার নানা প্রদেশের ভেদ, সেই একেরই স্বগত ভেদ। তাই এই সব ভগ্নাংশের গুতোগুতি আমাদের মন প্রসন্ন করে না।

এখন বাঙলার কথায় ফিরে আসা যাক। আজকের দিনে বাঙালি জাতির 'তন্ মন্ ধনে' অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। আর এ স্বপ্ন চোখের সুমুখে না থাকলে, মানুষের আত্মশক্তি মুষড়ে যায়। ফলে, কি পলিটিক্স, কি সাহিত্য, সবই ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ যদি এখন আমাদের আশার বাণী শোনাতে পারে তা হলে আমরা আবার চাঙ্গা হই। কিন্তু কে শোনাবেন? আমরা ত নয়ই। কারণ যে-যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি আর যে-যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি সেটি ছিল আমাদের একটি আশার জোয়ারের যুগ— এখন এসেছে ভাঁটার যুগ।

আমাদের মতবিরোধ

নন-কো-অপরেশন সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের মতভেদ থাকা উচিত কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তা যে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেহ; অতএব তা অস্বীকার করেও কোন ফল নেই।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেস যে-দিন নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করে, সেই দিনই এ সত্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কংগ্রেসি বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের এই নূতন প্রোগ্রামের বিপক্ষে ছিলেন।

তার পর, অর্থাৎ নাগপুর কংগ্রেসের পর এ দলের ভিতর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ জন-কয়েক অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করেন। বাদবাকি সকলে ও-ব্যাপার থেকে আলগা হয়ে থাকেন।

যাঁরা নন-কো-অপারেশনে যোগ দেননি, তাঁরা যে সকলে ও-আন্দোলন থেকে একই কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অবশ্য নয়। আমাদের সকলের মনও এক নয়, চরিত্রও এক নয়। অতএব এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যে-ব্রত অবলম্বন করতে হলে, চিন্তার ও জীবনের চিরাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করতে হয়, সে ব্রত গ্রহণ করবার পক্ষে কারও বাধা ছিল মনের, কারও বা চরিত্রের, আর অধিকাংশ লোকের একসঙ্গে ও-দুয়ের।

এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। সাধারণত মানুষের মতামতের পিছনে তার বিচারবুদ্ধি ততটা থাকে না— যতটা থাকে তার চরিত্র, তার রাগ-দ্বেষ, আর তার চিরকেলে অভ্যাস। হৃদয়ের ও উদরের কথাকে মস্তিষ্কের বেনামীতে চালিয়ে দেওয়ার অভ্যাসও যে মানুষের আছে, তা সে-ই জানে, যে মানুষের কথার পিছনে তার মন দেখতে চায়। যাঁরা নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের দর্শক মাত্র ছিলেন, তাঁরা সকলে যে একমন নন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা, যাঁরা ও-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও সকলে একমন নন। আমি নিজ কানে নন-কো-অপারেশনের অন্তত পঞ্চাশ রকম ব্যাখ্যা শুনেছি যা সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ও-ব্যাপারের ঔদরিক ও আধ্যাত্মিক

ভাষ্যকারের সঙ্গে কার পরিচয় নেই? আর যাঁরা নন-কো-অপারেশনের একটি নিয়ম একদিনের জন্যও পালন করেননি, অথচ উক্ত মতের গোঁড়া ভক্ত তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য। এ শ্রেণীব লোকের মতামত যে অকিঞ্চিৎকর, তা বলাই বাহুল্য। নন-কো-অপাবেশন যে একটা কর্মের পদ্ধতি, শুদ্ধ জ্ঞানের কিংবা ভক্তির বিষয় নয়, ও-মতানুসারে কায না করে ও-মত গ্রহণ করলে যে কোন সার্থকতা নেই, এই সহজ কথাটা মনে রাখলে বাঙলার বহু লোক সকাল-সন্ধে ওকালতি করে, রাত্তিরে দুর্দান্ত অসহযোগী হয়ে উঠতেন না। গত ১২ ফেব্রুয়ারি বার্দোলীতে ও-রিজলিউসন পাস হয়, তার ফলে এঁদের মুখ বন্ধ হয়েছে।

২

উক্ত মত সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যখন মতভেদ আছে, তখন তাঁদের কথায় ও লেখায় সে মতভেদের প্রকাশ অনিবার্য। কেননা, লেখাপড়া হচ্ছে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কায।

তার পর নিজের মত প্রকাশ করতে গেলে, লোকে সেই সঙ্গে তার সপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেও বাধ্য, আর বিপক্ষ মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করতেও বাধ্য। এ রূপ তর্কস্থলে লোক চিবকাল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসেছে, আর চিরকাল তা করবে। তর্ক-যুদ্ধও যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য লোকে নানা প্রকার আলঙ্কারিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। আর যে তা করতে পারে না, সে চিৎকার করে। এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব। মানুষের মন একমাত্র syllogism-এর পথ ধরে চলে না। মানুষের মস্তিষ্ক তার রক্তমাংসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। এ যোগ থাকাটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হয় তখন, যখন রক্তমাংসে মস্তিষ্ক একদম চাপা পড়ে।

মানুষে মানুষে মতভেদ ঘটলেও তাদের ভিতর সকল সময়ে মনোমালিন্য ঘটবার প্রয়োজন নেই। দেখতে পাওয়া যায় যে, মনোমালিন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের কথা ভুল বোঝে। আমাদের পলিটিক্সের কাম্য-বস্তু কী? সে বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত। আর যে-ক'জন নন, তাঁদের কোন কথাই বলবার নেই। তাঁরা হয় অতিমানুষ, নয় অমানুষ। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের ভিতর যা প্রভেদ, সে হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্যলাভের উপায় নিয়ে। সুতরাং প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, আমাদের কারও মত এতাদৃশ চূড়ান্ত নয় যে, তার আর কোন বদল হতে পারে না। আমরা তর্ক শুরু করি অবশ্য অপরের মত বদলে দেবার জন্য, কিন্তু তার ফলে শেষটা অনেক সময়ে নিজের মতই বদলে যায়। বুলি বদলায় না শুধু তোতাপাখির।

এই নন-কো-অপারেশন বিষয়ে তর্ক অনেক সময়ে যে অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়, তার কারণ পরস্পরের মতভেদ যে কোথায়, তার্কিকেরা সকল সময় সে দিকে নজর দেন না। সে যাই হোক, কোন্ বিষয়ে যে আমরা সকলে একমত, সেটা যদি আমরা স্পষ্ট জানি, তা হলে আমাদের তর্কে এড়ো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা কমে আসে।

নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্তত আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটিই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজিতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবা মাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বলতে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকে পাবেন।

'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।'

মাহাত্ম্য আত্মার ধর্ম, দেহের নয়; সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই ক'টি অসাধারণ গুণ দেখতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত; তাঁর নির্ভীকতা আর পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কত দূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ করেছেন কি না জানি নে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোন অলঙ্কার নেই, কোন বাহুল্য নেই, কোন অত্যুক্তি নেহ; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত, তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ, ভাষায় তিনি তাঁর মনের নগ্ন রূপ লোকের চোখের সুমুখে ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কী অসাধারণ প্রসাদগুণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়, একটি বিদেশি ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ করলুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতার সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে স্টাইল বলি,

সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নন-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ, যথা ভি.জে. পাটেল সৃষ্টি করতেন, তা হলে তার জন্ম মৃত্যু যে একই তারিখে হত, সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নেই।

বিপিনবাবু একবার বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, তিনি 'লজিক' বোঝেন, 'ম্যাজিক' বোঝেন না। লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে-অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যুক্তি হয় না এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

৪

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনও তিল মাত্র সন্দেহ স্থান পায়নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্বে হয়েছে যে, হয়ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেননি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ও-নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে, আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ বিরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তারপর অসংখ্য নন-কো-অপারেশন-ভক্তদের মুখে অগণ্য বার শুনেছি যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না-বোঝারই সামিল, এবং এই সব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময়, তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচার-ক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোন একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও-ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি— আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহা-পুরুষের, সক্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের apology বাঙলায় অনুবাদ করবার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনও সে অনুবাদ

করতে সমর্থ হই, তা হলে বাঙালি পাঠক মাত্রেই দেখতে পাবেন যে, ঐ উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

বর্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব, কে কী করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই কবি; কে কী সে বিষয়ে ততটা মন দিই নে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে to do, আর সেকালে ছিল to be, এ দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥'

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, তার দুই-চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥'

যে-প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এত দিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পড়ে আসছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে তা পাওয়া যায়নি।

যাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে কোন কর্ম নেই, তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি আমাদের কর্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি নয়।

'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥'

এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী যে একজন আদর্শ পুরুষ, এ কথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবল মাত্র পলিটিকাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে, উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই গান্ধী একজন মহাত্মা, অপর পক্ষে আমার মতে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জনসাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উলটো প্রোগ্রাম বার করতেন, অর্থাৎ non-violence-এর বদলে তিনি যদি violence প্রচার করতেন, তা হলে জনসাধারণ তা

প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তা হলে তিনি দুঃখী ব্যক্তির বশীকবণী শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।'

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক ওদিক হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে রাখা উচিত. যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মতো স্থিতধী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্মমও নই, নিরহঙ্কারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই, আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হব এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে লজ্জিত হব।

মহাত্মার প্রায়শ্চিত্ত

১

‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এ একটি অতি চমৎকার গল্প আছে। সে গল্পটি এই . কৃষ্ণ বলরাম দুই ভ্রাতা বাল্যাবস্থায় একদিন মাঠে মাঠে খেলা করে বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে পড়েন। শেষটা তাঁরা পিপাসা-কাতর হয়ে এক ব্রাহ্মণ পল্লীর নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সেখানে একত্র হয়ে একমনে যজ্ঞের কাঠ সাজাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের পিপাসাশান্তির জন্য এই ব্রাহ্মণদেব নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণরা যজ্ঞের আয়োজনে এতই ব্যাপৃত ছিলেন যে, তাঁদেব মধ্যে কেউই এই বালকদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। শেষটা কৃষ্ণ বলরাম— জলের অন্বেষণে পল্লীর ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণপত্নীরা এই বালকদ্বয়ের আতপক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখে তাঁদের অতি আদর করে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে শীতল জলদান করে তাঁদের তৃষ্ণা দূর করালেন এবং তৎপরে নিজের নিজের অঞ্চল দ্বারা কৃষ্ণ বলরামকে ব্যজন করে— তাঁদের ক্লান্তি অপহরণ করলেন।

কৃষ্ণ বলরাম প্রকৃতিস্থ হবার পর তাঁরা যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন আবার সেই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। ফেরবার পথে দেখেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণরা সব তখনও অনন্য-মনা হয়ে যজ্ঞ গঠন করছেন। এই দেখে কৃষ্ণ বলরাম হঠাৎ তাঁদের সুমুখে উপস্থিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য ব্রাহ্মণদের নিজেদের দিব্যরূপ দেখিয়ে অন্তর্ধান হলেন। ব্রাহ্মণরা তখন আকুলচিত্তে নানা স্থানে সেই দেবমূর্তির অন্বেষণ করে কোথাও তাঁদের সাক্ষাৎ না পেয়ে, শেষটা স্বীয় পল্লীতে প্রবেশ করে তাঁদের পত্নীদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা গ্রামের ভিতর দুটি দেবমূর্তি দেখেছেন কি না। ব্রাহ্মণপত্নীরা উত্তর করলেন যে তাঁরা শুধু যে দেখেছেন তাই নয়, তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এসে তাঁদের জলপান করিয়েছেন এবং নিজ নিজ অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করে— তাঁদের ক্লান্তি দূর করেছেন। ব্রাহ্মণরা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী করে তাঁদের দেবতা বলে চিনতে পারলে? ব্রাহ্মণকন্যারা উত্তর করলেন যে— তাঁদের অলোক-সামান্য রূপ দেখে।

এই উত্তর শুনে ব্রাহ্মণরা শিরে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, তোমরাই ধন্য,

তোমরা সরলমতি বলে তোমরা দেবতাকে দেখবা মাত্রই চিনতে পারো, আর আমরা যে-দেবতার উদ্দেশ্যে আজীবন যাগ-যজ্ঞ করছি সে দেবতা আমাদের সুমুখে আবির্ভূত হলেও আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি— কারণ ঐ যাগ-যজ্ঞই জীবনের সার করে তুলেছি, কীসের উদ্দেশ্যে এ সব করা তা এক রকম ভুলে গিয়েছি।

আমার বিশ্বাস সকল দেশের সকল কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই একই দশা। আমরা কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করি এবং সেই সব উপায়কে সকল মন-প্রাণ দিয়ে এমনি আঁকড়ে ধরি যে, আসল উদ্দেশ্যের কথাটা আমাদের মনে আর স্থান পায় না। শুধু ধর্ম নয়— মানুষের সকল ব্যাপারেই শিক্ষিত মানুষের মনে এই রূপ মনোভাব জন্মানো স্বাভাবিক।

২

আমরা কিছুদিন থেকে, আর পাঁচ জনকে ডেকে বলছি— 'আবার তোরা মানুষ [হ]'। আর তা-ই বলেই ক্ষান্ত হইনি। আমরা নিজের নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে মানুষ গড়বার নানা রূপ কল বানিয়েছি আর দেশের লোককে সেই সব কলে পোরবার চেষ্টা করছি। এ অবস্থায় যদি কোন মানুষের মতো মানুষ আমাদের সুমুখে আবির্ভূত হন, তা হলে খুব সম্ভবত আমরা তাঁকে মানুষ বলে চিনতে পারব না। আমাদের অধীত বিদ্যাই সে চেনার অন্তরায় হবে।

মহাত্মা গান্ধী যখন চার বৎসর পূর্বে এ দেশে প্রথমে স্ব-রূপে আবির্ভূত হন, তখন আমরা কোন শিক্ষিত লোকই তাঁকে ঠিক চিনতে পারিনি। আমরা নন-কো-অপারেটরই হই আর অ-নন-কো-অপারেটরই হই, আমরা কেউই অন্তরের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত ভারত উদ্ধারের উপায়গুলি গ্রাহ্য করতে পারিনি। আমি যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি তার কারণ— আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে যত দূর কুলোয়, তাতে আমি তাঁর প্রচারিত পলিটিক্স ও ইকনমিক্সকে, পলিটিক্স ও ইকনমিক্স বলে স্বীকার করতে পারিনি। চরকার গুণ ব্যাখ্যান করতে বসলে— আমি আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হতুম। কিন্তু কারও কপট শিষ্য হওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তা ছাড়া আত্ম-প্রতারণাকে আমি ভয়ঙ্কর ডরাই। অপর পক্ষে তাঁর যে-সকল শিষ্য তাঁকে মহা politician এবং মহা economist বলে বিশ্বাস করতেন— তাঁরাও ঠিক চিনতে পারেননি। মহাপুরুষ কখনও মহাচালাক হয় না।

এ সত্ত্বেও জনগণের মনের উপর তাঁর মনের অসামান্য প্রভাব দেখে আমার মনে এ সন্দেহ বরাবরই ছিল যে, আমাদের শিক্ষাই হয়ত তাঁকে যথার্থ চেনবার পক্ষে আমাদের মনের প্রধান বাধা হয়েছে।

এর পর যে-দিন শুনলুম যে আমেদাবাদে তিনি অপদস্থ হয়েছেন এবং পলিটি-কাল মহলে তাঁর প্রতিপত্তি নষ্ট হয়েছে, সেদিন ব্যাপারটা আমার কাছে একটা মহা

ট্রাজেডি বলে মনে হয়েছিল, যদিচ চিরাভ্যস্ত শিক্ষাদীক্ষার বলে আমার মন স্বরাজ দলের পলিটিক্সের সম্পূর্ণ অনুকূল। সেদিন আমি নিজের মনোভাবের পরিচয় পেয়ে নিজেই চমকে উঠেছিলুম।

কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি, শুধু আমি নয়— ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোকের মনোভাব একই। মহাত্মা গান্ধী উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছেন এ কথা শুনে আপামর সাধারণ সকলেই আশঙ্কিত ও ব্যথিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর এই অসামান্য প্রীতি বাস্তবিকই একটি অলৌকিক ঘটনা। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মনের যে-অংশ rational সে অংশের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব তাদৃশ না থাকলেও আমাদের মনের যে-অংশ spiritual সে অংশের সঙ্গে তাঁর মনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এর কারণ কী? মহাত্মা গান্ধী একজন পলিটিসিয়ান না হতে পারেন, ইকনমিস্ট না হতে পারেন কিন্তু তার চাইতে তিনি ঢের বড়। তিনি হচ্ছেন মানুষ ও ভারতবর্ষে এ যুগে একমাত্র মানুষ।

তাঁর অভাবে ভারতবর্ষ নির্মনুষ্য হবে, তাই তাঁর জন্য আমাদের এত ভয়— এত ভাবনা। মহাত্মা আজ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন? তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন শিক্ষিত সমাজের কপটতা ও জনগণের হিংস্রতার জন্য। তিনি এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে, যে-অন্ধশক্তির তাণ্ডবলীলা আমাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে অন্ধশক্তি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজে দায়ী। আমরা যেমন তাঁকে চিনেও চিনতে পারিনি, তিনিও তেমনি আমাদের চিনতে পারেননি। ভারতবর্ষের লোক রাগ-দ্বেষের যে বহির্ভূত নয় এ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সে যাই হোক, ভারতবাসী বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে না পারুক, নিজের অন্তর দিয়ে যে তাঁকে চিনতে পেরেছে এ আমি দেশের অতি সৌভাগ্যের কথা বলে মনে করি। তাঁর কল্যাণের জন্য আমাদের এত আন্তরিক আগ্রহ কেন? কারণ তাঁর কল্যাণের উপর যে ভারতবাসীর অন্তরের কল্যাণ নির্ভর করছে, Gandhism-এর আবরণ ভেদ করে এ সত্যের সাক্ষাৎ ভারতবাসী লাভ করেছে।

ম হা ত্মা র প্রা য়ো প বে শ ন

মহাত্মার প্রায়োপবেশনেব সংকল্প যে হিন্দু সমাজকে অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। এর প্রথম কারণ এই যে মহাত্মার এ সংকল্প মিথ্যা সংকল্প নয়, তিনি যে এই অনশন ব্রত আমরণ প্রতিপালন করবেন সে কথা আমরা সকলেই জানি। তাঁর কথা শুধু মুখের কথা নয়। গান্ধীজীর কথায় আর কাজে যে কোন প্রভেদ নেই তার প্রমাণ তিনি আজীবন দিয়েছেন এবং এই কারণেই তাঁর কথা দেশের লোকের মনের উপর এতটা প্রভুত্ব করে।

খদ্দর বয়ন ও খদ্দর ধারণ করলে আমরা যে জাতীয় দৈন্য হতে মুক্তিলাভ করব মহাত্মার এ বাণী আমি অকপটচিত্তে গ্রাহ্য করতে পারিনি এবং যে-সকল যুক্তির দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করা হয়েছে সে সকল যুক্তিও আমার কাছে নিতান্ত একদেশদর্শী বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু উক্ত বাণী যে বহু লোকের মর্ম স্পর্শ করেছে এই প্রত্যক্ষ সত্য সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। মহাত্মা যখন যে-বাণী প্রচার করেছেন তা বহু দেশবাসীর মনকে আত্যন্তিক ভাবে মুগ্ধ করেছে— তার প্রধান কারণ মহাত্মাজীর অসামান্য sincerity. এ জাতীয় বাণীর economic সার্থকতা যাই হোক না কেন তার psychological শক্তি প্রত্যক্ষ। তাঁর প্রতি কথার ভিতর যার পরিচয় পাওয়া যায়, সে হচ্ছে তাঁর মহৎ আত্মার। মহাত্মা গান্ধীর লৌকিক মনের উপর এই অলৌকিক শক্তির ইংরাজি নাম হচ্ছে moral force. এ শক্তি কোন বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এর স্পর্শে আমাদের মনের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি উদ্ভাসিত, উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য আজকের দিনে যে-চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে তার ফলে হিন্দু-মন মনুষ্যত্বের আর এক ধাপ উপরে উঠে যাবে। মহাত্মার এ অনশন ব্রত নিরর্থক আত্মহত্যার প্রচেষ্টা নয়। তা যদি হত তা হলে তাঁর প্রাোপবেশনকে পাগলামি বলতে তিল মাত্র দ্বিধা করতুম না।

কিন্তু মহাত্মা এ ব্রত গ্রহণ করেছেন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য। অপরের পাপ ক্ষালন করবার জন্য যিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তাঁকে মানব-সমাজ চিরকালই redeemer বলে শিরোধার্য করেছে।

খৃষ্টানরা যিশুখৃষ্টকে যে নরহরি বলে এত কাল গণ্য করে আসছে তার মূল কারণ কেবল খৃষ্টবচন নয়, খৃষ্টভক্তদের বিশ্বাস যিশুখৃষ্ট পরের পাপ মোচন করবার জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের প্রথম ফল সমগ্র হিন্দু সমাজকে তার ঘোর পাপ সম্বন্ধে সচেতন করা এবং এ পাপ দূর করবার সংকল্প তাদের মনে জাগরূক করা।

বাঙালি জাতি যে সনাতন জাতিভেদ প্রথা প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নিতে পারেনি, তার প্রমাণ এ যুগের বাঙলা সাহিত্য। হিন্দু সমাজের বহু শুদ্ধাচার যে স্ত্রী শূদ্রের প্রতি নির্মম অত্যাচার এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে বেশি বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

তাই আমরা এই সর্বনেশে ভেদবুদ্ধিকে আক্রমণ করেছি, বিদ্রূপ করেছি, কেউ হৃদয়ের দোহাই দিয়ে, কেউ বা আবার বুদ্ধির দোহাই দিয়ে। এর কারণ আমাদের সমাজের এ ব্যবস্থা যেমন অন্যায় তেমনি নির্বোধ। এর ফলে কথায় আমরা এ পাপ দূর করতে চেয়েছি— কিন্তু কাজে বিশেষ কিছু করিনি। আমরা অনেকে ব্যক্তিগত হিসেবে হিন্দু সমাজের বহু বিধিনিষেধ অমান্য করেছি কিন্তু সমগ্র জাতির সামাজিক গঠন পরিবর্তন করতে পারিনি। সম্ভবত এর কারণ আমাদের ইংরাজি-শিক্ষিত মন জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু আমাদের মগ্নচৈতন্যে জাতীয় অহঙ্কার জমাট হয়ে আছে।

আর এক কথা। কিছু দিন থেকে আমরা এ মত বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিয়েছি যে আমাদের গভর্নমেন্ট democratic না হলে আমাদেব মোক্ষলাভ হবে না। এ বিষয়ে আমরা সকলেই প্রায় একমত।

Democratic গভর্নমেন্ট যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গবর্নমেন্ট সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর থাকলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নেই যে পৃথিবীর প্রায় সকল সজীব জাতির গভর্নমেন্ট democracy-র উপরই প্রতিষ্ঠিত। এমনকী, রাশিয়ার বর্তমান গভর্নমেন্টও। ভারতবর্ষ নাবালক অবস্থায় সৃষ্টিছাড়া হয়ে থাকতে পারে, মানুষ হয়ে নয়। সব মানুষই যে সমান, এ পৃথিবীর কোথাও তা দেখা যায় না। যদি ইউ-রোপের সমাজতন্ত্রে equality সুপ্রতিষ্ঠিত হত, তা হলে Socialism, Communism প্রভৃতি কথার কোন মানে থাকত না। কিন্তু মানুষ মাত্রেই যে কতকগুলি বিষয়ে সমান অধিকারী, এ কথা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা মেনে নিয়েছে, মানিনি শুধু আমরা। আমাদের রাষ্ট্রনীতি democratic হবাব পক্ষে আমার সমাজনীতি যে প্রধান বাধা, এই স্পষ্ট সত্যটি যাঁরা উপেক্ষা করে মনে মনে Constitution গড়েছিলেন তাঁদের সে তাসের ঘর Communal Award-এর ধাক্কায় ভেঙে গিয়েছে। যদি আমরা রাজনৈতিক ঐক্য পেতে চাই, তা হলে আমাদের পক্ষে সামাজিক ঐক্য সাধন করা যে অবশ্য প্রয়োজন এ কথা আজকের দিনে অস্বীকার করবার মতো

অন্ধতা আশা করি পলিটিকাল দলেও নেই। মহাত্মা গান্ধী আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের পথ থেকে এই বীভৎস আবর্জনা দূর করবার উদ্দেশ্যেই এই অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন। এখন তাঁর প্রাণ রক্ষা করা আর না করা আমাদের হাতে। যে-সামাজিক আচার যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, তাকে যে শুধু মুখের কথায়, সে কথা যতই সত্য, যতই সহৃদয়, যতই সুন্দর হোক না কেন, দূর করা যাবে এ দুরাশা আমি কখনই মনে পোষণ করিনি। কারণ সামাজিক জীবন যাকে গড়ে তুলেছে, একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি তার মূল উৎপাটন করতে পারে না। আমাদের পাঁচ জনের কথায় মানুষের মনে তার মূল আলগা হয়ে যাবে, এই ছিল আমাদের একমাত্র আশা। কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, জাতিভেদ প্রথার ভিত টলাতে পারে এমন একটি প্রচণ্ড ধাক্কা, যা আমাদের জাতীয় মনকে নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু এ প্রাণের ধাক্কা যে কবে ও কোথা থেকে আসবে তা আমার কল্পনার বহির্ভূত ছিল।

আজকের দিনে মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন হিন্দু জাতির মনকে এই ধাক্কা দিয়েছে, আর তার ফল কী হয়েছে, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন।

হিন্দু সমাজের দেহে ও মনে যে প্রাণের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, কেউ কেউ তাকে হয়ত emotionalism মনে করছেন। ধরে নেওয়া যাক যে ব্যাপারটা আসলে তাই। কিন্তু যিনি সমগ্র জাতির মনে একদিনে এ বিরাট emotion-এর সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর আত্মশক্তি যে দৈবশক্তি এ কথা কোন্ বুদ্ধিমান অস্বীকার করবে? কর্মক্ষেত্রে যে emotion-এর উপর বুদ্ধিমান লোকের আস্থা কম, তার কারণ emotion-এর ধর্মই যে তা প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী। ও-ঢেউ আজ ওঠে, কাল পড়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, এ emotion আমাদের ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ নয়, এর পিছনে আছে নব ন্যায়জ্ঞান! এ জ্ঞান একবার প্রবুদ্ধ হলে, অচিরে ঘুমিয়ে পড়ে না। আর এ emotion-এর জোয়ার ভাঁটায় পরিণত হলেও এর ফলে হিন্দু সমাজ নব কলেবর ধারণ করবে। হিন্দু-ভারতবর্ষ যে ভবিষ্যতে এক ক্ষেত্র হবে— এ কথা আজ কেবলমাত্র কবিকল্পনা নয়।

লোহার রক্ষাকবচ

আজকের দিনে এই কথাটা চারদিকে শোনা যায় যে, ভারতবর্ষ পলিটিকালি প্রবুদ্ধ হয়েছে। এ কথাটা এত লোকে চিৎকার করে বলছে যে তা না শুনে থাকবার যো নেই। তা ছাড়া দেশে অপর কোন কথা শোনা যায় না, কেননা, কেউ অন্য কথা বলে না, আর কেউ কাউকেও আর কোন কথা বলতে দেয় না।

দেশ যে পলিটিকালি জাগছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই— তবে সম্পূর্ণ জেগেছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঘুম ভাঙা ও চোখ খোলার ভিতর একটু সময়ের ব্যবধান আছে। আমাদের পলিটিকাল ঘুম ভাঙছে বটে, তবে এখনও আমাদের পলিটিকাল চোখ যে পুরো ফুটেছে, তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দেশের পলিটিকাল অবস্থা কী হওয়া উচিত সে কথা বলা অতি সোজা, কিন্তু যা হওয়া উচিত তা কী কারণে হচ্ছে না, এবং কী উপায়ে হবে, এ সব কথা বলা তত সহজ নয়। কারণ তা বলবার আগে সে কারণের সন্ধান নেওয়াটা দরকার। সে সন্ধান যে আমরা বড় একটা নিই নে, তার প্রমাণ আমরা এক কারণের বহু ফল দেখি। পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সে সবই এক কারণ-সম্ভূত— এ রূপ মনে করা যে ভুল, সে কথা এ দেশের নৈয়ায়িকরা বহু পূর্বে বলে গেছেন। অপর পক্ষে বহু কারণের সমবায়ে যে একটি ফল ফলে, এ-ও হচ্ছে ন্যায়ের কথা। শেষোক্ত ধারণা মানুষের মনে জন্মালে সে তার কাছে যে-কারণ প্রত্যক্ষ, শুধু তারই দোহাই দেবে না, নানা কারণের সন্ধান নিতে ও তাদের পরস্পরের যোগাযোগ নির্ণয় করতে সে চেষ্টা করবে। আমরা যখন যথার্থই পলিটিকালি প্রবুদ্ধ হই তখন আর আমরা এক idea-র দাসত্ব স্বীকার করব না, নানা fact-এর উপর প্রভুত্ব করতে ব্রতী হব। 'কী হওয়া উচিত' তাই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করব না, কী হচ্ছে তা চেয়ে দেখতে উৎসুক হব, এবং দরকার হলে সেটিকে হয় এগিয়ে দিতে, নয় বাধা দিতে চেষ্টা করব।

২

Karl Marx বলেছেন যে পৃথিবীতে ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সবই হচ্ছে মূলত

economic এক কারণে মানুষের সকল কাজের ব্যাখ্যা করার এই হচ্ছে একটি চূড়ান্ত উদাহরণ।

মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় যে শুধু তার উদরেরই বিকার, এমন কথা বিনা পরীক্ষায় হজম করা কঠিন। এ মত পুরোপুরি তারাই ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করতে পারে, যাদের পেটে ক্ষিধে আছে কিন্তু মাথায় বুদ্ধি নেই।

সুতরাং Karl Marx-এর এ মতের উপর আক্রমণ ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে আর আজও চলছে।

তবে Karl Marx-এর প্রচারিত সুসমাচার যাঁরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই স্বীকার করেন যে, পলিটিক্স হচ্ছে মুখ্যত economic আর যাঁরা অত দুর পর্যন্ত এগুতে রাজি নন তাঁরাও স্বীকার করেন যে পলিটিক্স ও ইকনমিক্স-এর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

জ্ঞানীর কথা ছেড়ে দিলেও জনসাধারণের বিশ্বাস তাই। আমরা যখন বলি mass জেগে উঠছে, তখন সে জাগরণের অর্থ ইকনমিক, না পলিটিকাল? তা যে ষোল আনা ইকনমিক, তার প্রমাণ জনসাধারণকে পলিটিকাল অবস্থার দোষ-গুণ তার ইকনমিক ফলাফল দিয়েই বোঝাতে হয়, কারণ তারা নিজেদের ইকনমিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ যুগের পলিটিক্সের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হচ্ছে Liberty, Equality and Fraternity এ তিনটি হচ্ছে যে-দেশের কথা, সেই দেশে, অর্থাৎ ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে এর ভিতর equality কথাটাই জনসাধারণের সব চাইতে মনঃপূত আর তাদের কাছে equality-র অর্থ হচ্ছে আহারের equality, কারণ ক্ষিধে জিনিসটে আদিম ও সার্বজনিক। বাছুর ভূমিষ্ঠ হয়েই অমনি উঠে, ছুটে গিয়ে গো-মাতার বাঁটে মুখ দেয়। এ কাজ করবার জন্য তার কোন রূপ শিক্ষার প্রয়োজন নাই, শিক্ষা তাকে করতে হয় পরে লাঙল বইতে আর গাড়ি টানতে। আর তার মানুষ মাস্টার তাকে এ শিক্ষা দিতে কখনই ত্রুটি করেন না, অবশ্য পাঁচনের সাহায্যে। এরই নাম পশুজাতির technical education.

৩

মানুষ পশুই হোক আর মূর্খই হোক, এ জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই আছে যে—ইকনমিক্স হচ্ছে পলিটিক্সের প্রাণ। যদি কেউ দেশের লোককে ডেকে বলেন যে আমার মত মেনে যদি তোমরা আমার পথে চলো, তা হলে আমাদের দেশ পৃথিবীতে politically সব চাইতে বড় দেশ হবে এবং সেই সঙ্গে দেশের লোক পর্যন্ত দরিদ্র হবে, তা হলে কি মনে করেন যে জনগণ তাঁর জয়জয়কার করবে? যিনি দেশবাসীর ইকনমিক উন্নতি কি অধোগতির কারণাবলীর সন্ধান রাখেন না, তাঁকেও বলতে হবে আমার অনুমত দেশের পলিটিকাল অবস্থা ঘটলে, ঘরে ঘরে

গোলাভরা ধান ও পেঁটরাভরা কাপড় আপনিই এসে যাবে। যে idealism-এ মানুষের মন ভোলে সে হচ্ছে economic ideialism. ধর্মের চাইতে ত আর বড় শিক্ষা নেই আর সে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্গলাভ আর স্বর্গের চাইতে ত ideal আর এ বিশ্বে নেই। সে ideal যে ইকনমিক ideal তা বলাই বেশি। কারণ স্বর্গ হচ্ছে সেই রাজ্য যেখানে মানুষ কিছুই না produce করে সবই consume করতে পারে। সুতরাং politically প্রবুদ্ধ হওয়ার অর্থ যে সেই সঙ্গে economically প্রবুদ্ধ হওয়া, সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। আর আমরা যে এ ক্ষেত্রেও প্রবুদ্ধ হয়েছি তার প্রমাণ আমরা সকলে সমস্বরে বলছি যে বিদেশি মাল আমদানি ও বিদেশে মাল রপ্তানি করতেই আমাদের সর্বনাশ ঘটেছে। অতএব আমাদের ইক-নমিক রোগের মহৌষধ হচ্ছে protection, [বাঙলা] ভাষায় যাকে বলে রক্ষা-কবচ। এ মতেরও মূলে আছে, এক কারণে সব জিনিসের ব্যাখ্যা করবার প্রবৃত্তি আর এ প্রবৃত্তি হচ্ছে মানসিক অলসতারই পরিচায়ক। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে protection ও free trade— এই দুটি উলটো মতের মধ্যেই সকল ইকনমিক চিন্তা পেন্ডুলামের মতো অহর্নিশি যাতায়াত করছে। যে-মুহূর্তে এর একটি মত 'নাস্তি'র কোঠায় পড়ে যাবে সেই মুহূর্তে মানুষের সকল ইকনমিক চিন্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর বলা বাহুল্য যে জীবন মানে হচ্ছে activity, শুধু শরীরের নয়, মনেরও activity. সুতরাং এর কোন activity বন্ধ হওয়া মানে মৃত্যু।

৪

সাধারণ হিসেবে ধরলে protection কথাটার ইকনমিক শাস্ত্রে কোন মানে নেই। দেশের ইকনমিক স্বার্থসাধন করতে, কোন বিশেষ মালকে protect করা উচিত কি না, সেইটেই হচ্ছে ভাববার ও বিচার করবার কথা। ইকনমিক্সের মূল কথা হচ্ছে production কেননা মানুষের মূল প্রবৃত্তি হচ্ছে consumption আর ভগবানের নিয়ম এই যে, না produce করে মানুষে consume করতে পারে না। আর free trade-এর মূল কথা হচ্ছে যে দেশে দেশে production-এর বিনিময় হলেই সঙ্গে সঙ্গে consumption-এরও বিনিময় হয়। বলা বাহুল্য এমন কোন দেশ হতে পারে না, যে-দেশ শুধুই consume করবে, কিছুই produce করবে না, কারণ সে কিছুই produce না করলে অন্য দেশের production-এর সঙ্গে কী বিনিময় করবে? অপর দেশ থেকে যদি কোন মাল আমদানি করতে চাই— ত সে মাল নিজেদের pro-duce করতে হবে। নিজে produce করে নিজে তা consume করব, এর চাইতে আর সোজা হিসেব কী হতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন দেশেই produce-এর স্বার্থের সঙ্গে consume-এর স্বার্থের সামঞ্জস্য আজও হয়নি। হয়েছে যা তা হচ্ছে capital ও labour-এর বিরোধ, কারণ labour মনে করে যে সে

producer হয়েও consumer হতে পারছে না। আর capital মনে করে যে সে দেশের রক্ষক, অতএব স্বজাতির ভক্ষক হবার অধিকার তার আছে।

সে যাই হোক দেশ নামক একটা abstract পদার্থের পক্ষে protection ভাল হলেও দেশবাসীর পক্ষে তা ভাল কি না সেটা তর্কের বিষয়ই থেকে যায়। কেননা কোন ক্ষেত্রে তা ভাল হতে পারে, কোন ক্ষেত্রে তা মন্দ হতে পারে।

এ সব কথা আজ বলছি এই জন্যে যে এ দেশে steel-এর যে protection দেওয়া হচ্ছে, সে লোহার রক্ষা-কবচের ফলাফল দেশের লোকের পক্ষে ভাল কি মন্দ তা বুঝতে পারছি নে, আর কেউ তা আমাদের বুঝিয়েও দিচ্ছেন না, যদিচ দেশের political শুভাকাঙ্ক্ষী লোকের দেশে অভাব নেই। এ বিষয়ে আমাদের কাগজপত্রের নীরবতায় মনে হয় ভরতবর্ষের পলিটিকাল আত্মা জাগ্রত হলেও তার পলিটিকাল বুদ্ধি আজও সজাগ হয়নি।

পা পী য় দি ব স

সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এমন কতকগুলি শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের শক্তি ও সৌন্দর্য যুগে যুগে মানুষের মর্ম স্পর্শ করে। ইংরাজিতে এ ধরনের শ্লোক পাওয়া যায় না, তার কারণ অল্প কথায় অনেক কথা বলবার কৌশল classical সাহিত্যের যেমন ছিল, বর্তমান সাহিত্যের তেমন নেই। ভাষা সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা classical সাহিত্যের প্রধান গুণ। বাচালতা হচ্ছে এ কালের লেখকদের ধর্ম, বিশেষত বেশির ভাগ বিলেতি লেখকদের।

এই জাতীয় একটি শ্লোক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত আছে। আনন্দ-বর্দ্ধনাচার্য বলেন— শ্লোকটি 'মহর্ষের্ব্যাসস্য'। এ শ্লোকটির সাক্ষাৎ আমি সম্প্রতি মহাভারতের আদিপর্বে পেয়েছি; এবং এ স্থলে সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ প্রত্যুপস্থিতা দারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।।'

অস্যার্থ— সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, দারুণ কাল উপস্থিত। দিনের পর দিনগুলি সব পাপীয় দিবস। এক কথায়, পৃথিবী এখন গতযৌবনা।

এই কি আজকের দিনের প্রকৃত অবস্থা নয়? আর বর্তমানের যথার্থ অবস্থার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা আর কী হতে পারে? পৃথিবী 'গতযৌবনা'— ঐ একটি বিশেষণেই আমাদের কালের বিশ্রী রূপকে প্রকাশ করেছে।

২

আমাদের, এমনকী সমগ্র মানবজাতির যে দারুণ কাল উপস্থিত, এ জ্ঞান আমার অনেক দিন থেকেই হয়েছে। গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তার প্রমাণ জগৎজোড়া economic depression এবং বঙ্গোপ-সাগরের depression-কে যেমন আমরা ধমকে দূর করতে পারি নে, এ ইকনমিক depression দূর করাও প্রায় তাদৃশ দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য বলছি এই জন্যে যে, ইউ-রোপে ইতিমধ্যে অসংখ্য Economics-এর বই লেখা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্বমানবের গোলা ধানে ভরে ওঠেনি। প্যাটরাও বস্ত্রপূর্ণ হয়নি। মানুষের বর্তমান

দারিদ্র্যের কাবণ নাকি অন্নবস্ত্রের হ্রাস নয়— অতিবৃদ্ধি। ইংরাজিতে যাকে বলে Poverty amongst Plenty— এর কোন প্রতিকার আছে কি?— ধনী সম্প্রদায় বলেন— ফসলের জন্মনিরোধ করো। এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, কেননা আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Economics-এর M.A নই। আর যদি হতুম, তা হলেও নীরব থাকতুম। কারণ এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে শুরু করলে সাহেবলোকে বলত— মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসি পড়ে তাঁতি! তবে এ দারিদ্র্য যে গত যুদ্ধের কুফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩

বোধ হয় এ দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধ। গত যুদ্ধে যে ক্ষতি করেছে, আগামী যুদ্ধে তা পূরণ করবে। বিষস্য বিষমৌষধং, এ কথা ত সেকেলে চিকিৎসাশাস্ত্রের মহাবাক্য, এ কালেরও তাই। Auto-vaccine-এর অর্থ কী?

সে যাই হোক, আগামী যুদ্ধের মূলে যে ধনলিপ্সা আছে, তা বলা বাহুল্য। যদি ধরে না-ও যে তা নয়, নিষ্কাম ধর্ম হিসাবেই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছে— তা হলে ত ব্যাপার আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এই আসন্ন যুদ্ধের ফলে যে মানবজাতির সর্বনাশ হবে, এ ভয় আমি পাই। যুদ্ধকালে ভয় পায়— বিশেষত এই বোমাবৃষ্টির যুগে। এমনকী, যোদ্ধারাও বোধ হয় পায়।

গত যুদ্ধ হয়েছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এ বার কিন্তু অনেক দিন থেকেই পৃথিবীর পলিটিকাল আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, সুতরাং যে-কোন দিন বজ্রপাত হতে পারে, এ ভয় পাবার জন্য কোন রূপ দিব্য দৃষ্টি থাকবার প্রয়োজন নেই। অনেকের যেমন ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাস নেই, আমি তেমনি অমরতায় বিশ্বাসহীন। আমি অদম্য optimist নই।

৪

আগামী যুদ্ধের মূল দুর্বার ধনলিপ্সাই হোক, আর রণলিপ্সাই হোক, এ যুদ্ধ দু'চার দিন মুলতুবি থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধ কিছুতেই হবে না। ইউরোপীয় সভ্যতা যখন আত্মহত্যার জন্য লালায়িত হয়েছে, তখন সে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। লোকের মন যখন অধঃপাতের দিকে ঝোঁকে, তখন তার মুখের কথা কেতাদুরস্ত হলেও, তার মতিগতি উজান বয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও কেউ স্থগিত করতে পারেননি, যদিও কুরুক্ষেত্রের এ যুদ্ধে অমত ছিল। ঋষিদের ধর্মোপদেশ, এমনকী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছিল; শান্তির সপক্ষে আজ যে-সব কথা বলা হচ্ছে, সেকালেও সে সব কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু কোন ফল হয়নি। আজও হবে

না। ভালো-মন্দের জ্ঞান দু'দিন আগে জন্মায়নি; আজ শুধু সে জ্ঞান নষ্ট হতে বসেছে।

আজ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর। আজও বজ্রপাত হয়নি, কিন্তু পৃথিবীর আকাশ বাতাস electricity-তে পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় শুনতে পাই চতুষ্পদ পশুরা অস্বস্তি বোধ করে। আর আজকাল দ্বিপদ ও চতুষ্পদে তফাৎ যে দু'পা মাত্র। তাই আকাশ যে আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে না, এ ভরসা আমি পাচ্ছি নে।

৫

মিউনিকের আপোষ-মীমাংসার পিঠ-পিঠ আমি 'শান্তি না শাস্তি' নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, সেটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার পরেই আমি আর একটি প্রবন্ধ লিখি, যাতে ইংলন্ডের সঙ্গে রাসিয়ার সন্ধির প্রস্তাব করি। আমার ধারণা ছিল যে, Bolshevism-এর গতি হচ্ছে ভবিষ্যৎ ডিমোক্রাসির দিকে। অবশ্য ইংলন্ডে আজ যে ডিমোক্রাসি আছে, তার সংশোধিত সংস্করণ। সে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করিনি, কারণ বই পড়ে রাসিয়ার বর্তমান হালচাল ঠিক বোঝা যায় না। অতএব সে বিষয় নীরব থাকাই শ্রেয়।

সম্প্রতি Chamberlain কিছুকাল ধরে রাসিয়ার সঙ্গে গুফতগু করেছিলেন, সে কথোপকথনের ফলে দেখলুম যে Stalin-এর সঙ্গে Hitler-এর সন্ধি হয়ে গিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। যদিও Boshevism-এর সঙ্গে Nazism-এর অনেক মিল আছে, তা হলেও Communism-এর মারাত্মক শত্রু হচ্ছে Fascism. ইতালি, জার্মানি ও জাপান, এই তিন শক্তি মিলিয়ে Communism-কে ধ্বংস করে পৃথিবীময় অধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই জার্মানির সঙ্গে রাসিয়ার সখ্যের কথা শুনে মনে হয়েছিল— কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

৬

আজ আবার শুনছি Soviet-এর মন্ত্রীসভা এ চুক্তিতে রাজি হননি। আর যে-যে কারণে রাজি হননি, তার অন্তরে moral কারণও আছে। Art for Art কথাটি গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু politics for politics একটা সর্বনেশে কথা। সে politics-এর অন্তরে morality-র সংস্রব নেই, সে পলিটিক্স তির্যকসামান্য।

এর থেকে অনুমান করছি যে, রাসিয়ার সঙ্গে জার্মানির যদি কোন মিটমাট না হয়, তা হলে 'যুদ্ধ বন্ধ' হলেও হতে পারে। কারণ রাসিয়ার দেহও প্রকাণ্ড, শক্তিও বিপুল। কিন্তু রাসিয়া যে এ সময় শান্তিরক্ষা করতে পারবে, এ আশা করা যায় না, কারণ আজকের দিন পাপীয় দিবস। তা ছাড়া রাসিয়ানরাও ইউরোপীয়, অতএব অবিশ্বাস্য।

সকালে যা অনুমান করেছি, বিকেলে শুনছি তা ঘটেছে।

আমি এ প্রবন্ধ ব্যাসদেবের একটি কথা দিয়ে আরম্ভ করেছি, এখন ব্যাসদেবের আর একটি কথা দিয়ে তা শেষ করি। যখন কুরুপাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন—

সামদানের দ্বারা বিজয় শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা বিজয় মধ্যম, আর যুদ্ধের দ্বারা বিজয় জঘন্য।

সুতরাং এ যুদ্ধে কে হারে কি জেতে তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যাপারটাই জঘন্য। এর পরে কী আসবে?— পাপীয় দিবস।

যু দ্ধে র ক থা

আমি কিছুদিন পূর্বে লিখেছিলুম যে, যুদ্ধের বিষয়ে আর কথা কইব না। কিন্তু এ কথা ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়!

এ যুদ্ধ অবশ্য আমাদের দেশে হচ্ছে না, হচ্ছে ইউরোপে। ইংলন্ডের মারফৎ যে ইউরোপের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা পলিটিকালি ইংলন্ডের অধীন; হয়ত এ যুদ্ধের ফলে সে অধীনতা থেকে মুক্ত হব। কিন্তু তারপর কার অধীন হব, কিম্বা স্বদেশে anarchy হবে কি না, তা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে সভ্যতার একটি অঙ্গ— সম্ভবত উত্তমাঙ্গ। এ যুদ্ধ জার্মানরা সুরু করেছে democracy ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু democracy শুধু একটা বিশেষ রাষ্ট্রতন্ত্র নয়, আসলে ওটা হচ্ছে বিশ্বমানবের একটি মনোভাব, যার উপর democracy প্রতিষ্ঠিত। এ মনোভাব ইউরোপ গত দু'শ বৎসর ধরে গড়ে তুলেছে। ডেমোক্রাসির ধ্বংস মানে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস; কারণ ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা liberalism হতে উদ্ভূত। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

আমরা সেই জাতকেই সভ্য বলি, যে-জাতের স্ব-স্ব ধর্ম, নীতি, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রকলা, বিরাট মঠ, মন্দির প্রভৃতি আছে।

আমরা যে আমাদের অতীত নিয়ে গৌরব করি, তার কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেদ-বেদান্ত, নানা দর্শন, কাব্য, সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রবিদ্যার সম্যক্ চর্চা করেছিলেন; এবং তাঁদের রচিত কাব্য, দর্শন প্রভৃতি নগণ্য নয়।

এ যুদ্ধে আমাদের মন ইউরোপের কাব্য, দর্শন প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই নবজাত সভ্যতার প্রাণ হচ্ছে liberty. অর্থাৎ শুধু পলিটিকাল স্বাধীনতা নয়— চিন্তার স্বাধীনতা, মনের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার বাণীই ইউরোপের নব-বাণী। এবং ইউরোপে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তা এই মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মনোভাবকেই আমি liberalism বলি।

এই liberalism-এর ভিতর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই মনোভাব আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল। এই liberalism নষ্ট করাই Hitler-এর উদ্দেশ্য। এই নব সভ্যতা ও তার

অন্তর্নিহিত মনোভাব দ্বারা আমরাও যে অনুপ্রাণিত— তার পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়।

আমরা হরিজনকে জাতে তুলতে চাচ্ছি, অর্থাৎ জাতিভেদের অত্যাচার দূর করতে চাচ্ছি; এক কথায় জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করতে চাচ্ছি। আমরা সোশ্যালিজম প্রবর্তন করতে চাচ্ছি, মানুষ মাত্রকেই শিক্ষিত করতে চাচ্ছি।

আমরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়েছি। এর মোদ্দা কথা হচ্ছে— সকলকেই মানুষ হিসেবে দেখতে শিখেছি— জনগণকেও, স্ত্রীলোকদেরও। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করাই হচ্ছে liberalism-এর বড় কথা।

আমরা স্বরাজ লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছি। ইংরাজিতে যাকে বলে nationalism, তা-ও liberalism-এর এক অঙ্গ।

তারপর democracy হচ্ছে liberalism-প্রসূত। মানুষ মাত্রেরই রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট মতবাদ আছে, সেই মতামতকে স্পষ্ট স্বীকার ও গ্রহণ করাই democracy-র মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্বে সভ্য ছিলুম বলে— এই সব সভ্য মনোভাব কতকটা আত্মসাৎ করতে পেরেছি।

আমরা দূর থেকে যতটুকু জানতে পাই, তার থেকে মনে হয়, জার্মানি এই যুগসঞ্চিত সভ্যতাকে ধ্বংস কবতে উদ্যত হয়েছে, আর প্রায় কৃতকার্য হয়েছে। পুরাকালে হূণ নামক নরপশুর দল যে-ভাবে ভাবতবর্ষের যুগসঞ্চিত সভ্যতা নষ্ট করতে ব্রতী হয়েছিল— এ কালে জার্মানিও সেই ভাবে ইউরোপের সভ্যতা নষ্ট করতে ব্রতী হয়েছে।

Liberalism অবশ্য ইউরোপে হঠাৎ আবির্ভূত হয়নি। বিরোধী মতের সঙ্গে লড়াই করে জয়যুক্ত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেন— violence, তা হচ্ছে শক্তির অপপ্রয়োগ ও দুষ্টপ্রয়োগ।

জার্মানি একটি শক্তিশালী সভ্য দেশ। আর ইউরোপীয় সভ্যতাও জার্মানির কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী। জার্মানরা হূণ নয়, শুধু শক্তির দুষ্টপ্রয়োগে তাদের সমতুল্য।

জার্মান জাতের একটি গলদ ছিল। তাদের পণ্ডিতদের চিন্তা এ জাতের ক্ষত্রিয়দের কর্ম কখনও প্রতিহত করেনি। যুদ্ধ যে অনেক রাজনৈতিক সমস্যার আশু সমাধান করে, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য; এবং জার্মানির শাসনকর্তারা ও গুরু পুরোহিতরা উভয়ে মিলে সমগ্র দেশটাকে প্রত্যক্ষদর্শী করে তুলেছে। এর নাম তারা দিয়েছে real politics, আর এই real-ই সকল রকম ideal-এর মূলোচ্ছেদ করছে। জার্মানি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ইউরোপের একটি অগ্রগণ্য দেশ; সুতরাং জার্মানি সভ্যতা ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে কেন?

আমি ইউরোপীয় নব সভ্যতাকে liberalism বলেছি। জার্মানি এই নব সভ্যতার পরিপন্থী। কেন?— তার বিচার করতে হলে— জার্মানির গত তিনশ বৎসরের ইতিহাসের হিসেব দিতে হয়। এ প্রবন্ধে সে আলোচনার অবসর নেই। আমি কোন বাহ্য ঘটনার আলোচনা করতে চাই নে; কেবলমাত্র এ জাতির মনোভাবের পরিচয় দিতে চাই।

জার্মানি কখনও liberalism-কে প্রশ্রয় দেয়নি। আমি পূর্বে বলেছি— এ যুগের nationalism liberalism-এর একটি অঙ্গ। এ মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন গ্রাহ্য, জাতি-স্বাতন্ত্র্যও তেমনি গ্রাহ্য। উভয়েই হচ্ছে ব্যক্তির ও জাতির আত্মোন্নতির উপায় মাত্র। এর জন্যই এক জাতির পক্ষে অন্য জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া কর্তব্য। Internationalism-এর যে-সকল বিধি ইউরোপে এত দিন মান্য ছিল— সে সবই এই মনোভাব থেকে প্রসূত। বড় মাছটা ছোট মাছ খায়, এ মাৎস্যন্যায়ের উপরে নব সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।

জার্মানি নব-কল্পিত nationalism-এর অবাধ স্ফূর্তির পক্ষে এ জাতীয় internationalism-কে অন্তরায় জ্ঞানে অন্ধ nationalism-এর ভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মাৎস্যন্যায়কেই ধর্ম বলে গ্রাহ্য করেছে। এ যুদ্ধের প্রথম থেকেই জার্মানি এই যুদ্ধ-ধর্মের অনুসরণ করছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত ফর্দ দিচ্ছি।

প্রথমে জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেছে। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী Chamberlain তাতে কোন আপত্তি করেননি। হয়ত সে সময় ইংলন্ড Russia-র সঙ্গে যোগ দিলে এ যুদ্ধ এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত না।

তারপর জার্মানি অস্ট্রিয়া গ্রাস করেছে বিনা যুদ্ধে।

তারপর জার্মানি পোল্যান্ড জয় করেছে— Chamberlain-এর বিপক্ষতা সত্ত্বেও। কিন্তু ইংলন্ড Poland-এর কোন সাহায্য কার্যত করতে পারেনি। Russia-ও এই সুযোগে অর্ধেক পোল্যান্ড অধিকার করেছে।

তারপর Russia ফিনল্যান্ড নামক একরত্তি দেশের অর্ধেক গ্রাস করেছে। তারপর জার্মানি ডেনমার্ক গ্রাস করেছে। ডেনমার্ক ক্ষুদ্র দেশ, তার পক্ষে জার্মানির সঙ্গে লড়ে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ফলে ডেনমার্ক আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানির কাছে।

তারপর জার্মানি নরওয়ে আক্রমণ করেছে এবং খুব সম্ভব সে দেশকে প্রথমে বিধ্বস্ত ও শেষে আত্মসাৎ করবে। ইংলন্ড নরওয়ের কোন সাহায্য করতে পারেনি।

তারপর জার্মানি হল্যান্ড আক্রমণ ও অধিকার করেছে।

তারপর জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ ও আত্মসাৎ করেছে।

এ সব দেশই জার্মানির তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ। এই ছোট দেশগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত।

হল্যান্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে এসেছিল আর অনেক ভূভাগ করায়ত্ত

করেছিল। ডেনমার্কের অধিবাসীরা অর্থাৎ দিনেমাররা শ্রীরামপুরের পত্তন করেছিল। অপর দেশগুলির লোক, যত দূর জানি, কখনও ভারতবর্ষে ব্যবসা ও লুঠতরাজ করতে আসেনি।

আজ জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করেছে এবং প্রথম ধাক্কায় জয়যুক্ত হয়েছে। ফলে জার্মানরা ইংলন্ড আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করছে।

আজকের দিনে কাল কী হবে আজ তা বলা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভালো।

ইউরোপের পূর্বোক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি যে এত দিন আত্মবশ ছিল এবং যথেষ্ট আত্মোন্নতি করেছিল, তার মূলে ছিল সেই সভ্য মনোভাব— যাকে আমি liberalism বলেছি। কারণ, এদের কারও আত্মরক্ষা করবার শক্তি ছিল না। ইউরোপের বড় রাজ্য তিনটি— ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি যখন খুশি তখনই এদের গ্রাস করতে পারত।

আমি যে-সভ্যতাকে নব-সভ্যতা বলেছি, সে সভ্যতা ইউরোপীয়রা একমাত্র ইউরোপের জন্যই গড়েছিলেন— বিশ্ব-মানবের জন্য নয়। এই একদেশদর্শিতাই ছিল এ সভ্যতার প্রধান দোষ।

এশিয়া ও আফ্রিকার উপর ইউরোপীয়গণ যে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, তার মূলে ছিল প্রভু-মনোভাব। প্রভু-মনোভাবের সঙ্গে পশু-মনোভাবের নাড়ীর যোগ আছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এ ভূ-ভাগের মানুষকে তাঁরা কখনও মানুষ জ্ঞান করেননি। তাঁদের liberalism সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয়। আজকের দিনেও ইংলন্ড ভারতবর্ষকে যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রাখতে চান।

এ নব সভ্যতার বাণী বুদ্ধদেবের বা যীশুখ্রিস্টের বাণীর মতো সর্বলোকগ্রাহ্য বাণী নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা যদি কোন কালে ধ্বংস হয়— তবে এই প্রভু মনোভাবের ফলে মারামারি কাটাকাটি করেই ধ্বংস হবে।

উ প র - চা ল

ইউরোপে আজ যে চতুরঙ্গ খেলা হচ্ছে তার আমরা দর্শক— অতএব উপর-চাল দিতে পারি।

ইংলন্ড আজ বিপদে পড়েছে। সেই সঙ্গে আমরাও বিপদে পড়েছি।

পৃথিবীতে কারও বিপদ— অপর কারও সম্পদ নয়। বিপদ হঠাৎ আসে, সম্পদ ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়।

এ যুগে ইউরোপের দুটি মহাদেশ হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংলন্ড; অবশ্য আকারে নয়।

ইংলন্ড হচ্ছে ইউরোপের একটেরে একরত্তি দেশ। অথচ রাজনীতির হিসাবে অগ্রগণ্য দেশ। রাজনীতি হচ্ছে সেই রাজ, যার ভিতর নীতি নেই।

ফ্রান্স এখন নেই, ইংলন্ড থাকবে কি না, এই হচ্ছে বর্তমান সমস্যা।

আমার মনে হয়, এ বার ইংলন্ড জার্মানির ধাক্কা সামলাতে পারবে। ফ্রান্সের মতো উলটো ডিগবাজি খাবে না। ফ্রান্সের মতো জার্মানির native states হবে না।

এ বিশ্বাসের কারণ বলছি।

ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছিলাম সেকালে চীনেরা বিদেশীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য একটি বিরাট দেওয়াল দিয়ে স্বদেশ ঘিরেছিল, আর নিশ্চিন্ত হয়ে শান্ত সভ্যতা গড়েছিল। তারা বারুদ তৈরি করেছিল আতসবাজি করবার জন্য।

সে বিরাট প্রাকার বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

ফ্রান্স গত যুদ্ধের পর একটি দেশ-জোড়া প্রাকার গড়েছিলেন, যার নাম Maginot Line.

এ প্রাকারও ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। জার্মানরা তার পাশ কাটিয়ে ফ্রান্সের বুকের ভিতর প্রবেশ করেছে।

সুতরাং দেখা গেল, কি চীন, কি ফ্রান্স— বেড়ার আড়ালে ঘুমতে পারেনি।

ইংলন্ডের প্রধান সহায় প্রাকার নয়— পরিখা। এ পরিখা পার হতে হয় জাহাজে চড়ে জলপথে।

হিটলারের বেশি জাহাজ নেই। আছে অগুনতি উড়োজাহাজ।

এ জাহাজে উড়ে গিয়ে শত্রুর দেশ পুড়িয়ে আসা যায়, কিন্তু দেশ ছাই করা

আর জয় করা এক জিনিস নয়। এই জন্য মনে হয়, হিটলারের খেচর সৈন্য পবননন্দনের মতো ইংলন্ডে লঙ্কাকাণ্ড করে আসতে পারে— কিন্তু ঐ একরত্তি দেশকে ট্যাঁকে গুঁজতে পারবে না। স্বয়ং রামচন্দ্রকে সেতুবন্ধ করতে হয়েছিল— কপিসৈন্য পার করবার জন্য। তবে যদি হিটলার আবার কোন নতুন বৈজ্ঞানিক ভেল্কিবাজি দেখান। কারণ তাঁর মন্ত্র হচ্ছে— যন্ত্রের সাধন কিংবা জাতির পতন।

ইংলন্ডের পরিখার উপর আমার ভরসা আছে, কেননা তার অলঙ্ঘ্যতার নজির আছে।

কিন্তু বর্তমানে ইংলন্ড যে মহাবিপদে পড়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এবং আমরা যে বিপদে পড়েছি সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

বাণভট্ট বলেছেন যে, মহাপ্রলয়ের সময় প্রতি লোক মনে করে যে সব ধ্বংস হয়ে যাবে— কিন্তু সে টিকে থাকবে।

এ রকম দুরাশা যে হাস্যকর, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমরা যেখানে যে-ভাবে ছিলুম, ঠিক সেইখানে সেই ভাবে থাকব— এ রূপ মনে করা পাগলামি।

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও ওলটপালট হতে বাধ্য।

হিটলার যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য এ দিগ্বিজয় শুরু করেছেন, এমন ত মনে হয় না, কারণ তিনি ইউরোপের নানা দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছেন। এ যুদ্ধের ধাক্কায় স্বাধীন দেশ অধীন হচ্ছে, অধীন দেশ স্বাধীন হচ্ছে না।

আমাদের দেশে কী ওলটপালট হবে, তা দু'দিন পরেই দেখা যাবে।

এ দেশের ভাগ্যবিধাতাদ্বয় নাকি গান্ধী ও জিন্না।

এ যুদ্ধের ধাক্কায় হিন্দুস্থান-পাকিস্থান অথবা পাতিস্থান হবে, তা-ও যেমন অসম্ভব— আর হিন্দুস্থান মাঙনা স্বাধীনতা লাভ করবে, তা-ও তেমনি অসম্ভব।

আমাদের বিশ্বাস, ইংরেজ আমাদের সভ্য করেছে।

এ সভ্যতার অর্থ কী জানেন?— ইংরাজি শাসনে আমাদের পঙ্গু করেছে, আর ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের অন্ধ করেছে নিজেদের পঙ্গুত্বের বিষয়ে। যদিচ সে শিক্ষায় বহির্জগতের বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটেছে।

আমরা ইউরোপের বড় বড় কথা শুনে শিখেছি, যে কথা তারা গড়ে তুলেছে তাদের যুগযুগান্ত সাধনার ফলে। সুতরাং তাদের মহাবাক্য সব আমাদের মুখস্থ হয়েছে মাত্র।

Idea-র সঙ্গে জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। Idea আমাদের শক্তিপ্রয়োগের দিকনির্ণয় করে দেয়, কিন্তু আমাদের মনে আলগা idea নতুন শক্তি সঞ্চার করে না।

তা ছাড়া নূতন নূতন ism-এর ঠেলায় আমাদের মনও ঘুলিয়ে গিয়েছে। যদিও কোন সুরসিক ব্যক্তি বলেছেন যে, এখন সব ism হয়ে গেছে wasm!

তবে আমরা নানা রকম পলিটিকাল আদর্শ লেখায় ও বক্তৃতায় গড়তে পারি এবং গড়েও থাকি।

পঙ্গু চলতে না পারুক, উড়তে পারে স্বপ্নে। সে স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখছি। স্বপ্ন দেখবার জন্য কিন্তু আগে ঘুমনো দরকার।

এই প্রচণ্ড যুদ্ধের ধাক্কায়ও আমাদের ঘুম ভাঙাতে পারেনি।

আমাদের এ ঘুম নাকি যে-সে ঘুম নয়, আধ্যাত্মিক নিদ্রা; ইংরাজিতে যাকে বলে spiritual trance.

এই যোগনিদ্রার ফলেই আমাদের সভ্যতা পরাশ্রিত (parasitic) সভ্যতা।

সেই জন্যেই বলছি ইংলন্ডের বিপদে আমাদেরও বিপদ। কারণ পরাশ্রয়বঞ্চিত হলেই আমরা নিরাশ্রয় হব।

তখন আমাদের ঘুম ভাঙবে।

র চ না নি র্দে শ ও প্রা স ঙ্গি ক টী কা

সংস্কৃত চর্চা। প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, চৈত্র ১৩২৯, পৃ. ৭৩২-৭৩৪।

সংস্কৃত চর্চা ২। প্রকাশ : অলকা (কাশীধাম), বর্ষ ২, সংখ্যা ৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ২৩২-২৩৫। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

তিনটি R : শিক্ষা প্রসঙ্গে 3 R বলতে বোঝায় Reading, Writing, (A)rithmatic. Sir William Curtis নামে লন্ডনের এক অল্ডারম্যান ১৮ শতকে প্রথম এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন।

গীতগোবিন্দ : ১২ শতকে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-সংক্রান্ত গীতিকাব্য।

শুকসপ্ততী : সংস্কৃত কথাসাহিত্য। এর দুটি রূপ পাওয়া যায়— চিন্তামণি ভট্ট রচিত বৃহদাকার সংস্করণ (১২ শতকের পরে রচিত) এবং পূর্ণভদ্র-কৃত জৈন সংস্করণ। এ ছাড়া দেবদত্ত নামে এক লেখকের নামে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায়। এটি ৭০টি গল্পের সংকলন। ১৪ শতকে 'তুতিনামা' নামে এর ফার্সি অনুবাদ হয়।

সোমদেব : সোমদেব গুণাঢ্য-র বৃহৎকথা অবলম্বনে কথাসরিৎসাগর রচনা করেন।

গুণাঢ্য : কিংবদন্তি অনুসারে গুণাঢ্য বৃহৎকথা পৈশাচিক প্রাকৃতে রচনা করেন। তাঁর পুথিটি লুপ্ত হয়ে যায়। বৃহৎকথা অবলম্বনে বুদ্ধস্বামী শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। গুণাঢ্য আনুমানিক ১ম শতকের লোক এবং তিনি সম্ভবত রাজা সাতবাহনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

অবদান : অবদান সাহিত্য সর্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুশীলিত। প্রধানত উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবদান গ্রন্থগুলি প্রণীত হয়। এর দুটি ভাগ— প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু। এই গল্পগুলির সাহায্যে সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল বর্ণিত হয়।

বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা। প্রকাশ : 'আত্মশক্তি' (নবপর্যায়), বর্ষ ২, সংখ্যা ৪২, ২০ মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৩। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

গত শনিবারের চিঠি : শনিবারের চিঠি [নবপর্যায়], বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, মাঘ ১৩৩৪।

"আমাদের লিখিত ভাষায়. . .দাঁড়াই?": উদ্ধৃতিটি বলাহক নন্দী-র প্রসঙ্গ-কথা (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪) থেকে নেওয়া।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল : আমেরিকান লেখক ওয়াশিংটন আরভিং-এর লেখা একটি গল্পের নাম 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'। গল্পটি ১৮১৯-এ লেখা এবং এর মূল চরিত্রর নাম হল রিপ ভ্যান উইঙ্কল। গল্পটি The Sketch Book of Geoffrey Crayon নামক এক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ : কাজি নজরুলের এই প্রবন্ধটি বেরোয় 'আত্মশক্তি' [নবপর্যায়], বর্ষ ২, সংখ্যা ৩৭, ১৪ পৌষ ১৩৩৪ [৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭], পৃ. ৩-৪-এ।

উত্তরা : বেনারস থেকে প্রকাশিত বাংলা সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক : সুরেশ চক্রবর্তী। প্রথম সংখ্যা বেরোয় আশ্বিন ১৩৩২-এ।

সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট! : এটি প্রমথ চৌধুরীর সনেট-পঞ্চাশৎ-এর অন্তর্গত প্রথম কবিতা 'সনেট'-এর শেষ চরণ।

শ্রীমান দিলীপকুমার : দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)। কবি, গায়ক, সুরকার, লেখক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর পুত্র। রচিত গ্রন্থ : গীতসাগর, সাঙ্গীতিকী, দুধারা, দোলা, দ্বি-চারিণী, তীর্থঙ্কর প্রভৃতি।

সাহিত্যের কলহ। প্রকাশ : মহিলা (সাপ্তাহিক), বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, ২৬ বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৯-১১। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য বিতর্ক শুরু করেছেন. . . : এখানে প্রমথ চৌধুরী 'মহিলা' (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেগুলি হল : "আধুনিক বাঙ্গালা নাটক" ('মহিলা', বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ৫ বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ২৩-২৬; "আলমগীর" ('মহিলা', বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ১১ বৈশাখ, ১৩৩১, পৃ. ২৮-৩১ এবং "আলমগীর" ('মহিলা', বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, ১৯ বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ১৮-২২)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০)। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতেন। মহেঞ্জোদড়োর প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার রাখালদাসের অবিস্মরণীয় কীর্তি। মুদ্রাতত্ত্বেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বাঙ্গালার ইতিহাস (১৩২১), প্রাচীন মুদ্রা (১৩২২), পাষাণের কথা, The Origin of Bengali Script, Palas of Bengal, ইত্যাদি।

বাঙ্গালার ইতিহাস : ১৩২১-এ দু'খণ্ডে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। এতে প্রথম খণ্ডে লক্ষ্মণ সেন পর্যন্ত ও দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের বাংলা জয় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

শিশিরবাবু : শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নাট্যাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৯)। ইংরাজির অধ্যাপক, অভিনেতা। প্রথমে শৌখিন অভিনেতা হিসেবে নাম করেন। ম্যাডাম কোম্পানির রঙ্গালয়ে 'আলমগীর' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে পেশাদার অভিনয়-জীবন শুরু করেন ১০ ডিসেম্বর ১৯২১-এ। পরে অনেক চরিত্রে, যেমন চাণক্য, রঘুবীর, নিমচাঁদ (সধবার একাদশী), রামচন্দ্র (সীতা), চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা) অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরে ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছিলেন।

আলমগীর : প্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ি ৫ বৈশাখ ১৩৩১ হতে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত আলমগীর নামে ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। আলমগীর-এর অভিনয় এটিই নতুন নয়, এর আগে বিখ্যাত ধনী শ্রীজামসেদজি মদন তাঁর 'বাঙ্গালা নাট্য সমাজ'কে দিয়ে এ নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-উপাখ্যান নিয়ে 'রাজসিংহ' রচনা করেন, সেই উপাখ্যান নিয়েই আলমগীর হয়েছিল।

ফরাসি সাহিত্য। প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ. ১৮৭-১৯২।

সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৯২৭-২৮-এ তিনি ফ্রান্স থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসেন। কলকাতায় প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে 'ভারত-রোমক সমিতি' (Indo-Latin Society) তৈরি হয়, তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Le Rasa (Paris, 1927).

Bergson Henri Bergson (১৮৫৯-১৯৪১)। ফরাসি লেখক ও দার্শনিক। ১৯২৮-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তার লেখার স্টাইল নিয়ে প্রমথ চৌধুরী লেখেন : 'বর্তমান ইউরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিক বের্গ্‌সঁ-র গ্রন্থসকলের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎপরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, সে-সকল গ্রন্থ কাব্য হিসাবেও সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। বের্গ্‌সঁ-র দর্শন অতি কঠিন, কিন্তু তাঁর রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি উজ্জ্বল। দার্শনিক-জগতের এই অদ্বিতীয় শিল্পীর হাতে গদ্যরচনা অপূর্ব চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। মণিকার যেমন রত্নের সঙ্গে রত্নের যোজনা করেন, বের্গ্‌সঁ-ও তেমনি পদের সঙ্গে পদের যোজনা করেন।' (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ. ১১১)।

Bel Ami : মোপাসাঁ-র দ্বিতীয় উপন্যাস (১৮৮৫)। এটি এক সাংবাদিকের (Georges Duroy) কাহিনী।

Telemacque : Francois Fenelon-এর উপন্যাস 'The Adventure of Telemachus' (1699)-এর একটি চরিত্র। এতে ফরাসি রাজতন্ত্রর সমালোচনা করা হয়েছিল।

Fenelon : Francois Fenelon (1651-1715). ফরাসি রোমান ক্যাথলিক কবি ও লেখক। The Adventure of Telemachus ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Dialogues, The Royal Way of the Cross, Maxims of the Saints, The Inner Life ইত্যাদি।

Daudet · Alphonse Daudet (1840-1897). ফরাসি ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Sapho (1884), Le Nabab (1877), Les Rois en exil (1879) L' Immortel (1888) ইত্যাদি।

Gautier . Pierre Jules Theophile Gautier (1811-1872). ফরাসি কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক। রোমান্টিসিজম্-এর ঘোর সমর্থক। বালজাক, বোদলেয়ার, ফ্লবেয়ার প্রমুখ তাঁর লেখার প্রশংসা করতেন। প্রমথ চৌধুরী গতিয়ের এর একটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন— "দুই না এক", 'ভারতী', বর্ষ ২৩, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩০৬, পৃ. ৭৩-৮২।

Loti : Pierre Loti (1850-1923). ফরাসি লেখক ও নৌ-অফিসার। লোতি-র আসল নাম Julien Viaud. নৌবিদ্যা শিক্ষার শেষে ১৮৮০-তে প্রকাশ করেন Rarahu, পুনর্মুদ্রণের সময় বইটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় : Le Marriage de Loti. এই বই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। অন্যান্য বই : Flowers of Boredom, An Iceland Fisherman, The Story of a Child ইত্যাদি।

Littré Dictionary · Paul-Émile (1801-1881) ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত, অভিধানপ্রণেতা ও দার্শনিক। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব : Dictionnaire de la Langue Francaise, Dictionary of the French Language, 4 Volumes (1863-1873). ফরাসি দার্শনিক অগস্ত কোঁতে-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং কোঁতে-র দর্শন প্রচারে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

Webster Dictionary · Noah Webster (1758-1843). আমেরিকান অভিধানপ্রণেতা। তাঁর বিখ্যাত অভিধানের নাম American Dictionary of the English Language (1828), লোকমুখে Webster Dictionary নামে অধিক পরিচিত। এই অভিধানে আমেরিকান ইংরিজি বানানের স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়।

Flaubert : Gustave Flaubert (1821-1880) ফরাসি লেখক। Madame Bovary-র (1857) লেখক হিসেবে তিনি সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য গ্রন্থ : Salambo (1862), La Temptation de Saint Antoiné (1874) ইত্যাদি। তাঁর হাত ধরেই ফরাসি সাহিত্যে রিয়ালিজম আসে। তাঁর সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র লিখেছেন, '. . . রোমান্টিসিজ্‌মের প্রতিবাদ স্বরূপেই ফ্রান্সের নব রিয়ালিজ্‌ম জন্মগ্রহণ করে। কল্পনার পরিবর্তে রিজ্‌ন ফরাসি সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসি রিয়ালিস্টরা তাদের জাতীয় বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে আবার সত্যের সন্ধানে বহির্গত হয়েছিল। এবং সে সত্য কুৎসিতই হোক আর বীভৎসই হোক, ফরাসি রিয়ালিস্টরা তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। রোমান্টিক দল ফরাসি সাহিত্যকে যা দান করে গিয়েছেন সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ। রিয়ালিস্টদের নেতা ফ্লোবেয়র সেই নূতন উপাদান নিয়েই পুরাতন রীতিতে সাহিত্য গঠন করেছেন। এর ফলে ফ্লোবেয়র এবং

তাঁর শিষ্য মোপাসাঁর ন্যায় শিল্পী জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।' (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ. ১২২)।

Moliere : ফরাসি নাট্যকার Jean Baptiste Poquelin (1622-73)-এর ছদ্মনাম। মূলত ব্যঙ্গধর্মী হাসির নাটক লিখতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : L'E'cole des femmes (1662), Tartuffe (1664), Le Misanthrope (1666), L'Avare (1668) ইত্যাদি। প্রমথ চৌধুরীর মতে : 'বৈজ্ঞানিক যে ভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে মোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এ-সকল মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মোলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।' (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ. ১১৪)।

Zola : E'mile Zola (1840-1902). প্রভাবশালী ফরাসি ঔপন্যাসিক। ন্যাচারালিজম্-এর প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : Nana (1880), Germinal (1885), La Terre (1888), La Debacle (1892) ইত্যাদি।

Anatole France · Anatole France (1844-1924) ফরাসি কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক। ১৯২১-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। আসল নাম : Jacques Anatole Thibault. ফ্রেঞ্চ আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Thais (1890), La Revolte des Anges (1914), Le Livre de mon Ami (1885) ইত্যাদি।

Thackeray William Makepeace Thackeray (1811-1863). ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Vanity Fair (1847-1848), Pendennis (1848), Esmond (1852) ইত্যাদি।

Esmond : William Makepeace Thackeray-র ১৮৫২-তে প্রকাশিত উপন্যাস। একটি ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম ভাগ। এর পরের দুটি হল : The Virginians (1857-59) ও The Newcomes (1853-55).

Modern Painters : ব্রিটিশ লেখক John Ruskin-এর পাঁচ খণ্ডে আধুনিক শিল্পীদের ওপর আলোচনা। এর প্রথম দু'খণ্ড বেরোয় ১৮৪৩-তে ও শেষ তথা পঞ্চম খণ্ড বেরোয় ১৮৬০-এ।

ভারত রোমক সমিতি। বিচিত্রা, বর্ষ ১, খণ্ড ২, সংখ্যা ৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ. ৭৪৯-৭৫৬।

Indo-Latin Society : ভারত রোমক সমিতি বা Indo-Latin Society সম্পর্কে হারীতকৃষ্ণ

দেব লিখেছেন : 'সুবোধ মুখুজ্যে আর প্রবোধ বাগচী তখন (১৯২৭-২৮) ফ্রান্স থেকে ফিরেছেন 'ডক্টর' উপাধি পেয়ে। বিশেষ করে এই দু-জনের উদ্যোগে আমরা একটা সংস্কৃতি সমিতি করেছিলুম যার সভাপতি হলেন প্রমথ চৌধুরী। ডক্টর সুনীতি চাটুজ্যে, ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ যাঁরা ফরাসি ভাষার অনুরাগী— আমাদের দলে ছিলেন। এই সমিতির বৈঠক বসত দু-সপ্তাহ অন্তর। বৈঠকের স্থান ছিল আশুতোষ বিল্ডিং-এর দোতলায়। (সবুজ পাতার ডাক, পৃ. ৯১)

d'Annunzio . Gabriele d'Annunzio (১৮৬৩-১৯৩৮)। ইতালীয় কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। সাহিত্যে Decadent Movement-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক আছে। ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল। আসল নাম Gaetano Rapagnetta.

Belloni : Ferdinado Belloni-Filippi (7 July 1877-24 January 1960). সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইতালীয়। University of Rome-এ অধ্যাপনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখেছেন : 'Tagore' (Roma A F Formiggini, 1920, pp 66).

Stendhal : Marie-Henri Beyle (1783-1842) Stendhal ছদ্মনামেই বেশি পরিচিত। ফরাসি ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখায় রিয়ালিজম-এর লক্ষণ দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : The Red and the Black (1830), The Charterhouse of Parma (1839) ইত্যাদি।

Taine · Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893). ফরাসি চিন্তাবিদ, সমালোচক ও ইতিহাসবিদ। ফরাসি 'ন্যাচারালিজম'-এর তত্ত্বে তাঁর প্রভাব পড়েছিল। Sociological Positivism-এর প্রবর্তক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : History of English Literature (1863-64), On Intelligence (1871) ইত্যাদি।

Rabelais : Francais Rabelais (1494-1553) প্রভাবশালী ফরাসি রেনেসাঁ-লেখক, ডাক্তার ও মানবতাবাদী। তাঁর দুটি বিখ্যাত বই : La Vie Inestimable de Gargantua (1535) এবং Faits et dits heroiques du grand Pantagruel (1535).

Gide · Andre Gide (1869-1951). ফরাসি লেখক, প্রাবন্ধিক। ১৯৪৭-এ সাহিত্যে নোবেল পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : La Symphonie Pastorale (1919), Les Faux-Monnayeurs (1926)। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Racine : Jean Racine (1639-1699). ফরাসি নাট্যকার। Moliere-এর বন্ধু। উল্লেখযোগ্য নাটক : Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bajazet (1672), Iphigénie (1674), Phidre (1677). পরে লেখেন দুটি ধর্মীয় নাটক : Esther (1689) ও Athalie (1691).

Montaigne : Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). ফরাসি প্রাবন্ধিক। তাঁর Essays-এর প্রথম দু'খণ্ড তিনি ১৫৫০-এ ও ১৫৮৮-তে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন।

আধুনিক প্রবন্ধ তাঁর হাতেই রূপ লাভ করে। ১৬০৩-এ জন ফ্লোরিও তাঁর প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর প্রবন্ধ ইংরাজি লেখক ও চিন্তাবিদ্‌দের অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

St.-Beuve Charles Augustin Sainte Beuve (1804-1869). বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্য-সমালোচক। ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Volupte (1835), Les Lundis (1851-1872), Causeries du lundi (15 vols., 1851-1862), Portraits Contemporaino (1846) ইত্যাদি।

Pascal Blaise Pascal (1623-1662). ফরাসি দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Lettres Provinciales (1656), Pensees (1670) ইত্যাদি।

Duplex Joseph Francois Duplex (1697-1763). ফরাসি প্রশাসক। ১৭১৫-তে ভারতে আসেন। ১৭৪২-এ ফরাসি-ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। ভারতের রাজনীতিতে ফরাসি প্রভাব বিস্তার করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। আর্কট-এর যুদ্ধে (১৭৫১) ইংরেজ প্রশাসক ক্লাইভ জয়লাভ করলে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ও ১৭৫৪-তে ফ্রান্সে তাঁকে ফিরে যেতে হয়।

Proust . Marcel Proust (1871-1922). ফরাসি লেখক। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Remembrance of Things Past (1913-1927)-এর জন্যই তিনি অধিক পরিচিত।

Valery : Paul Valery (1871-1945)। ফরাসি কবি। প্রতীকবাদী (Symbolist) দলের অন্যতম সদস্য। এই দলের নেতা ছিলেন কবি মালার্মে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : La Jeune Parque (1917), Charmes ইত্যাদি।

পশ্চিমের আত্মরক্ষা। মাসিক বসুমতী, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৫৯৬-৫৯৮।

Miss Mayo : Katherine Mayo (1867-1940). আমেরিকান সাংবাদিক ও গবেষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Justice for All (1917), Mother India (1927), Slaves of the Gods (1929), The Standard Bearers (1930), The Face of Mother India (1935). সব চাইতে বিতর্কিত ও বিখ্যাত গ্রন্থ Mother India. বইটি প্রকাশের পর ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বিতর্ক হয়। মহাত্মা গান্ধি বইটির বক্তব্যকে অসত্য বলে সমালোচনা করেন। ১৯ শতকের বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও বইটিকে সুনজরে দেখেননি। প্রতিবাদে অনেক লেখালেখিও হয়। তার মধ্যে অন্যতম : সি.এস. আয়ার রঙ্গ-র Father India.

Rene Guenon: Rene Jean Marie Joseph Guenon (1886-1951). ফরাসি লেখক ও দার্শনিক। সুফিবাদ, অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী ও আধুনিকতার সমালোচক। অধিবিদ্যা-চর্চায় উৎসাহী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Introduction to the Study of the Hindu Doctrines (1921) ও Man and His Becoming According to the Vedanta (1925).

Jacques Maritain Jacques Maritain (1882-1973). ফরাসি ক্যাথলিক লেখক ও দার্শনিক, ৬০টিরও বেশি বই লিখেছেন। আধুনিক কালে টমাস অ্যাকুইনাস-চর্চা শুরু হয় তাঁরই উৎসাহে। The Universal Declaration of Human Rights-এর খসড়া তৈরিতেও তাঁর অবদান আছে।

Ossendowski Ferdynand Antoni Ossendowski (1876-1945)। পোলিশ লেখক, বৈজ্ঞানিক, সংবাদিক ও পর্যটক। রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে (Russian Civil War) পোলিশ যোদ্ধা হিসেবে যোগ দেন। লেনিন-এর ওপর একটি উপন্যাস রচনা করেন। তবে তিনি বিখ্যাত হন Beasts, Men and Gods (1921-22) বইটি লিখে। এটি রাশিয়ার যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিজের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

Kol . Kol-Chak (1873-1920)। অপর নাম Alexander Vasilyevich. রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক, অ্যাডমিরাল। সাইবেরিয়ার ১৯১৮-য় Anti-Bolshevik Movement-এর নেতা।

Oswald Spengler. Oswald Spengler (1880-1936) জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। বিখ্যাত গ্রন্থ : Decline of the West (1918-22) এই বই ও অন্যান্য রাজনৈতিক লেখায় তিনি ইতিহাসের দর্শন ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে ১৯ শতকে পুঁজিবাদ প্রবর্তনের পর থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়। নাৎসিরা তাঁর সমর্থক ছিল।

Count Keyserling . Count Hermann Graf Keyserling (1880-1946). জার্মান লেখক ও দার্শনিক। School of Wisdom-এর প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Creative Understanding, The Travel Diary of a Philosopher, America Set Free প্রভৃতি।

প্রবোধ বাগচী : প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬)। প্রাচীন ভারত ও বৌদ্ধধর্ম বিশেষজ্ঞ। বিখ্যাত গ্রন্থ : চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র, সংস্কৃত-চীনা অভিধান, দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা, Studies in the Tantras ইত্যাদি। তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন।

পূর্ব ও পশ্চিম : সবুজ পত্র, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১১-১২, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩৪-এ 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন প্রমথ চৌধুরী (পৃ. ৭৩৫-৭৫০)। ঐ সংখ্যাতেই ঐ নামে আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী (পৃ. ৭৫১-৭৬৩)।

Chesterton : Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). ব্রিটিশ লেখক। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ— সব ধরনের লেখা লিখতেন। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ : Wine, Water and Song (1915), The Ballad of the White Horse (1911). বিখ্যাত উপন্যাস : The Napoleon of Notting Hill (1904), The Innocence of Father Brown (1911), The Flying Inn (1914), ও The Man Who Knew too Much (1922).

Herbert Spencer : Herbert Spencer (1820-1903). ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ : Principles of Psychology (1855), Education (1861). System of Synthetic Philosophy-র দশ খণ্ডে তিনি তাঁর দর্শন-ভাবনা প্রকাশ করেন।

Massis : Henri Massis (1886-1970). ফরাসি রাজনীতিবিদ ও লেখক। রাজনীতিতে দক্ষিণমার্গী। তাঁর সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী লেখেন : 'মাসি বর্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্ধর লেখক। তিনি প্রথমে ছিলেন রেনাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস-এর মন্ত্রশিষ্য। পরে তিনি আরিস্টটল ও যিশুখৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর পূর্বের শিক্ষাগুরু ও সতীর্থদের উপর নির্মমভাবে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সমালোচনার বাণ উক্ত সাহিত্যিকদের বধ না করতে পারুক, কিছুকিঞ্চিৎ জখম যে করেছে, সে বিষয়ে ফ্রান্সের সাহিত্যসমাজে দ্বিমত নেই। মাসি প্রথমত অতি চটকদার লেখক, দ্বিতীয়ত অতি শক্তিমান লেখক; উপরন্তু খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টান দর্শনে তাঁর বিশ্বাস অটল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং মারাত্মক লেখক হয়ে উঠেছেন। তাই যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী নন তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর মতামতের ভিতর অনেক নিগূঢ় সত্য আছে। তবে সকলেই বলেন তাঁর দোষ এই যে, অবিশ্বাসী সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর কোনোরূপ মায়ামমতা নেই। দ্বিতীয় কুমারিল ভট্টের মতো তিনিও ফরাসি সাহিত্যরাজ্যে নাস্তিকনিগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ইনি সম্প্রতি 'ইউরোপের আত্মরক্ষা' নামক একখানা বই লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন এদ্‌মঁ ঝালু নামক জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক।' (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ. ৪১৫)

Frederic Lefevre : Frederic Lefevre (1889-1949). ফরাসি সাহিত্য-সমালোচক।

Rene Grousset : Rene Grousset (1885-1952). ফরাসি শিল্প-ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ও লেখক। ফরাসি আকাদেমি-র সদস্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Civilization of India, The Empire of the Steppes : A History of Central Asia প্রভৃতি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর A History of Central Asia-র কথাই উল্লেখ করেছেন এ প্রবন্ধে।

St. Thomas : St. Thomas Aquinas (c.1226-1274). খ্রিস্টান দার্শনিক ও ধর্মবিশারদ। মধ্য যুগের Schoolmen-দের অন্যতম। Doctor Angelicus নামে পরিচিত। Boethius ও Aristotle-এর ওপর তিনি টীকা রচনা করেন। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Summa Contra Gentiles এবং Summa Theologica

Simon কমিশন : ভারতের শাসনব্যবস্থার সংস্কার করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ৭ জন ব্রিটিশ M.P. নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে ১৯২৭-এর নভেম্বর মাসে। সার জন সাইমন ছিলেন এর সভাপতি। এই কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকায় এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষেই হরতাল করা হয়। লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে হরতাল করার সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায়-এর মৃত্যু হয়।

সাহিত্য ও পলিটিক্স। নবযুগ, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ. ৩৩-৩৫।

সাহিত্যে সৌজন্য। প্রকাশ : স্বদেশী বাজার, বর্ষ ১, সংখ্যা ৯, মাঘ ১৩৩৫।

Essays in Criticism : ১৮৬৫-তে প্রকাশিত Matthew Arnold-এর এক সমালোচনা গ্রন্থ। ১৮৬৫-তে বেরোয় এর First Series এবং ১৮৮৮-তে বেরোয় Second Series.

Carlyle : Thomas Carlyle (1795-1881). স্কটিশ লেখক। বিখ্যাত গ্রন্থ : French Revolution (1837), On Heroes, Hero-Worship, Past and Present (1843) ইত্যাদি।

Ruskin John Ruskin (1819-1900). ব্রিটিশ লেখক। শিল্পবিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য বই : Modern Painters (1843), The Seven Lamps of Architecture (1849), The Stones of Venice (1851-53). তাঁর লেখার সুবাদে টার্নার ও প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকরদের নতুন ভাবে মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তা করেন। এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বই : Unto This Last (1862), Sesame and Lilies (1865) ও The Crown of Wild Olive (1866).

বেদান্তের শঙ্করভাষ্য : এর আর-এক নাম শারীরক ভাষ্য।

মাতৃভাষায় স্বরাজ্য। প্রকাশ : সচিত্র বর্ষবাণী, বর্ষ ৪, ১৩৪০, পৃ. ৭-৮।

Don Quixote : স্প্যানিশ লেখক Miguel De Cervantes-এর দু'খণ্ডে (১৬০৫ ও ১৬১৫) প্রকাশিত উপন্যাস। স্প্যানিশ সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী উপন্যাস।

Robinson Crusoe : ১৭১৯-এ প্রকাশিত Daniel Defoe-র উপন্যাস। মূল চরিত্র Robinson Crusoe এবং তার আত্মজীবনীই এর মূল বিষয়। কথিত আছে উপন্যাসটি নাকি Alexander Selkirk-এর জীবনীর আধারে লেখা।

Gulliver's Travels : আইরিশ লেখক Jonathan Swift-এর লেখা উপন্যাস (১৭২৬-১৭৩৫)। এই ব্যঙ্গ-রচনাটি ইংরেজি সাহিত্যে এক ক্লাসিক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।

Grimm's Fairy Tales : বইটির আসল নাম Children and Household জেকব ও ভিলহেম গ্রিম— যাঁরা গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত— ১৮১২-তে কতকগুলি জার্মান রূপকথার গল্প প্রকাশ করেন। বইটি Grimm's Fairy Tales নামেই বেশি পরিচিত।

আজকের মারাত্মক সমস্যা। দেশ, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, ১৫ পৌষ ১৩৪০, পৃ. ৫৮।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক। পরে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৪০-এ তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে বৈদিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। অনুন্নত হিন্দুদের উন্নতির জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সাহায্য করে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কর্মযোগ, মায়াবাদ, সনাতন হিন্দু, মণিভদ্র প্রভৃতি।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়. . .যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছেন : প্রবন্ধটির নাম : 'বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ত্তমান সমস্যা' (দেশ সাপ্তাহিক), বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, ৮ পৌষ ১৩৪০/ ২৩ ডিসেম্বর

১৯৩৩, পৃ. ৫৭-৬২)। প্রবর্তক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভি-ভাষণ হিসেবে পঠিত।

এ কথার বিরুদ্ধে কাগজে কলমে প্রতিবাদ করি : সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী তাঁর লেখক জীবনের প্রথম দিকে লেখা "তেল নুন লকড়ি" (ভারতী, বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১০, মাঘ ১৩১২) *প্রবন্ধটির কথা বলছেন।*

Bergson সম্প্রতি ইউরোপের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন : সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী Bergson-র লেখা The Two Sources of Morality and Religion (1932) বইটির কথা বলছেন। এই বইটি নিয়ে পরে তিনি আর কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

দুটি সমস্যা। মহিলা (সাপ্তাহিক), বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ৫ বৈশাখ ১৩৩১।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে. . .দুই সম্প্রদায়ের কী রূপ সম্বন্ধ ছিল : প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাঙলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'মাসিক বসুমতী'তে দুটি কিস্তিতে লেখেন "বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান" (বর্ষ ৩, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ২১৫-২১৯ এবং বর্ষ ৩, খণ্ড ১, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ. ১২৫-১২৯)।

রমাই পণ্ডিত : মধ্যযুগীয় বাংলা কবি, শূন্যপুরাণ-এর লেখক। জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। সম্ভবত ১৩ বা ১৪ শতকে তাঁর জন্ম। বৌদ্ধধর্মের 'শূন্যতত্ত্ব'র গোঁড়া সমর্থক। তাঁর পুত্র ছিলেন ধর্মদাস।

মোপলা বিদ্রোহ : এই বিদ্রোহ 'মালাবার বিদ্রোহ' নামেও পরিচিত। ১৯২১-এ মালাবার প্রদেশের মাপ্পিলা মুসলিমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। প্রথম দিকে খিলাফৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই আন্দোলন শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা হিন্দু জমিদারদের (jennis) ও অন্যান্য হিন্দুদের হত্যা করে এই অভিযোগে যে তারা ব্রিটিশ পুলিশদের গোপনে মোপলাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে। ব্রিটিশরা কঠোর ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'Wagon Tragedy', যেখানে মালগাড়ির এক ওয়াগনে ভরে নিয়ে যাওয়ার সময় মোপলা বিদ্রোহীদের ৯০ জনের মধ্যে ৬০ জন শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ১। মাসিক বসুমতী, বর্ষ ২, খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৩০, পৃ. ৪১২-৪১৭।

'চুপ' 'চুপ' : প্রমথ চৌধুরী "চুপ চুপ" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন মাসিক বসুমতী-তে (বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪, শ্রাবণ ১৩৩৩, পৃ. ৭২৫-৭২৬)। পরে এটি 'সবুজ পত্র'-এও (আশ্বিন ১৩৩৩) প্রকাশ করা হয়।

'Forward' : চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজি পত্রিকা। ২৩ অক্টোবর ১৯২৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম হয় 'Liberty'.

বিজয়কৃষ্ণ বসু : চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী, স্বরাজ পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি নেতা।

সংগীত ও গোলমাল : সঙ্গীত নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-মারামারি হয় তার প্রভাব নিয়ে প্রমথ চৌধুরী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এর 'ভারতী'তে লেখেন 'সঙ্গীত কি তুচ্ছ জিনিষ?'।

কোকোনদ কংগ্রেস : ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৩ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯২৪ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কোকনদে ৩৯তম ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন মৌলানা মহম্মদ আলি।

John Strachey : Sir John Strachey (1823-1907). ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সিভিলিয়ান। তিনি ১৮৪২-এ Bengal Civil Service-এ যোগ দেন ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলান। ১৮৭৪-এ তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর বা ছোটলাট হন। তাঁর ভাই Richard Strachey-এর সঙ্গে লেখেন : The Finances and Public Works in India (1882), India (1888), Hastings and the Rohila War (1892) ইত্যাদি।

Theodore Beck · Theodore Beck (1859-1899). ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ। তাঁকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মহমেডন অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (M A O College, পরে আলি-গড় মুসলিম ইউনিভারসিটি)-এর প্রথম অধ্যক্ষ হতে আহ্বান জানান। তিনি মাত্র মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৮৮৩-তে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

ভারতবর্ষের উপর Strachey-র বই : বইটির নাম 'India'. প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৮-তে।

Nineteenth Century : ইংরাজি মাসিক পত্রিকা। Sir James Knowles ১৮৭৭-এ সাহিত্য বিষয়ক এই পত্রিকাটি চালু করেন। ১৯০১-এ এর নাম হয় Nineteenth Century and After, চলে ১৯৭২ পর্যন্ত।

[United] Patriotic Association : সার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংঘ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)-এর বিরোধিতা করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রিটিশদের সুসম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছিল।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ২। প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ. ৯১৯-৯২২।

Unity Conference : হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বন্ধ করা ও উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে Unity Conference আয়োজিত হয় ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরে। তার আগে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য গান্ধিজি ২১ দিনের অনশনব্রত শুরু করেন ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে। ২৬ সেপ্টেম্বর গান্ধিজিকে উপবাস ব্রত ভঙ্গ করতে অনুরোধ করা হবে, Unity Conference-এ এই রিজলিউশন নেওয়া হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, গান্ধি তা নাকচ করে দেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। প্রকাশ : ভারতী, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ. ১১০-১১৩। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

Passion Play যিশুখ্রিস্টের জীবনের নানান দিক, যেমন তাঁর বিচার, যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, ইত্যাদি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে-নাটক অভিনয় করা হয়, তাকে Passion Play বলে। এটি খ্রিস্টান, বিশেষ করে ক্যাথলিকদের এক চিরায়ত প্রথা।

তারিখ ই বাদায়নী : আকবর শাহের সুন্নি সভাসদ আবদুল কাদির বাদায়নী-র লেখা বই তারিখ-ই-বাদায়নী সম্পর্কে 'বীরবল' নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লেখেন : আকবর শাহের আমলের যত ইতিহাস ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে তারিখ-ই-বাদাউনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রথম কারণ, মৌলবী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্টভাষা; দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে রাগদ্বেষ ছিল বলে তাঁর লেখায় নুন-ঝাল দুই আছে, অপরাপর ইতিহাসের মতো তা পান্‌সে নয়। তা ছাড়া, তাঁর গ্রন্থ ইতিহাস না হোক, সাহিত্য। যদিচ বইখানির নাম তারিখ, তা হলেও সেটি শুধু ক্রনোলজি নয়, অর্থাৎ পাঁজি নয়, পুথি। (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ. ১৭১)

মৌলবী বাদাউনী : আবদুল কাদির বাদাউনী (১৫৪০-?)। আকবরের সভাসদ ও তারিখ-ই-বাদায়নী-র লেখক।

ফৈজী : বিখ্যাত পারসিক কবি এবং আকবর শাহের একজন প্রধান অমাত্য। আবুল ফজল-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আকবর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

আবুল ফজল : আবুল ফজল (১৫১১-?)। আকবরের অতি প্রিয় সভাসদ ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। নানা বিষয়ে আকবর তাঁর পরামর্শ নিতেন। তাঁরই উৎসাহে আকবর 'দিন-ই-ইলাহী' ধর্ম চালু করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী'।

কলিকাতার দাঙ্গা ১। প্রকাশ : 'মাসিক বসুমতী', বর্ষ ৫, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ. ১২৫-১২৭।

গোতম : ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা জনৈক মুনি।

সহিদ সুরাবর্দী : (১৮৯২-১৯৬৩)। অবিভক্ত বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি-বিদ। স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) হন। জিন্নার প্রিয়পাত্র। পরে আওয়ামী লিগ-এ যোগ দেন যেটি মুসলিম লিগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়ে ওঠে।

মৌলবী কলম আজাদ : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৯-১৯৫১)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী।

জে.এম. সেনগুপ্ত : যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩)। স্বরাজ্য পার্টির নেতা, দেশ-কর্মী ও চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী। ১৯২১-এ চট্টগ্রামে নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কলকাতা করপোরেশন-এ একাধিক বার মেয়র নির্বাচিত হন। ইংরেজ মহিলা নেলি গ্রে (পরে নেলি সেনগুপ্তা)-কে বিবাহ করেন।

আবদার রহিম : স্যার আবদার রহিম (১৮৬৭-১৯৫২)। বিখ্যাত জজ ও রাজনীতিবিদ, মুসলিম লিগ-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ১৯২৯-১৯৩৪ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং Central Legislative Assembly of India-র সদস্য (১৯৩৫-৪৫)।

কলিকাতার দাঙ্গা ২। প্রকাশ : ভারতী, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩৩৩। সবুজ পত্র, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, পৃ. ৭০৩-৭০৬। সবুজ পত্র-য় প্রবন্ধটির নাম ছিল "কলকাতার দাঙ্গা"। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন : এই সংঘ ১৮৫১-র ৩১ অক্টোবর স্থাপিত হয়। ১৯ শতকের বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সেক্রেটারি।

মৌলানা মহম্মদ আলি (১৮৭৮-১৯৩৯)। বিখ্যাত 'আলি ভাইদের' কনিষ্ঠ ভাই। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি ইংরাজিতে Comrade এবং উর্দুতে হামদরদ্ নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। কোকনদ কংগ্রেসের পরে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে মতবিরোধের ফলে 'মোসলেম লিগ' ও 'মোসলেম কনফারেন্স'-এ যোগ দেন।

Comrade : কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইংরাজি পত্রিকা। চালু হয় ১৯১১ য়।

Cultivate your own garden : ভলত্যের-এর এই উক্তিটি পাওয়া যায় Candide এ।

হিন্দু-মুসলমান। প্রকাশ : আত্মশক্তি (নবপর্যায়), বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ১৭ বৈশাখ ১৩৩৩। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

Gerhart Hauptmann (১৮৬২-১৯৪৬)। জার্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ১৮৮৯-এ তাঁর প্রথম নাটক Vor Sonnenaufgang প্রকাশিত হয়। সব-চেয়ে বিখ্যাত নাটক Die Weber (১৮৯২)। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : Der Narr in Christo Emanuel Quint (1910), Atlantis (1912). ১৯১২-য় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

Romain Rolland (১৮৬৬-১৯৪৪)। ফরাসি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। বিখ্যাত উপন্যাস Jean-Christophe (1904-12), যার জন্য তিনি ১৯১৫-য় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য নাটক : Danton ও Le 14 juillet.

গ্রাম্য পশু : এ বিষয়ে মহাভারতের শ্লোকটি : গ্রাম্যানাং পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সিংহাশ্চারণ্যবাসিনাম্।/ সর্বেষামেব ভূতানামন্যোন্যেনোপজীবনম্।। ১৬ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, অ. ৪)

নিবৃত্তে বিহিতে : শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ-র মহাভারতম্-এ আছে : নিবৃত্তে বিহিতে যুদ্ধে স্যাৎ প্রীতির্নঃ পরস্পরম্।/ যথাপরং যথাযোগং ন চ স্যাৎ কস্যচিৎ পুনঃ।। ২৭/ বাচা যুদ্ধপ্রবৃত্তানাং বাচৈব প্রতিযোধনম্। বঙ্গার্থ : 'প্রচলিত যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইলে সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সময় আমরা কেহই

কাহারও সহিত শত্রুতা করিব না। যাহারা বাক্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে।' (পৃ. ৩৫৬২-৬৩)। 'মহাভারত', প্রামাণিক সংস্করণ এ পাই : নিবৃত্তে চৈব নো যুদ্ধে প্রীতিশ্চ স্যাৎপরস্পরম্।/ যথাপুরং যথা-যোগং ন চ স্যাচ্ছলনং পুনঃ।। ২৭/ বাচা যুদ্ধে প্রবৃত্তে নো বাচৈব প্রতিযোধনম্। (ভীষ্ম-পর্ব, অধ্যায় ১)।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সাহিত্যিক ফলাফল। প্রকাশ : ভারতী, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ৬, (পূজা সংখ্যা), আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ৮২৬-৮২৭। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

দুর্মুখ : অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ সম্পাদিত সচিত্র ব্যঙ্গপত্রিকা। প্রথম সংখ্যা বেরয় শ্রাবণ ১৩৩২। এতে সামাজিক সমস্যা, সাহিত্য, রাজনীতি, নাটক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা থাকত।

ছোলতান : মওলানা মোহম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী সম্পাদিত পত্রিকা। ১৯০২-এ এটি বেরয় 'সোলতান' নামে ও বন্ধ হয় ১৯১০-এ। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় এটি 'ছোলতান' (নবপর্যায়) নামে আবার বেরয়। নবপর্যায়ে এর প্রথম সংখ্যা বেরয় বৈশাখ ১৩৩০-এ। হিন্দুসমাজে জনমত গঠনে ও খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

yellow peril "the political or military threat regarded as emanating from Asian peoples, esp the Chinese" (Concise Oxford Dictionary) কখনও-কখনও একে 'yellow terror'-ও বলা হয়।

বাঙ্লার কথা। প্রকাশ : সবুজ পত্র। বর্ষ ৭, সংখ্যা ৭, কার্তিক ১৩২৭, পৃ. ৪৪৪-৪৬২।

Gen Dyer Brigadier-General Reginald Edward Dyer (1864-1927). ব্রিটিশ-অধীন ভারতের এক আর্মি জেনারেল। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।

শওকত আলি : মৌলানা শওকত আলি (১৮৭৩-১৯৩৮)। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা। খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রথমে গান্ধিপন্থী ছিলেন, ১৯২৮-এ নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করে মুসলিমদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার দাবি করেন। ১৯৩৬-এ মুসলিম লিগ-এ যোগ দেন। মহম্মদ আলি জিন্নার ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

'আবার মোরে পাগল করে দিবে কে?' : রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম ও প্রকৃতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৫৩ নং গান (দ্র. গীতবিতান, পৃ. ৮৯০-৮৯১)।

বাঙালি পেট্রিয়টিজম : বাঙালি পেট্রিয়টিজম বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর নিজের একটি বিশেষ ধারণা ছিল। বিভিন্ন লেখাপত্রে সে ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন। ধারণাটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন বাঙালী পেট্রিয়টিজম নামে একটি প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭)।

আগামী কংগ্রেস। প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বর্ষ ১, খণ্ড ২, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ. ২৪৯-২৫১।

বুয়র যুদ্ধ : দুটি অ্যাংলো-বুয়র যুদ্ধ হয়। প্রথমটি হয় ১৮৮০-৮১-তে যা ট্রানস্‌ভাল যুদ্ধ নামে খ্যাত। এতে ডাচ বংশোদ্ভূত বুয়ররা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ হয় ১৮৯৯-১৯০২-এ। এই যুদ্ধে অংশ নেয় ট্রানসভাল রিপাবলিক ও অরেঞ্জ ফ্রিস্টেট-এর ডাচ-ভাষী বুয়ররা। পরে এই দুটি রিপাবলিক-কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Digby William Digby (1849-1904). ব্রিটিশ লেখক, সাংবাদিক, মানবতাবাদী। লন্ডনে ১৮৮৮-তে তিনি Indian Political and General Agency স্থাপন করেন— ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপদেষ্টা ছিলেন। উল্লেখনীয় গ্রন্থ : Famine Campaigns in Southern India, Prosperous British India প্রভৃতি। কিছুদিন The Madras Times-এর সম্পাদকও ছিলেন।

রমেশ দত্ত : রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ন। ১৮৯৮-এ রাজনীতিতে যোগ দেন ও ১৮৯৯-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর প্রথম সভাপতি। তিনিই প্রথম ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করেন (৮ খণ্ড)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Peasantry of Bengal, Economic History of British India, বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ প্রভৃতি।

ইলবার্ট বিল : লর্ড রিপন ১৮৮৩-তে একটি নতুন বিল আনেন যাতে বলা হয় জেলান্তরে ভারতীয় বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা ব্রিটিশ অপরাধীদেরও বিচার করতে পারবেন। এর আগে পর্যন্ত তা ছিল না (কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বাদে)। রিপনের আমলে Council of India-র আইন উপদেষ্টা কুর্টনে পেরিগ্রিন ইলবার্ট-এর নামে বিলটি পরিচিত। এই বিল-এর বিরুদ্ধে ব্রিটেনে ও ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশরা তীব্র আন্দোলনে নামেন। ১৮৮৪-তে এর অনেক পরিবর্তন করে আইনে পরিণত করা হয়।

বাঙলার বর্তমান। প্রকাশ : বিজলী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৯, ৯ চৈত্র ১৩২৯; পৃ. ৫-৬।

আনি বেসান্ত : আনি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩), ব্রিটিশ থিওসফিস্ট। ফ্যাবিয়ান সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি-র সান্নিধ্যে এসে থিওসফিস্ট হয়ে ওঠেন। ভারত ও আয়ারল্যান্ডে স্বায়ত্তশাসন বা 'home rule' সমর্থন করেন। ১৯১৫-তে Home Rule League নামে একটি সংগঠনও তিনি তৈরি করেন।

গৌড় : মহারাজা হরিসিং গৌড় (১৮৯৫-১৯৬১)। কাশ্মীরের মহারাজা।

গৌড়ের অসবর্ণ বিবাহ বিল : ১৯২৩ সালে সার হরিসিং গৌড়-এর পাস করানো হিন্দুদের অসবর্ণ বিবাহ সংক্রান্ত বিল। এই আইন-মতে নিজেকে অহিন্দু বলে ঘোষণা না-করেও

অসবর্ণ বিবাহ কবতে পারা যায়। কিন্তু এর মজা হল : এই আইন অনুসারে যিনি হিন্দু বিবাহ করেন, তিনি মৃত হলে কিন্তু তাঁর সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করা হবে খ্রিস্টানি আইন-মতে, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সাক্সেশন অ্যাক্ট অনুসারে। জ্যান্ত অবস্থায় হিন্দু আর মরলে খ্রিস্টান— এ এক অদ্ভুত আইন।

'Huxley শশধর আর goose' : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর 'হাসির গান'-এর অন্তর্গত 'Reformed Hindoos'-এর শেষ দুটি চরণ হল : "আমরা beautiful muddle, a queer amalgam/ of শশধর, Huxley and goose." এখানে শশধর হলেন শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮), প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও হিন্দু ধর্মের প্রচারক। ১৯ শতকের শেষের দিকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। Huxley হলেন Thomas Henry Huxley (1825-1895), ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, মানবতাবাদী ও চিন্তাবিদ, যিনি 'The Origin of Species' (1869) প্রকাশিত হবার পরে 'Darwin's Bulldog' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। আর goose মানে nonsense.

বাংলার ভাঁটার যুগ। প্রকাশ : খেয়ালী, শারদ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ. ৬-৭। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

Liberalism : ১৭-১৯ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা এক রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব যা ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের লিবারাল পার্টি অনুসরণ করে। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর On Liberty ও অন্যান্য লেখায় এই তত্ত্বের প্রধান নীতিগুলির কথা জানা যায়। এই তত্ত্ব রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজনীতিতে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার সমর্থক, বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থক এবং ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে।

আমাদের মতবিরোধ। প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ৩৬২-৩৬৫; সবুজ পত্র, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১১-১২, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ৫৮৮-৫৯৬।

কলকাতা কংগ্রেস : ১৯২০-র ৪-৯ সেপ্টেম্বরে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসে কলকাতায়। ৮ সেপ্টেম্বর গান্ধিজির নন-কোঅপারেশন বা অসহযোগ আন্দোলনকে কংগ্রেসের দলীয় কর্মসূচি হিসেবে স্বীকার করা হয়। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে প্রমথ চৌধুরী নিজেও উপস্থিত ছিলেন। এ কথা তিনি একটি চিঠিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন। এই চিঠিতে কলিকাতা (বিশেষ) কংগ্রেস সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একটি বিশেষ খবর দিয়েছেন : 'আমরা বাঙালীরা প্রায় সকলেই তাঁর (গান্ধির) বিরুদ্ধে ভোট দিই। তবু কাগজে দেখবে যে বাংলার ভোট গান্ধির বিরুদ্ধে ছিল ৩৯৪ এবং তাঁর পক্ষে ৫৫১— এই ৫৫১র প্রায় পাঁচশ ছিলেন হয় ফেজ নয় পগ্গধারী। জনকতক বাঙালীও অবশ্য ঐ মেড়োর দলে গিয়ে জুটেছিলেন...।' (আকাদেমি পত্রিকা ৪, পৃ. ১৩)

বার্দোলি রেজোলিউসান : কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বার্দোলি রেজোলিউশনে চৌরি-চৌরার হিংসার ঘটনার পর (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) নন-কোঅপারেশন আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই রেজোলিউসান নেওয়া হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এ।

ভি.জে. পাটেল : সর্দার বল্লভভাই জবারভাই (Jhaverbhai) প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০)। গান্ধিবাদী কংগ্রেস নেতা। স্বাধীন ভারতের স্বরাষ্ট্র (Home) ও তথ্য ও সম্প্রচার (Information & Broadcasting) মন্ত্রী। রক্তপাত ছাড়াই দেশীয় রাজ্যগুলিকে (Princely States) ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটিই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

বিপিনবাবু : বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। অসাধারণ বাগ্মী। বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায়-এর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে প্রচার চালান। সাংবাদিক হিসেবেও স্মরণীয়। বন্দেমাতরম্, The Hindu Review প্রভৃতি সম্পাদনা করেন।

গান্ধির বিচার : ১৯২২-এর ১০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে ৬ বছর হাজতবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। বিচারালয়ে গান্ধি বলেন : 'I am here, therefore, to invite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is deliberate crime, and what appears to me to be highest duty of a citizen' বিচারকক্ষে গান্ধির এই মন্তব্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। গান্ধির বক্তব্য শুনে তাঁর কঠোর সমালোচক প্রমথ চৌধুরীও গান্ধির মহত্ত্ব মেনে নেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : ". . .চাঞ্চল্য দেখেছিলাম বসুমতী অফিসে যেদিন প্রথিতযশা প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) গান্ধিজির বিচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠালেন— যিনি ছিলেন মহাত্মার চিন্তা ও কর্মের কঠোর সমালোচক, বিচারকালে প্রদত্ত গান্ধির বিবৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন এমন 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও সাহসী মানুষের সন্ধান কখনো তো মেলে নি।" (তরী হতে তীর, পৃ. ৮২)।

নাগপুর কংগ্রেস : ১৯২০-র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে চিত্তরঞ্জন দাশও গান্ধিজির নন-কোঅপারেশন-কে সমর্থন করেন।

মহাত্মার প্রায়শ্চিত্ত। প্রকাশ : মহিলা (সাপ্তাহিক), বর্ষ ১, সংখ্যা ২৫, ১৭ আশ্বিন ১৩৩১।

ভাগবত : ভাগবত বলতে শ্রীমদ্ভাগবত/শ্রীমদ্ভাগবতম্ পুরাণ বোঝায়। পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে এটিই সব থেকে জনপ্রিয়।

আমেদাবাদে গান্ধির অপদস্থ হওয়া : আমেদাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসর ৩৭তম অধিবেশন বসে। সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ থাকায় সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খান। এই অধিবেশনে গান্ধিজি অপদস্থ হন।

মহাত্মার প্রায়োপবেশন। প্রকাশ : নবশক্তি, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২২, ১৪ আশ্বিন ১৩৩৯।

মহাত্মার প্রায়োপবেশন : ব্রিটিশ সরকারের অমানবিকতার প্রতিবাদে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এ গান্ধিজি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন।

গান্ধির কথায় আর কাজে. . .তার প্রমাণ তিনি আজ দিয়েছেন : গান্ধিজির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বিশিষ্টতার পরিচয় প্রমথ চৌধুরী অনেক আগেই পেয়েছিলেন। তিনি ১৯০৩-এ গান্ধিজিকে যখন প্রথম দেখেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, 'আমার সঙ্গে তাঁর মতে না মিলুক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিহান হলুম যে তিনি এদেশের রাজনৈতিক দলের ভিতর একজন অগ্রগণ্য কর্মী। তিনি নিজের মত অনুসারে চলতে ও কাজ করতে যে তিল মাত্র দ্বিধা করবেন না, এ সত্য ঐ পাঁচ মিনিটের আলাপেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।' (বঙ্গের নেতৃবৃন্দ, অলকা, বর্ষ ২, সংখ্যা ৫, মাঘ ১৩৪৬)।

লোহার রক্ষাকবচ। প্রকাশ : বিজলী, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২৬, ২৬ বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৫২৯-৫৩০।

পাপীয় দিবস। প্রকাশ : অলকা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৬, পৃ. ১-৩।

অতিক্রান্ত. . . গতযৌবনা : শ্লোকটি আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক-এর তৃতীয়োদ্দ্যোতঃ-য় ৪২ নং উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে (দ্র. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৬২)। শ্লোকটি মহাভারত-এর আদিপর্ব-এ আছে। কালিপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদে (অধ্যায় ১২৮) পাই : 'সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই, দিন দিন পাপবৃদ্ধি হইতেছে, পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে।' হেমন্তকুমার তর্কতীর্থ-র মহাভারতম্-এ এটি আছে আদিপর্ব, অধ্যায় ১২৭-এ। মহাভারত-এর প্রামাণিক সংস্করণ-এ এটি আছে আদিপর্ব-র অধ্যায় ১১৯-এ।

সামদানের দ্বারা বিজয়. . . : এখানে মহাভারতের উদ্দিষ্ট শ্লোকটি হল . **উপায়বিজয়ং শ্রেষ্ঠমাহুর্ভেদেন মধ্যমম্।/ জঘন্য এষ বিজয়ো যো যুদ্ধেন বিশাম্পতে।। ৮৪** (মহা-ভারত, ভীষ্মপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়)।

যুদ্ধের কথা। প্রকাশ : 'মাসিক বসুমতী', বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ.২৪৬-২৪৮।

Liberal Party : ব্রিটেনের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দল। ১৮৪০-এর আগে এর নাম ছিল Whig Party. ১৯১৪-র পর এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে যায়।

Chamberlain : Arthur Neville Chamberlain (1869-1940)। ব্রিটিশ কনজারভেটিব রাজনীতিবিদ। ১৯৩৭-এ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন, কিন্তু ১৯৪০-এ পদত্যাগ করেন।

উপর-চাল। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জুলাই ১৯৪০, পৃ. ৬। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

Maginot Line : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ফ্রান্সে স্টিলের তৈরি একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর। তৈরি হয় ১৯৩০-৪০-এর মধ্যে।